ছায়া-দর্শন

কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর

সাহিত্যালোক ॥ ৩২/৭ বিডন স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৬

সাহিত্যলোক সংস্করণ : আষাঢ়, ১৩৬৭

প্রচ্ছদ : অমিয় ভট্টাচার্য

সাহিত্যলোক, ৩২/৭ বিডন স্ট্রীট কলিকাতা-৭০০০০৬ থেকে
নেপালচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক
বঙ্গবাণী প্রিন্টার্স, ৫৭-এ কারবালা ট্যাঙ্ক
লেন কলিকাতা-৭০০০০৬ হতে মুদ্রিত।

গ্রন্থ ও গ্রন্থকার

বঙ্কিমযুগের সুপ্রসিদ্ধ লেখক কালীপ্রসন্ন ঘোষের 'ছায়া-দর্শন' বইখানি বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' (১৮৭২) পত্রিকা প্রকাশের দু-বছর পরে ১৮৭৪ সালে 'বান্ধব' মাসিকপত্র বের হয়। এই 'বান্ধব' পত্রিকার পরিচালন ও সম্পাদন কালীপ্রসন্নের সাহিত্যিক জীবনের এক শ্রেষ্ঠ কীর্তি। 'বান্ধবে' তাঁর বহু লেখা প্রকাশিত হয় এবং 'ছায়া-দর্শন' কাহিনীগুলিও ধারাবাহিকভাবে এই পত্রিকায় বের হয়। পরে ১৯১০ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর, সি আই ই ১৮৪৩ খ্রীস্টাব্দে ঢাকা জেলার ভরাকর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে মক্তবে ফার্সী ও টোলে সংস্কৃত শিক্ষা শেষ করে বরিশালে পড়াশুনা করেন। এরপর অসাধারণ অধ্যবসায়ে ঢাকায় ও কলকাতায় ইংরেজি সাহিত্যাদি অধ্যয়ন ও বাংলা সাহিত্যালোচনায় মনোনিবেশ করেন। কিছুকাল পরে ১৮৬৬ সালে ঢাকায় ফিরে গিয়ে আদালতে পেশকার হন। সরকারী কাজে ব্যস্ততার মধ্যেও নানা সভাসমিতির সঙ্গে যুক্ত থেকে তিনি প্রথিতযশা বাগ্মীরূপে পরিচিত হন। দশ বছর আদালতে কাজ করার পর ঢাকার প্রসিদ্ধ ভাওয়াল জমিদারের কর্মসচিব হন (১৮৭৭)। 'বান্ধব' পত্রিকা সম্পাদনা ছাড়াও কালীপ্রসন্নের গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়—নারীজাতিবিষয়ক প্রস্তাব (১৮৬৯), সংগীতমঞ্জরী (১৮৭২), সমাজশোধনী (১৮৭২), প্রভাত-চিন্তা (১৮৭৭), ভ্রান্তিবিনোদ (১৮৮১), নিভৃত-চিন্তা (১৮৮৩), প্রমোদলহরী (১৮৯৫), ভক্তির জয় (১৮৯৫), নিশীথচিন্তা (১৮৯৬); এ ছাড়াও তিনি কয়েকটি পাঠ্যপুস্তকও লিখেছিলেন। ১৯১০ সালে তিনি পরলোক গমন করেন।

ছায়া-দর্শন বইখানিতে পাশ্চাত্যদেশের কয়েকটি অলৌকিক অপচ্ছায়া-দর্শনের কাহিনী বিবৃত হয়েছে; তার সঙ্গে গ্রন্থকার অধ্যাত্মতত্ত্ব সম্বন্ধেও আলোচনা করেছেন। পাশ্চাত্যদেশে অধ্যাত্মতত্ত্ব বা Psychic Science নিয়ে যে গবেষণা শুরু হয় গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে তিনি তারও কিছু নজির দিয়েছেন।

অধ্যাত্মবিজ্ঞানের বিশেষ গবেষণার জন্য ১৮৮২ সালে লণ্ডনে এক

সমিতি গঠিত হয়। এই সমিতির নাম—The Society for Psychical Research, সংক্ষেপে S.P.R. এই সমিতি স্থাপিত হওয়ার পর থেকে অধ্যাত্মবিজ্ঞান দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হয়। ইউরোপের তৎকালীন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক উইলিয়ম ক্রুকস, স্যর অলিভার লজ, ডব্ল্যু এফ ব্যারেট, চার্লস রিকেট, স্যর এ জে ব্যালফোর. হেনরী সিগউইক, এন্ড্রু ল্যাণ্ড প্রভৃতি বিখ্যাত মনীষিগণ এই সমিতির পরিচালক, সভ্য ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এই সমিতি থেকে ৩২ খণ্ড কার্যপদ্ধতি (proceedings) এবং ২০ সংখ্যক পত্রিকা (journal) প্রকাশিত হয়। ১৮৯৩ সালে স্যর ব্যালফোর এর সভাপতি হন। অভিভাষণে তিনি এক স্থানে বলেছেন—'এ শুধু ধারণা বা অনুমান নয় এ নির্ধারিত সত্য। দৃশ্যবিশ্বজগতে এত সব জিনিস আছে যা আমাদের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব স্বপ্নেও এ যাবৎ ধারণা করে নি··· ইত্যাদি'।

আমরা নানা জায়গায় ভূত, প্রেত বা প্রেতাত্মার কথা শুনতে পাই। বহুলোকের জীবনচরিতেও এর উল্লেখ আছে। অনেক সময়ে দূরস্থ বা নিকটস্থ কোনো লোকের বা আত্মীয়ের মৃত্যু হলে সেই মৃত ব্যক্তির অপচ্ছায়ার আবির্ভাব অনেকেই দেখেছেন বলে দাবি করেন।

এই অধ্যাত্মতত্ত্ব বিষয়ে আমাদের দেশে প্রাচীনকালে দার্শনিক মহর্ষি পতঞ্জলি, ব্রহ্মর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য, রাজর্ষি জনক, মহামুনি অষ্টাবক্র প্রভৃতি মুনিঋষিগণ আলোচনা ও অনুশীলন করে যে চিন্তাধারার প্রবর্তন ও পরিপুষ্টি সাধন করেছিলেন তা আজও অক্ষুণ্ণ আছে।

ঊনবিংশ শতকের শেষভাগ থেকে সেই ধারা পাশ্চাত্যপ্রভাবে প্রভাবিত হয় এবং নতুন ভাবে এই বিজ্ঞানের আলোচনা শুরু হয়। ১৮৮০ সালের ৩০ মে কয়েকজন এদেশীয় ও পাশ্চাত্য অধ্যাত্মবাদী মিলে এ সম্বন্ধে অনুশীলনের জন্য কলকাতায় এক সমিতি গঠন করেন— 'ইউনাইটেড অ্যাসোসিয়েসন অফ স্পিরিচুয়েলিজম।' মিঃ মিউজেনস এই সমিতির প্রথম সভাপতি আর হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ এটর্নী পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদক হন। ১৯০৭ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি সুবিখ্যাত চিকিৎসক ড. পিবলসের সভাপতিত্বে এবং অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের প্রচেষ্টায় 'ক্যালকাটা সাইকিক্যাল সোসাইটি' নামে এক সভা স্থাপিত হয়। ফরাসী দেশীয় চিকিৎসক ড. বেরিনী সাহেবের বাংলোতে প্রেততত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করতেন বিখ্যাত মনীষীরা—

প্যারীচাঁদ মিত্র, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নরেন সেন, বলাই মল্লিক, রাজা শ্যামশঙ্কর রায়, শিশিরকুমার ঘোষ, দীননাথ মল্লিক, মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় এবং নিউইয়র্কের থিওজফিক্যাল সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা কর্নেল অলকট, অ্যানি বেসান্ত, ড. ব্লাভেট্‌স্কি, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি।

অধ্যাত্মবিজ্ঞানের অন্তর্গত এই দুষ্প্রাপ্য 'ছায়া-দর্শন' গ্রন্থখানি সাহিত্য-লোকের স্বত্বাধিকারী শ্রীনেপালচন্দ্র ঘোষ মহাশয় প্রকাশ করে সাহিত্য-প্রীতির বিশেষ পরিচয় দিয়েছেন। এই গ্রন্থ চিত্তাকর্ষক হবে বলে আমি আশা করি।

শৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

প্রস্তাবনা

লঙ্কার রাবণ বিষাদে অবসন্ন হইয়া বিলাপ করিয়া বলিয়াছিল—

'মরিয়া না মরে রাম এ কেমন বৈরী।
নরবানরের লীলা বুঝিতে না পারি ॥'

রাবণ চিরদিনই হিন্দুদ্বেষী ছিল— পুরাতন হিন্দু অর্থাৎ আর্যজাতির ঋষি-তাপস এবং ধর্ম ও নীতি, সমস্তের প্রতিই তার ঘোরতর বিদ্বেষ ছিল। সুতরাং সে হিন্দু ধর্মবীর— দয়া-ধর্মের অবতার শ্রীরামচন্দ্রের কর্মনীতির প্রকৃত মর্ম পরিগ্রহ করিতে পারে নাই। রামচন্দ্র মরিয়াও কেন মরিতেছে না, এ সুগভীর সূক্ষ্ম তত্ত্ব তাহার স্থূল বুদ্ধিতে প্রবেশপথ পায় নাই। যাঁহারা এখনও এই পৃথিবীতে হিন্দুধর্মের সারোদ্ধার সত্য ও সর্বজন মঙ্গলময়ী হিন্দু সভ্যতায় অন্তরের সহিত বিদ্বেষী, তাঁহারাও বহুবিষয়ে ঐ রাবণেরই অবস্থাপন্ন। হিন্দুর ধর্ম ও হিন্দুর সভ্যতা মরিয়াও মরে না, ইহা কহিয়া তাঁহারা বহুকাল হইতে বিলাপ করিয়া আসিতেছেন। এবং বোধহয় চিরকালই এইভাবে বিলাপ ও পরিতাপ করিবেন।

হিন্দুজাতি পরলোকগত পিতামাতার স্বর্গশান্তিকামনায় শ্রাদ্ধ ও তর্পণ করিয়া থাকে। আমরা যখন অল্পবয়স্ক বালক, তখন ইংরেজি শিক্ষিত যুবা ও বৃদ্ধ সকলেরই মুখে শ্রাদ্ধ ও তর্পণ সম্পর্কে নানাপ্রকার বিদ্রূপাত্মক কথা শুনিতাম এবং কোন কথারই উত্তর করিতে জানি না বলিয়া চিত্তে দুঃখিত রহিতাম। যাঁহারা দুটি ছত্র ইংরেজি পড়িয়াছেন, তাঁহারাই ঘৃণার সহিত নাসাগ্রকুঞ্চন এবং আরও পাঁচ প্রকারে ঘৃণা ব্যঞ্জন করিয়া শ্রাদ্ধতর্পণের উপর গালিবর্ষণ করিতেন; এবং যে মরিয়া যায়, সে কি আবার শ্রাদ্ধের নম নম মন্ত্র শুনিবার জন্য ফিরিয়া আইসে, এই কথা বলিয়া বিদ্বেষ ও বিরক্তি দেখাইতেন। আমরা অশিক্ষিত বালক। বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ ব্যক্তিদিগের মুখে এই সকল কথা শুনিতাম; শুনিয়া মরমে মরিয়া থাকিতাম। মনে মনে ভাবিতাম, হায়! তবে কি হিন্দুজাতির সমস্ত সৎকর্মই পাপ ও অধর্ম, এবং হিন্দুনামও কি পৃথিবী হইতে প্রক্ষালিত হইয়া যাইবে? এ আজি অর্ধশতাব্দীর অধিক কালের কথা। সেকালের লোকদিগের মধ্যে যাঁহারা এক্ষণও কর্মক্ষেত্রে উপবিষ্ট আছেন, তাঁহারা সকলেই এসকল কথায় অক্ষরে অক্ষরে সাক্ষ্য দান করিতে

পারিবেন। কিন্তু হিন্দুসভ্যতার উপর এইরূপ বিকার ও বিদ্বেষের প্রকোপ-সময়ে যেই ভারতবর্ষে সংবাদ পৌঁছিল যে, ইউরোপের প্রত্যক্ষবাদী পণ্ডিত, প্রসিদ্ধনামা অগাস্ট কোঁত তাঁহার পরলোকগত প্রণয়িনীর উদ্দেশে শ্রাদ্ধের অনুরূপ অনুষ্ঠান করিয়াছেন, অমনি এদেশের অসংখ্য শিক্ষিত যুবা শ্রাদ্ধতর্পণের তত্ত্ব বুঝিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন; অনেকে প্রকৃত শ্রদ্ধার সহিতই পিতামাতার শ্রাদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। হিন্দুধর্মের যে সকল তত্ত্বের সহিত শ্রাদ্ধতর্পণের অতি ঘনিষ্ঠ গূঢ় সম্পর্ক, আমরা এই স্থলে তাহারই দুই-একটি কথা সংক্ষেপে কহিব।

আমরা পৃথিবীর সুখ-লালসা ও প্রবৃত্তির দুর্নিবার পিপাসায় যত কেন আত্মবিস্মৃত না রহি, মৃত্যুচিন্তা তথাপি আমাদিগের মনের একটা ভাগকে সতত গ্রাস করিয়া রাখে। কারণ, যে ছিল সে চলিয়া গিয়াছে, ইহাই পৃথিবীর সংবাদ। যে এখনও আছে, সে চলিয়া যাইবে ইহাই পৃথিবীর আলোচ্য কথা। সম্রাট তাঁহার সোনার সিংহাসনে সুবর্ণমণ্ডিত সুচারু-খচিত চন্দ্রাতপের তলে, রূপের প্রভায় চন্দ্রের ন্যায় বিরাজমান ছিলেন। তিনি ঢলিয়া পড়িয়াছেন, চলিয়া গিয়াছেন। আর রূপগুণ বর্জিত, গ্রাসাচ্ছাদনে বঞ্চিত, রাজপথের কাঙ্গাল, গাছের তলায় কিংবা পথের ধূলায় অশ্রুসিক্ত নয়নে উপবিষ্ট থাকিয়া ধনগর্বিত সমৃদ্ধিদিগের নিকট হাত পাতিয়া ভিক্ষা করিত। সেও ঢলিয়া পড়িয়াছে, চলিয়া গিয়াছে। শিশু তাহার মায়ের কোলে বসিয়া খেলা করিতেছিল। সেখানেই সে ঢলিয়া পড়িয়াছে, সেখান হইতে চলিয়া গিয়াছে। যুবা, নবযৌবন বিলাসিনী নির্মলস্বভাবা সহধর্মিণীর সহিত নিভৃত-ভবনে নিশ্চিন্ত-মনে প্রণয়ের আলাপ করিতেছিল। হায়! সেও সেখানেই ঢলিয়া পড়িয়াছে, সেখান হইতে চলিয়া গিয়াছে। এই কথাই পৃথিবীর কথা। এই সংবাদই পৃথিবীর সংবাদ। ইহা বই আর কথা নাই। ইহা ভিন্ন আর সংবাদ নাই। কেহ যাইতেছে, কেহ যায় যায় অবস্থায় পৌঁছিয়াছে, এবং যে এইমাত্র আসিয়াছে, সেও-বা যাইবার পথে অকালে গড়াইয়া পড়িতেছে।

কিন্তু এই সকল কথার মধ্যে সার কথা এই, যাহারা যায়, তাহারা কোথায় যায়? হিন্দু শাস্ত্র সহস্র সহস্র বৎসর পূর্বে সজলজলদের গম্ভীর স্বরে জগতের সমস্ত অধিবাসীকে সম্ভাষণ করিয়া বলিয়াছে, জীবাত্মার ধ্বংস নাই— উহা অবিনাশী পদার্থ। অস্ত্র উহাকে ছেদন

করিতে পারে না— আগুনে উহা পোড়ে না, জলে উহা ভিজে না এবং বায়ু উহাকে শোষণ করিতে পারে না। যথা, ভুভারত-পূজ্য ভগবদ্গীতায়—

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥

গীতা ২য় অঃ ২৩শ শ্লোক।

গীতায় পুনশ্চ উপদিষ্ট হইতেছে, মনুষ্য যেমন জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করে, যিনি মনুষ্যদেহের দেহী, অর্থাৎ জীবাত্মা, তিনিও দেহপাতের পর (সূক্ষ্মতর) নূতন দেহ ধারণ করিয়া জীবনে কার্য করেন।

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যাণি সংযাতি নবানি দেহী॥

গীতা ২য় অঃ ২২শ শ্লোক।

বাল্মীকি, ব্যাস ও বশিষ্ঠ-প্রমুখ ঋষিরাও এই মহাসত্যকেই ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে উপদেশ করিয়াছেন। বাল্মীকির আরাধ্য রাম, জানকীর অগ্নিপরীক্ষা সময়ে সূক্ষ্মশরীরী দশরথের দর্শনলাভ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ ব্যাসবর্ণিত কুরুবীরাদিগের মধ্যে অনেকে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরিসমাপ্তির পর গঙ্গার তটে নিজ নিজ শোকাকুলা সহধর্মিণীকে দর্শন দান করিয়া তাঁহাদিগের হৃদয়ে বিস্ময় ও শান্তি জন্মাইয়াছিলেন। এদেশের অনেকেই আগে এই সকল কথাকে নিতান্ত অস্বাভাবিক ও অশ্রদ্ধেয় কথা জ্ঞানে উপেক্ষা করিতেন। কারণ, যে কথা বিজ্ঞানে নাই, অধ্যাত্ম জ্ঞানে তৎসম্পর্কে সহস্র সাক্ষ্য থাকিলেও তাহা অপ্রামাণিক। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ আজি ইউরোপের বৈজ্ঞানিকেরাও শত শত তত্ত্ব সংকলন করিয়া ভারতীয় ঋষি-তাপসদিগের যোগজ্ঞান-লব্ধ আধ্যাত্মিক সত্যে সাক্ষ্য দান করিতেছেন। ঋষিরা পরলোকগত পিতামতাকে সংভাষণ করিয়া বলিতেন—

'আকাশস্থ নিরালম্ব,
বায়ুভূত, নিরাশ্রয়,

ইদং নীরং ইদং ক্ষীরম্
স্নাত্বা পীত্বা সুখী ভব।'

এই কথার ভাবার্থ এই যে, তুমি এইক্ষণ আকাশিক দেহ ধারণ করিয়াছ। এই পৃথিবীর কোন বস্তু এইক্ষণ আর তোমার অবলম্ব নহে। বায়ু যেমন চক্ষের অদৃশ্য, তুমিও আজি সেই প্রকার আমাদিগের অদৃশ্য। তোমার উদ্দেশে আজি এই জল গণ্ডূষ ও গণ্ডূষপূর্ণ দুগ্ধ উৎসর্গ করিতেছি; ইহাতে তোমার পরিতৃপ্তি হউক।

এই যে এখানে আকাশিক দেহের কথা হইতেছে, ইহারই এইক্ষণ বিজ্ঞাননির্দিষ্ট নূতন নাম 'ইথিরিয়াল বডি', অর্থাৎ ইথর নামক সূক্ষ্ম পদার্থে গঠিত সূক্ষ্ম শরীর; এবং যাঁহারা পৃথিবী হইতে চলিয়া গিয়াছেন, পৃথিবীর ভাষায় যাঁহারা লোকান্তরিত হইয়াছেন, তাঁহারা পরলোকে সূক্ষ্মশরীরী রূপে বিদ্যমান রহিয়া জীবনের কর্মফল-ভোগ এবং জীবনী শক্তির নূতন বিকাশে উন্নতিলাভ করিতেছেন। তাঁহারা বাল্মীকি-বর্ণিত দশরথ এবং ব্যাস-বর্ণিত দুর্যোধন প্রভৃতির ন্যায় অবস্থা বিশেষে— এবং বিশেষ কোন আধ্যাত্মিক নিয়মের ব্যবস্থায়— আপনার পুত্র কলত্র এবং প্রিয় সুহৃদ্‌বর্গকে পৃথিবীতে দর্শন দান করিতে পারেন কিনা, তাহা পাঠক পরবর্তী অধ্যায়সমূহের প্রামাণিক বৃত্তান্তগুলি আলোচনা করিয়া নিজের জন্য নিজে অবধারণ করুন।

প্রথম অধ্যায়

আত্মিক-কাহিনী

[প্রতিশ্রুতি রক্ষা]

লর্ড ব্রুহাম, এই নামের সহিত এদেশে অনেকেরই পরিচয় আছে। লর্ড ব্রুহাম ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংলণ্ডে, জন্মসূত্রে অভিজাত না হইলেও কর্মসূত্রে— বিদ্যা, বুদ্ধি, মান, সম্ভ্রম, চারিত্রবল ও পদমর্যাদায়, অতিবড় প্রসিদ্ধ লর্ডরূপে সম্মানিত ছিলেন। এদেশে যাঁহারা লর্ড ব্রুহামের ব্যক্তিগত গৌরব-বিষয়ে অনভিজ্ঞ, তাঁহারাও প্রকারান্তরে তাঁহার নাম লইয়া থাকেন। একশ্রেণীর ব্যাগ গ্লাডস্টোন ব্যবহার করিতেন বলিয়া যেমন উহার নাম 'গ্লাডস্টোন ব্যাগ' সেইরূপ লর্ড ব্রুহাম ব্যবহার করিতেন বলিয়া একশ্রেণীর গাড়ীর নাম 'ব্রুম' বা 'ব্রুহাম।' লর্ড ব্রুহামকে না জানিলেও 'ব্রুম' বা 'ব্রুহাম' গাড়ী প্রায় সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন।

লর্ড ব্রুহাম প্রগাঢ় বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ব্যবস্থাভিজ্ঞ বুদ্ধিমান ব্যারিষ্টার, সত্যানুরাগী, দেবতার ন্যায় সত্যবাদী ও উচ্চশ্রেণীর নির্ভীক বড় লোক ছিলেন। তিনি আমূল অনুসন্ধান না করিয়া কোন তত্ত্বেই সহজে বিশ্বাস স্থাপন করিতেন না। লর্ড ব্রুহাম বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত জীবিত রহিয়া নানা কার্যে অশেষ যশ উপার্জন ও গভীর জনস্বিতার পরিচয় প্রদান করিয়া স্বর্গগত হইয়াছেন। ঈদৃশ লোকের পক্ষে পরিণত বয়সে অসত্য কথা স্বহস্তে লিপিবদ্ধ করিয়া যাওয়া যেমন অসম্ভব, হিস্টিরিয়াগ্রস্তা যুবতীর ন্যায় কল্পিত বিভীষিকা দর্শনে অলীক আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিয়া, একে আর কহিয়া উপহাসাস্পদ হওয়াও তেমনি অস্বাভাবিক। লর্ড ব্রুহাম তাঁহার স্বহস্ত লিখিত আত্মজীবনীতে ছায়া-দর্শনের যে এক অতি বিস্ময়কর অদ্ভুত কাহিনী লিখিয়া গিয়াছেন, ছায়া-দর্শন তত্ত্বের একটি বিশ্বাসযোগ্য প্রামাণিক দৃষ্টান্ত স্বরূপ এস্থলে সর্বাগ্রে উহারই ভাবানুবাদ প্রকটিত হইল।—

লর্ড ব্রুহাম লিখিয়াছেন— 'আমার জীবনে এক সময় বড়ই একটি আশ্চর্য ঘটনা ঘটিয়াছিল। ঘটনাটি এতদূর বিস্ময়াবহ যে, আমি উহার আনুপূর্বিক বিবরণ অবিকল লিপিবদ্ধ না করিয়া পারিলাম না। এডিনবরা হাইস্কুল হইতে বহির্গত হইবার পরে আমি আমার শৈশব

সময়ের একান্ত অন্তরঙ্গ সুহৃৎ— "জির" সহিত একযোগে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হই। সেখানে ধর্ম বিষয়ে শিক্ষাদানের নিমিত্ত স্বতন্ত্র কোন বন্দোবস্ত বা ক্লাস ছিল না। কিন্তু আমরা উভয়ে ভ্রমণ সময়ে প্রতিনিয়তই নানাবিধ গভীর তত্ত্বের আলাপ আলোচনা ও পরস্পর তর্কবিতর্ক করিতাম। অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে মানব আত্মার অবিনশ্বরত্ব ও পরকাল সম্পর্কেও অনেক কথা হইত। মানুষের সঙ্গে মানুষের মত সূক্ষ্ম শরীরীরা হাঁটিয়া বেড়ান, আমাদিগের মধ্যে ঠিক এমন কথা হইত না বটে, কিন্তু মৃত ব্যক্তির আত্মা জীবিত লোককে দেখা দিতে পারে কিনা, এরূপ প্রশ্ন তুলিয়া আমরা বহু বাদানুবাদ করিতাম। অবশেষে এই বাদানুবাদ এতদূর গড়াইল যে, আমরা উভয়ে গায়ের রক্ত দিয়া একটা সর্তপত্র লিখিয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম— "যদি মৃত্যুর পরে আত্মার অস্তিত্ব থাকে এবং সেই আত্মা যদি কোন প্রকারে জীবিত ব্যক্তিকে দেখা দিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে আমাদিগের মধ্যে যাহার মৃত্যু আগে হইবে, সে-ই অপরকে দেখা দিয়া পারলৌকিক জীবন সম্বন্ধে তাহার যে সন্দেহ থাকে, তাহা ভঞ্জন করিয়া দিবে।"*

'কলেজের পাঠ সমাপ্ত হইলে আমরা দুই বন্ধু পৃথক হইলাম। "জি" সিভিল সার্ভিসে নিযুক্ত হইয়া ভারতবর্ষে গমন করিলেন; আমি দেশে রহিলাম। ভারতে প্রস্থানের পর "জি" কিছুদিন আমার নিকট চিঠিপত্র লিখিয়াছিলেন। কিন্তু কতিপয় বৎসর অতীত হইলে আমি তাঁহাকে একবারেই ভুলিয়া গেলাম। এডিনবরাতে তাঁহার আত্মীয়, স্বজন ও পরিবারের তত গতিবিধি বা তেমন কোন কার্য প্রয়োজন ছিল না। সুতরাং তাঁহার আত্মীয়স্বজন সম্পর্কেও আমি প্রায়শঃ কোন কথা শুনিতে পাইতাম না। কালক্রমে শৈশব সৌহার্দ্যের সেই স্মৃতিচিহ্নও যেন আমার চিত্তপট হইতে প্রক্ষালিত হইয়া গেল— এমন-কি, বালবন্ধুর অস্তিত্ব পর্যন্তও আমার চক্ষে এক প্রকার লোপ পাইল।

'শীতকাল। আমরা সুইডেন ভ্রমণে দুঃসহ হিমানী ভোগ করিয়া আসিয়াছি। এ অবস্থায় উষ্ণজলে অবগাহন যেমন স্বাস্থ্যকর, তেমনি প্রীতিপ্রদ। আমি রুদ্ধদ্বার স্নানাগারে উষ্ণজলে অবগাহন করিতেছি। সম্মুখে অনতিদূরে একখানি চেয়ারের উপরে আমার পরিধেয় বস্ত্রাদি

* গায়ের রক্তে যে প্রতিজ্ঞা লিখিত হয়, তাহা অবশ্যপালনীয়। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে ইহা একটি চলিত প্রথা।

স্থাপিত রহিয়াছে। আমি অবগাহন অন্তে উঠিয়া আসিবার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় সহসা সম্মুখের চেয়ারে চক্ষু পড়িল, সুস্পষ্ট দেখিতে পাইলাম— ভারতপ্রবাসী আমার সেই শৈশবসুহৃদ "জি" ঐ চেয়ারে বসিয়া স্থির, ধীর ও প্রশান্ত দৃষ্টিতে আমার পানে তাকাইয়া রহিয়াছেন।

'অতঃপর কখন কিভাবে আমি ঐ স্নানের স্থান হইতে উঠিয়া আসিলাম সে জ্ঞান আমার কিছুমাত্র নাই। যখন প্রকৃতিস্থ হইলাম, তখন দেখিতে পাইলাম আমি মাটিতে গড়াগড়ি দিতেছি; সেই অদ্ভুত ছায়ামূর্তি— আমার সেই বাল-সুহৃদের প্রকৃতির কোন চিহ্ন সেখানে নাই। প্রাণে কেমন একটা আঘাত লাগিল, আমি এ বিষয়ে কাহারও নিকট মুখ ফুটিয়া কোন কথা বলিতে সাহস পাইলাম না। কিন্তু এই দৃশ্য আমার চিত্তপটে এমন দৃঢ় অঙ্কিত হইয়া রহিল যে, আমি আর কিছুতেই উহা ভুলিতে সমর্থ হইলাম না। অবিকল কাহিনীটি ও ঘটনার তারিখ ১৯শে ডিসেম্বর, আমার নোট বুকে লিখিয়া রাখিলাম।

'ভাবিলাম— স্নানাগারে কোন কারণে হয়ত হঠাৎ আমার নিদ্রাবেশ হইয়াছিল এবং সেই নিদ্রাবেশেই "জি"র মূর্তি স্বপ্নযোগে দেখিতে পাইয়াছি। কিন্তু আজই সহসা দিবাভাগে, স্নানাগারে বসিয়া এইরূপ স্বপ্ন দেখিবার কারণ কি? বহুবৎসর অতীত হইয়াছে, "জি"-র সহিত আমার কোনরূপ পত্রীয় আলাপ পর্যন্ত নাই। তাঁহার কথা মনে পড়িতে পারে, এমন কোন ঘটনাই ঘটে নাই। আমাদিগের সুইডেন ভ্রমণের সময়ও "জি" ভারতবর্ষ অথবা "জি" কিংবা তদীয় পরিবার সম্পর্কে কোন দিক দিয়া কোন প্রসঙ্গ বা কথার উত্থাপন হয় নাই। তবে এই বিচিত্র স্বপ্ন কেন? এইরূপে চিন্তা করিতে করিতে সহসা আমাদিগের যৌবনকালের সেই প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ হইল। মনে হইল— "জি"-র অবশ্যই মৃত্যু ঘটিয়াছে এবং পারলৌকিক জীবনে প্রমাণ প্রদর্শনার্থই তিনি হয়ত এইরূপে আমাকে দেখা দিয়া আপনার প্রতিজ্ঞা পালন করিয়াছেন। বস্তুতঃ, এই ধারণা আমি কোন প্রকারেই আমার চিত্তক্ষেত্র হইতে অপসারণ করিতে পারিলাম না। ঘটনার তারিখ ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দ ১৯শে ডিসেম্বর।'

লর্ড ব্রুহাম বহু বৎসর অন্তে ১৮৬২ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাসে উল্লিখিত কাহিনীর শেষভাগে নিম্নলিখিত কয়েক পংক্তি যোগ করিয়া রাখেন।— 'আমি এক্ষণ আমার জীবন বৃত্তান্ত হইতে এই আশ্চর্য স্বপ্নের কাহিনী নকল করিলাম। এই কথার পরিসমাপ্তির নিমিত্ত এস্থলে ইহা বলা একান্ত

আবশ্যক যে, উক্ত স্বপ্ন দর্শনের অল্প কয়েকদিন পরেই আমি এডিনবরায় ফিরিয়া আসিলাম। এডিনবরায় প্রত্যাবৃত্ত হইবার অল্পকাল পরেই ভারতবর্ষ হইতে “জি”র মৃত্যু সংবাদ আসিল। চিঠিতে লেখা ছিল, “জি” ১৯শে ডিসেম্বর তনুত্যাগ করিয়াছেন।’

এই কাহিনী সম্পর্কে প্রথমতঃ এইরূপ তর্ক উত্থাপন করা যাইতে পারে যে, ইহা লর্ড ব্রুহামের দিবাস্বপ্ন বা দৃষ্টিভ্রম। কিন্তু তিনি যে বন্ধুর অস্তিত্ব পর্যন্ত বিস্মৃত হইয়াছেন; ঘটনার ছয়মাস পূর্বেও কথা প্রসংগে যাঁহার কথা মুহূর্তের তরেও মনে চিন্তা করেন নাই, হঠাৎ স্নানাগারে বসিয়া দিবাভাগে তাঁহাকে স্বপ্নে দেখিলেন। ইহা কিরূপে সম্ভবপর? দ্বিতীয়তঃ ইহা যদি প্রকৃতই স্বপ্ন বা চক্ষের একটা অলীক ধান্ধা হয়, তাহা হইলে, ‘জি’র মৃত্যুর তারিখ ও এই ঘটনার তারিখ এক হইল কি সূত্রে? পাঠক, চিন্তা করিয়া দেখুন, এই ছায়া-দর্শন প্রকৃত-প্রস্তাবে কি? বস্তুতঃ, লর্ড ব্রুহামের স্বহস্তলিখিত ছায়া-দর্শনের এই বিস্ময়কর কাহিনীতে যে কোন দিক্ দিয়া কোন রূপ অসত্য উক্তি বা অতিরঞ্জিত ব্যাখ্যানের কোনই সম্ভাবনা নাই, লর্ড ব্রুহামের সত্যনিষ্ঠতা, চরিত্রগত উচ্চতা ও বিদ্যাবুদ্ধির বিষয় যিনি অবগত আছেন, তিনিই তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন।*

[প্রতিকার প্রার্থনা]

পূর্বে ও উত্তরে প্রশান্ত মহাসাগর, পশ্চিমে ও দক্ষিণে ভারত মহাসাগর; এই দুই মহাসাগরের সন্ধিস্থানে, তরঙ্গমালায় নিত্যসংবর্ধিত হইয়া অস্ট্রেলিয়া দ্বীপপুঞ্জ বিরাজমান। অস্ট্রেলিয়া একটি বৃহৎ বৃটিশ্

* রেভারেণ্ড ফ্রেডারিক জর্জ-লী অতি বড় প্রগাঢ় পণ্ডিত ও একান্ত ধর্মপরায়ণ খ্রীস্টীয় ধর্মযাজক ছিলেন। ছায়া-দর্শন-তত্ত্ব খ্রীস্ট ধর্মের বিরুদ্ধ বিষয়। লী মহোদয় এই তত্ত্বে সম্পূর্ণ অবিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু অনেক অনুসন্ধান ও গবেষণার দ্বারা বহু প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়া তিনি এই তত্ত্বে বিশ্বাসবান হন এবং ছায়া-দর্শনের অসংখ্য প্রামাণিক কাহিনী সংগ্রহ করিয়া *Glimpses of the Supernatural* নামে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। লর্ড ব্রুহামের এই কাহিনী উক্ত গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে। আমরা এই গ্রন্থের আরও বহু কাহিনী ক্রমশঃ বান্ধবে প্রকাশ করিব।

উপনিবেশ। নিউ সাউথ্ ওয়েল্স্ প্রদেশ অষ্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত। নিউ সাউথ ওয়েল্সের পূর্বপ্রান্তরেখায়, প্রশান্ত মহাসাগরের তটে, সিডনি বা পোর্টজ্যাক্সন বন্দর। সিডনি বা পোর্টজ্যাকসন এক্ষণ নিউ সাউথ ওয়েল্সের একটা প্রসিদ্ধ স্থান। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন উহা সামান্য একটা বন্দী উপনিবেশ মাত্র ছিল। সিডনি বা পোর্টজ্যাকসনের অনতিদূরে 'বোটানী বে' নামে একটি ক্ষুদ্র বন্দর সৃষ্টি হয়। বন্দিগণ পূর্বে এই স্থলেই প্রেরিত হইত। বোটানী বে-তে নানা-জাতীয় সুন্দর সুন্দর পুষ্প প্রচুর পরিমাণে জন্মিত: এই হেতুই হয়ত নাম বোটানী বে বা মোহন উদ্ভিদ্দ্যান। কিন্তু বন্দী রাখার পক্ষে অধিকতর সুবিধাজনক মনে করিয়া অবশেষে বন্দী উপনিবেশ বোটানী বে হইতে সিডনী বা পোর্টজ্যাকসনে উঠাইয়া আনা হয়।

অষ্ট্রেলিয়ায় তখন বনের একটা পাখী মারিলে অথবা ফাঁদ পাতিয়া সামান্য একটা বন্য শশক ধরিলেও কারাদণ্ডযোগ্য অপরাধ হইত এবং এইরূপ সামান্য অপরাধে শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগেরও পোর্টজ্যাকসনই নির্বাসনস্থান ছিল। কারাক্লেশ সময় সময় এতদূর কঠোর ও অসহনীয় হইয়া উঠিত যে, বন্দিরা আপনাদিগের মধ্যে পরস্পর পরামর্শ পূর্বক একে অন্যের প্রাণবধ করিয়া হত্যা অপরাধে ফাঁসিকাষ্ঠে বিলম্বিত হইবার পথ করিয়া লইত। এইরূপে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে দুর্বিসহ কারাজীবন শেষ করিয়া ফেলিতে অনেকেই ইচ্ছাপূর্বক অগ্রসর হইত। কিন্তু অষ্ট্রেলিয়ায় এই অবস্থার এক্ষণ আমূল পরিবর্তন ঘটিয়াছে।

পোর্টজ্যাকসন যে সময়ে উল্লিখিতরূপ 'বন্দী উপনিবেশ', সেই সময়ে উহার সন্নিকটে ফিশার নামে একটি লোকের বাস ছিল। ফিশার একজন বড় জোতদার। বন্দীদিগের মধ্যে যাহারা ভাল ব্যবহার করিয়া প্রশংসা পাইত, গবর্নমেণ্ট তাহাদিগকে নিকটবর্তী গৃহস্থদিগের বাটীতে কাজকর্ম করিয়া জীবনযাপন করিতে অনুমতি প্রদান করিতেন। লোকে ইহাদিগকে 'গবর্নমেণ্ট মেন' বা সরকারি লোক বলিত। ফিশার গবর্নমেণ্টে আবেদন করিয়া জেম্স্ নামক একটি 'সরকারি লোক'কে আপনার কর্মে নিযুক্ত করেন। জেম্স্ যেমন চতুর, তেমনি প্রভুর চিত্তবিনোদনে নিপুণ। সুতরাং সে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ফিশারের একান্ত বিশ্বাসভাজন এবং তদীয় কার্য পরিচালনায় এক প্রকার সর্বেসর্বা হইয়া উঠিল। জেম্স্ প্রতিনিয়তই প্রভুর ক্ষেত্রোৎপন্ন দ্রব্যজাত ও গোমেষাদি পশু লইয়া

নিকটবর্তী হাটে গমনাগমন করিত। তাহাকে ফিশারের এতদূর প্রিয়পাত্র ও বিশ্বাসভাজন হইতে দেখিয়া প্রতিবেশীরা সময় সময় তাহার প্রতি হিংসার চক্ষে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল।

ফিশার এখন আর একদিনের তরেও হাটে যাতায়াত করেন না। একমাত্র জেমস্‌ই হাটের দিন হাটে যাইয়া হাটের কর্ম করিয়া আইসে। লোকে যখন জিজ্ঞাসা করে, 'জেমস্, তোমার প্রভু ফিশার কোথায় ?' সে উত্তর দেয়, 'তিনি ইংলণ্ড যাত্রার উদ্যোগে আছেন।' অতঃপর একদিন জেমস্ প্রচার করিয়া দিল যে, তাহার প্রভু ফিশার সিডনি হইতে জাহাজে উঠিয়া লণ্ডনে চলিয়া গিয়াছেন।

জনসন্ ফিশারের ঘনিষ্ঠতম প্রতিবেশী। জনসন্‌ও একজন জোতদার। জনসন্ ও ফিশারের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুতা। জনসন্‌ও জেমসের মুখে শুনিলেন ফিশার লণ্ডনে চলিয়া গিয়াছেন। ফিশার জনসন্‌কে না জানাইয়া প্রায়শঃ কোন কার্য করিতেন না। অথচ এতদূরের পথে সমুদ্রযাত্রা করিলেন, বন্ধু জনসন্ তাহার বিন্দু বিসর্গও জানিতে পারিলেন না, এ বড়ই বিচিত্র ও বিস্ময়কর কথা। ফিশারের এই-রূপ আচরণে জনসন্ মনে মনে দুঃখিত ও একান্ত বিরক্ত হইলেন। তিনি পত্নীর নিকট পুনঃ পুনঃ কহিলেন— ফিশার তাঁহার সহিত এরূপ ব্যবহার করিবেন, স্বপ্নেও তিনি ইহা ভাবেন নাই।

দিনের পর দিন চলিয়া যাইতে লাগিল। ফিশারের কোন সংবাদ আসিল না। কিন্তু ফিশার তাঁহাকে না জানাইয়া অস্ট্রেলিয়া ত্যাগ করিয়াছেন, জনসনের মনে কিছুতেই এই বিশ্বাস স্থান পাইল না। জনসন্ স্থির করিলেন বন্ধু ফিশার না জানি কি এক বিচিত্র ভাব বা প্রয়োজনের বশবর্তী হইয়া এরূপে গা ঢাকা দিয়া আছেন— তিনি কখনও তাঁহাকে না কহিয়া দেশান্তর গমন করেন নাই।

জনসন্‌ও হাটে যাইতেন। ফিশারের ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া হাটে যাইবার একটা নির্জন পথ ছিল। জনসন্ চিরদিনই এই জনশূন্য পথে হাটে যাতায়াত করিতে ভালবাসিতেন। একদা জনসন্ হাটের কর্ম সমাধা করিয়া ঐ নির্জন ও নীরব পথে একাকী বাড়ি ফিরিয়া আসিতেছেন। সূর্য অস্ত গিয়াছে। কিন্তু সন্ধ্যার রক্তিমরাগ ভেদ করিয়া তখনও অন্ধকার পৃথিবীর অঙ্গ স্পর্শ করিতে সাহসী হয় নাই। জনসন্ ফিশারের ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া চলিয়াছেন। সম্মুখে একটা দরোজা। জনসন্‌কে

দরোজা পার হইয়া যাইতে হইবে। জনসন স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন, ঐ দরোজার মধ্যে তাঁহার বন্ধু ফিশার উপবিষ্ট রহিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার মুখে সে প্রফুল্লতা নাই। মুখখানি বিষাদে মলিন। চক্ষু দুটি কি যেন এক গভীর ছায়ায় আচ্ছন্ন, মুখশ্রীতে দুঃসহ যন্ত্রণার ভাব পরিস্ফুট। প্রথম দর্শনে জনসন বিস্মিত হইলেন না। কারণ, তাঁহার পূর্বেই এই ধারণা ছিল যে ফিশার বিদেশ গমন করেন নাই— দেশেই আছেন। কি কারণে গোপনে রহিয়া এই এক রকমের কৌতুক বা রঙ্গ করিতেছেন। যাহা হউক, আজি ধরা পড়িয়াছেন। আর লুকাইবার উপায় নাই। এখনই সকল রহস্য বাহির হইয়া পড়িবে। জনসন মনে মনে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া অতি সন্তর্পণে অথচ দ্রুতপদে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিন্তু হায়, চক্ষের সম্মুখে পাইয়াও বন্ধুকে ধরিতে পারিলেন না। তিনি যেই নিকটস্থ হইলেন, ফিশারের সেই মূর্তিমন্ত জীবন্ত দেহও অমনি বাষ্পাকারে পরিণত হইয়া অদৃশ্য বায়ু-জগতে মিশিয়া গেল। বিস্মিত জনসন ক্ষণকাল বজ্রাহতের ন্যায় বিস্ফারিত ও স্পন্দনহীন নেত্রে চাহিয়া রহিলেন। বুক ধরাস ধরাস করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। পৃথিবী যেন ঘুরিতে লাগিল। জনসন বহু আয়াসে আত্মসংবরণ করিয়া ঐ স্থানে একটু অন্বেষণ করিলেন। কিন্তু কোথাও আর সেই মূর্তির কোন চিহ্ন প্রাপ্ত হইলেন না। ভাবিলেন, একি দিবাস্বপ্ন ?— না অপদেবতা ?

জনসন ঘরে ফিরিলেন। কিন্তু অস্থির চিত্ত স্থির হইল না। মুখে বাক্যস্ফূর্তি নাই। যদিও সমস্ত দিনের পরিশ্রমে পরিশ্রান্ত, তথাপি সুস্থিরভাবে বসিতে বা আহার করিতে পারিলেন না। বিকারগ্রস্ত রোগীর ন্যায় ছট্‌-ফট করিতে লাগিলেন। পত্নী পতির ভাব দেখিয়া চিন্তিত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি আজ এমন আকুল ও অধীর কেন, কি হইয়াছে, খুলিয়া বল।' জনসন শুষ্ককণ্ঠে উত্তর করিলেন, 'আমি হয় উন্মাদ হইতে চলিয়াছি, আর না হয়ত প্রকৃতই মৃত আত্মার ছায়া দর্শন করিয়া প্রাণে একান্ত বিকল ও বিচলিত হইয়া পড়িয়াছি।' অতঃপর তিনি পত্নীর নিকট উল্লিখিতরূপ ছায়া-দর্শনের কাহিনী সমস্ত খুলিয়া কহিলেন। পত্নী পতির অবস্থা দর্শনে মনে মনে উদ্বিগ্ন হইয়া থাকিলেও ভাব গোপন করিয়া হাস্যমুখে বলিলেন— 'ও কিছুই নয়। সারা দিন গুরুতর শ্রম করিয়াছ। ক্লান্ত শরীরে একাকী আসিতেছিলে, হয়ত মনে ফিশারের কথা ভাবিতেছিলে, তাই হঠাৎ চক্ষে কি একটা ধাঁধা দেখিতে পাইয়াছ। একটু ঘুমাও, তবেই

প্রকৃতিস্থ হইবে।' জনসন্ তাহাই করিলেন।

এ প্রসঙ্গে আর কোন কথাই হইল না। একদিন দুদিন করিয়া, ফিরিয়া আবার হাটের দিন আসিয়া উপস্থিত হইল। জনসন্ হাটে গেলেন এবং সন্ধ্যার অব্যবহিত প্রাক্‌কালে আবার সেই নির্জন পথে তেমনি ভাবে গৃহে ফিরিয়া চলিলেন। সূর্য এখনও অস্তগমন করে নাই। সূর্যকিরণ এখনও সম্পূর্ণরূপে পৃথিবী ছাড়িয়া আকাশে একমাত্র মেঘের অঙ্গে রঙ ফলাইয়াই পরিতৃপ্ত নহে ; এখনও উহা উচ্চতরুশিরে সোনার মুকুট পরাইতেছে ; অনাবৃত মাঠে, ক্ষীণতম প্রভায়, এখনও পদার্থ নিচয়ের সুদীর্ঘতম ছায়া ফলাইয়া খেলা করিতেছে। জনসন্ ফিশারের ভূমিতে উপস্থিত হইলেন। অদূরে সেই দরোজা, দরোজা আজি জনশূন্য কি ? না ঐত আবার সেই দৃশ্য। ফিশারের সেই মূর্তি আজিও সেই দরোজায় দণ্ডায়মান ! জনসন্ দুই হাতে চক্ষু রগড়াইয়া ভাল করিয়া চাহিলেন। বুঝিলেন, দৃষ্টিভ্রম নহে। প্রকৃতই ফিশার দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। পরিধানে ফিশারের সেই চিরপরিচিত পরিচ্ছদ। বৈকালিক সূর্যালোকে সেই দেহের দীর্ঘায়িত ছায়া মাঠে গড়াইয়া পড়িয়াছে। ফিশার জনসনের দিকে চাহিয়া কি বলিবার উপক্রম করিলেন ; কিন্তু বলা হইল না। জনসনের প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। চক্ষে অন্ধকার দেখিলেন এবং ক্ষণেকের তরে যেন তাঁহার বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হইল। অতঃপর যখন আবার প্রকৃতিস্থ হইলেন, তখন দেখিলেন ফিশারের সে মূর্তি আর সেখানে নাই। ভীতিবিহ্বল জনসনের মনে বন্ধু ফিশারের অস্তিত্ব সম্বন্ধে গভীর সন্দেহের উদ্রেক হইল।

পরদিন অতি প্রত্যূষেই জনসন্ তাঁহার এক বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন এবং তাঁহার নিকট এই বিস্ময়কর ঘটনা সংক্রান্ত সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলেন। জনসনের এই বন্ধু তথাকার একজন গবর্নমেণ্ট-কর্মচারী— সুশিক্ষিত ও নানা বিষয়ে পরিপক্ক লোক। জনসন্ জেমসের নিকট যাইয়া এ বিষয় প্রশ্ন করিতে উৎসুক ছিলেন। কিন্তু বন্ধু তাহাতে নিষেধ করিয়া বলিলেন— 'তুমি কল্য দুপ্রহরে উক্ত দরোজার নিকট উপস্থিত থাকিবে। এবং তুমি যে সন্দেহ ও আশঙ্কা করিতেছ, উহার কোন ভিত্তি আছে কিনা তদ্বিষয়ে তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিব।'

পরদিন তাহাই হইল। অস্ট্রেলিয় ডিটেক্‌টিভ্ অদ্ভুত কৌশলে ঐ দরোজার অদূরবর্তী একটা পুকুরে মৃতদেহ আছে স্থির করিল। অতঃপর

ঐ দিনই সন্ধ্যার সময় ডিটেক্‌টিভের প্রদর্শিতস্থান হইতে একটি অর্ধগলিত শব উত্তোলিত হইল। জন্‌সন্‌ দেখিয়াই চিনিতে পারিলেন উহা তাঁহারই বন্ধু ফিশারের মৃতদেহ। কে তাঁহাকে যারপরনাই নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিয়া পুকুরে ডুবাইয়া রাখিয়াছে! পুলিস হত্যাকারী সন্দেহে জেম্‌স্‌কে গ্রেপ্তার করিল।

যথা সময়ে জেম্‌সের বিচার হইল। ফিশারের লণ্ডন গমন সম্বন্ধে যে মিথ্যাকথা প্রচার করিয়াছিল, ইহা ছাড়া জেম্‌সের বিরুদ্ধে আর কোন প্রমাণ ছিল না। বিচার সময়ে জেম্‌স্‌ অপরাধ অস্বীকার করিল। কিন্তু জন্‌সন্‌ যে অদ্ভুত কাহিনী কর্তৃপক্ষের নিকট বিবৃত করিয়াছিলেন, তাহাতে বিচারকের মনে কেমন একটা সন্দেহের উদ্রেক হইয়াছিল। তিনি প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটনার্থ একটা চাতুরির আশ্রয় লইলেন। জুরিগণ, আসামী অপরাধী কি নিরপরাধ ইহা সাব্যস্ত করিবার নিমিত্ত নিভৃতকক্ষে প্রবেশ করিলে, জজ জেম্‌স্‌কে আদালতের বাহিরে লইয়া যাইতে অনুমতি করিলেন। ক্ষণেক পরে একটি কর্মচারীর দ্বারা জেম্‌স্‌কে বলিয়া পাঠান হইল যে জুরিগণ তাহাকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়াছেন। জেম্‌স্‌ ইহা শুনিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, 'তবে আর গোপন করি কেন?—হাঁ, আমিই আমার মুনিব ফিশারকে হত্যা করিয়াছি। তিনি তাঁহার একটা ক্ষেত্রের দরোজায় উপবিষ্ট ছিলেন। এই সময় আমি তাঁহাকে সাংঘাতিক আঘাতে হত্যা করিয়া মৃতদেহ বহিয়া নিয়া ঐ পুকুরে ডুবাইয়া রাখিয়াছিলাম। ইহা যে প্রকাশ পাইয়াছে, ইহাতে আমি বস্তুতঃই শান্তিলাভ করিয়াছি। এই কার্য করিবার পরে আমি যে আমার প্রাণের মধ্যে কি যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছি, তাহা বলিয়া বুঝাইতে পারি না। আজ আমার মনের সেই দুঃসহ ভার লঘু হইল।'

এই স্বীকারউক্তির বলে জেম্‌সের ফাঁসি হইল, এবং ছায়া-দর্শনের এই অদ্ভুত কাহিনী আদালতের নথিভুক্ত হইয়া রহিল।

জন্‌সন্‌ যখন ফিশারের ছায়ামূর্তি দর্শন করেন, তখন তিনি অবশ্যই বন্ধু ফিশারকে ভুলিয়া যান নাই। তখন ফিশারের কল্পিত মূর্তি দেখিতে পাওয়া বিচিত্র নহে। কিন্তু একই স্থানে ঐ মূর্তির পুনঃ দর্শন এবং সেই দর্শনের ফলে ডিটেক্‌টিভ্‌ কর্তৃক বিস্ময়কর হত্যা ঘটনার আবিষ্কার, ইহাতে আর দৃষ্টিভ্রম, অলীক বিভীষিকার আরোপ করা চলে কিরূপে? বস্তুতঃ এই কাহিনীর সত্যতা সম্বন্ধে কোনরূপ

সন্দেহ বা প্রতিবাদ নাই।*

ছায়া-দর্শনের দুটি কাহিনী পাঠককে উপহার দিয়াছি। দুইটিই বিস্ময়কর অথচ যারপরনাই প্রামাণিক। উল্লিখিত দুই কাহিনীর একটি ইংলণ্ডের অন্যতম প্রসিদ্ধ পণ্ডিত লর্ড ব্রুহামের আত্মজীবনের কথা। ঐ ছায়ামূর্তি তিনি স্বয়ং সদ্‌জ্ঞানে সুস্থ ও সুস্থির মনে, দিবসের প্রখর আলোকে প্রত্যক্ষ করেন; এবং প্রত্যক্ষ মাত্র বিস্মিত ও ক্ষণকালের তরে বিমূঢ় হইয়া পড়েন। অবশেষে প্রকৃতিস্থ হইয়া আপনার দৈনিক জীবনীতে উহা স্বহস্তে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন। তদীয় পরলোক-প্রাপ্তির পরে তাঁহার বিধবা পত্নী লেডী ব্রুহাম ও ইংলণ্ডের মান্যগণ্য ও বিজ্ঞলোক-দিগের মধ্যে ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে সাক্ষ্যদান করিয়া উহার সম্যক্ সমর্থন করিয়া যান। লেডী ব্রুহাম তো কিছুই চক্ষে দেখেন নাই। এমন অবস্থায় তাঁহার সাক্ষ্যের মূল্য কি?— মূল্য এই যে, তিনি লর্ড ব্রুহামের জীবনসঙ্গিনী, সুশিক্ষিতা রমণী। ব্রুহামের জীবনের এই বিস্ময়জনক ঘটনা লইয়া সময়ে সময়েই তাঁহার সহিত আলাপ ও আলোচনা হইত; এবং তিনি উহার সমস্ত কথা অন্তরের সহিত বিশ্বাস করিতেন।

দ্বিতীয় কাহিনী অষ্ট্রেলিয়া-নিবাসী জন্‌সন্ নামক জনৈক বিশ্বস্ত ভদ্রলোকের জীবনের এক পরিচ্ছেদ। উহা কঠোর পরীক্ষার পর পরীক্ষিত-প্রমাণের সহিত আদালতের নথিভুক্ত হইয়া রহিয়াছে। বিজ্ঞ বিচারক বিচার সময়ে জন্‌সন্ কর্তৃক বর্ণিত বিচিত্র বিবরণে লক্ষ্য রাখিয়া যেরূপ অভিনব উপায়ে প্রকৃত সত্য উদ্ধার এবং অপরাধীর প্রতি দণ্ডবিধান করিয়াছিলেন, পাঠকের অবশ্যই তাহা স্মরণ আছে।

কিন্তু ছায়া-দর্শনের যে কাহিনী পাঠকের নিকট এইক্ষণ উপহৃত হইতেছে, তাহা পূর্ব কথিত উভয় ঘটনা অপেক্ষাই অনেক বিষয়ে অধিকতর বিস্ময়াবহ ও রোমহর্ষক।

* এমা হার্ডিঞ্জ ব্রিটেন ইংলণ্ডের অন্যতর অসামান্যা বিদুষী ললনা। তিনি যেমন সত্যানুরাগিণী তেমনি প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন। ডারউইনের বিজ্ঞান-সঙ্গী প্রথিতনামা ডক্‌টার ওয়ালেস্ দেবশক্তিসম্পন্না রমণী জ্ঞানে যাঁহার পূজা করিয়াছেন, টাইম্‌স পত্রিকা যাঁহার বাগ্মিতার প্রশংসা করিতে যাইয়া পুরুষের মধ্যেও তাঁহার ন্যায় বক্তা অতি বিরল বলিয়া স্পষ্ট নির্দেশ করিয়াছেন, সেই এমা হার্ডিঞ্জের লেখা হইতে এই কাহিনী সংগৃহীত হইল। এমা হার্ডিঞ্জ বৎসর দুই হইল পরলোকগতা হইয়াছেন।

ঘটনা ইংলণ্ডের। পার্লিয়ামেণ্টের লর্ডস্ ও কমন্স্, উভয় সভার কতিপয় সম্ভ্রান্ত সভ্য উহার সহিত বিশেষরূপে সম্পৃক্ত। ঘটনার পরে ঐ কথা লইয়া পার্লিয়ামেণ্টের সভ্যদিগের মধ্যে নানাসূত্রে নানারূপ আলোচনা হইয়াছিল। পার্লিয়ামেণ্টের কোন সভ্য উহাতে এই পরিমাণ বিকল ও বিক্ষিপ্তচিত্ত হইয়াছিলেন যে, তিনি বহুদিন পর্যন্ত কিবা শয়নে, কিবা ভোজনে, কিছুমাত্র স্ফূর্তি অথবা শান্তি বোধ করিতেন না। ইংলণ্ডের প্রধান প্রধান বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক এবং উচ্চশ্রেণীর বহুসংখ্যক কৃতবিদ্য ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ঐ প্রসঙ্গে বিবিধ জল্পনা ও মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। সাময়িকপত্র-সমূহেও উহার নানারূপ বিবরণ প্রকটিত হইয়াছিল। সে সকল বিবরণীতে আনুসঙ্গিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কথায় সামান্য কিছু পার্থক্য থাকিলেও মূলকথা-প্রসঙ্গে সমস্ত কাহিনীই এক।

লিটেলটন বংশীয় লর্ডগণ ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ ও পুরাতন ভূম্যধিকারী। লিটেলটন এই নামটি এ দেশেও অপরিচিত নহে। লিটেলটন বংশীয় বর্তমান লর্ড ইংলণ্ডের স্বর্গগত মন্ত্রী মহামনা গ্লাডস্টোনের আত্মীয়। ইংলণ্ড ও আয়র্লণ্ড এই উভয় স্থানেই লিটেলটনের বিস্তৃত ভূম্যধিকার আছে। লিটেলটন বংশীয় যে লর্ড বর্ণনীয় কাহিনীর মুখপাত্র, তাঁহার নাম টমাস। তিনি সাধারণের নিকট লর্ড টমাস লিটেলটন নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম লর্ড জর্জ লিটেলটন। লর্ড জর্জ লিটেনটনের মৃত্যুর পরে টমাস লিটেলটন লর্ড উপাধি ও বিশাল ভূম্যধিকারের আধিপত্য লাভ করিয়া স্বদেশে ও বিদেশে সমৃদ্ধদিগের মধ্যে উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত হন।

ইংলণ্ড ও আয়র্লণ্ডের নানাস্থানে লর্ড লিটেলটনের বহুসংখ্যক প্রাসাদ ছিল। এস্থানে সেই সমস্ত প্রাসাদমালার নাম করা অনাবশ্যক। কিন্তু যে কয়েকটি প্রাসাদ অথবা বিলাস ভবনের সহিত বর্ণনীয় ঘটনার বিশেষ সম্পর্ক সেগুলির এটুকু পরিচয় দেওয়া অসঙ্গত নহে।

ইংলণ্ডের রাজধানী লণ্ডন নগরের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে পনর মাইল দূরে এপ্সম নামে একটি গ্রাম্য নগর আছে। ঐ নগরে লিটেলটনের এক প্রাসাদ ছিল। উহার নাম পিট্‌প্লেস। এই প্রাসাদ এবং বার্কলি-স্কোয়ারস্থিত হিল স্ট্রীটের বিলাসভবনই টমাস লিটেলটনের প্রিয় নিকেতন ছিল। তিনি এই দুই স্থানেই অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন। কখনও কখনও সখ করিয়া আয়র্লণ্ডের গ্রাম্য ভবনে যাইয়াও বাস করতেন।

লর্ড টমাস লিটেলটন ওজস্বী বক্তা না হইলেও লর্ড সভার সুপরিচিত

সভ্য ছিলেন। তিনি সভায় যেমন সরসভাষী, সখের মজলিসেও সেইরূপ রসালাপপটু বলিয়া পাঁচ জনের আদর পাইতেন এবং ধন-মান-সম্পন্ন ভূস্বামী বলিয়া বহুস্থলেই কতকগুলি মাক্ষিক-স্বভাব সুহৃজ্জনের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিতেন। তাঁহার ভোগভাণ্ডার সকল সময়েই সুখসমৃদ্ধির বিবিধ সামগ্রীতে পরিপূর্ণ থাকিত। কিন্তু এই আমোদময় জীবনের অন্তরালে এক দিকে লালসার দুর্দম-প্রবাহ, আর দিকে নৈরাশ্যের অন্ধকার ভিন্ন অন্য কিছুই দৃষ্টিগোচর হইত না।

টমাস লিটেলটন চিরদিন অকৃতদার ছিলেন। পৃথিবীতে অনেকে আজীবন অকৃতদার থাকিয়াও চরিত্রগৌরবে মনুষ্যের পূজা পাইয়া গিয়াছেন। লিটেলটন সে পূজা লাভ করিতে পারেন নাই। ইংলণ্ড ও আয়র্লণ্ডের অনেক অভাগিনী তাঁহাকে অভিসম্পাত করিয়াছিল। আয়র্লণ্ড নিবাসিনী এমফ্লেট নাম্নী এক দুঃখিনী বিধবার তিনটি কন্যা ছিল। ঐ তিন অভাগিনীই ভয়ে অথবা লোভে লর্ড টমাস লিটেলটনের নিত্য সঙ্গিনী হইয়া মায়ের প্রাণে আগুন জ্বালাইয়াছিল। তিন ভগিনীর একটি আয়র্লণ্ডে থাকিত— দুইটি লিটেলটনের সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডে প্রাসাদে প্রাসাদে পিঞ্জর-রুদ্ধ পোষা ময়নার মতো ঘুরিয়া বেড়াইত। আর উহাদিগের শোকাতুরা বৃদ্ধা মাতা ক্রমে আপনার তিনটি প্রাণ-প্রিয় কন্যাকেই নরকের গ্রাসে ডালি দিয়া আয়র্লণ্ডের শূন্যকুটীরে একা পড়িয়া অহোরাত্র হাহাকার করিত। যাহারা ধনমদে মত্ত অথবা পদ-প্রভুত্ব-গৌরবে আত্মবিস্মৃত, অবলা তাহাদিগের কাছে, পৃথিবীর প্রায় সকল স্থলেই, ক্ষণিক আমোদের উপকরণ বই কিছুই নহে। কিন্তু অবলারও ইহকালের পর পরকাল আছে; আর যাহারা অবলাকে উপবনের একটি কুসুম মাত্র মনে করিয়া আপনাদিগের রসিকতাবৃত্ত আসুরী নিষ্ঠুরতায় আপনারা আমোদিত রহে, তাহাদেরও পরকাল আছে। আমোদ-বিহ্বল লিটেলটন পরকাল মানিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। একা লিটেলটনের আর কথা কি? পৃথিবীর সম্পদ-মুগ্ধ সুখীদিগের মধ্যে প্রায় সকলেই পরকালের নাম শুনিলে প্রাণে জ্বলিয়া উঠে এবং বিজ্ঞান-সাহিত্যের নাম লইয়া ব্যঙ্গ বিদ্রূপের আশ্রয় লইতে ভালবাসে।

টমাস লিটেলটন আপনার ভূম্যধিকার পরিদর্শন অথবা অন্য কোন কর্ম উপলক্ষে আয়র্লণ্ডে গিয়েছিলেন, অল্প দিন হইল ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার শরীর মোটের উপর সবল ও স্ফূর্তিযুক্ত এবং হৃদয়

সর্বপ্রকার বিলাসসুখে অনুরক্ত। কিন্তু তিনি মাসাধিক কাল হইতে একটা ক্লেশকর রোগে কষ্ট পাইতেছেন। এই রোগের কষ্ট দুঃসহ হইলেও ক্ষণস্থায়ী।— এক এক সময় হঠাৎ শ্বাসরোধ হইয়া আইসে এবং কিছুকাল অপরিসীম যন্ত্রণার পর আপনা হইতেই নিবৃত্তি পায়। তাই তাঁহার চিত্ত সামান্য একটু বিরক্ত, কিন্তু এই পীড়া কিংবা বিরক্তি হেতু তাঁহার দৈনিক কার্য-কর্ম ও অভ্যস্ত আমোদ-প্রমোদে কোনরূপ বাধা ছিল না।

লর্ড লিটেলটন লণ্ডন নগরে বার্কলি স্কোয়ারে হিল স্ট্রীটের প্রাসাদে আছেন। তাঁহার সুখসংগিনী কুমারী দুইটিও ঐ প্রাসাদেই অবস্থিত রহিয়াছে। কিন্তু তাহাদিগের দুঃখানলদগ্ধা জননী সুদূর আয়র্লণ্ডে— শূন্যকুটীরে, দুঃসহ শোক, দুঃখ, লজ্জা ও অপমানে মুমূর্ষু। তাহার বিশ্বাস ছিল, লর্ড লিটেলটন স্বয়ং তাহার একটি কন্যাকে ইয়োরোপীয় প্রথা অনুসারে গোপনে পত্নীরূপে গ্রহণ করিবেন; এবং দয়া করিয়া, অপর দুইটির জন্য ভাল বর জুটাইয়া দিবেন। এখন আর সে বিশ্বাস নাই। সন্তানবৎসলা জননীর সেই স্বাভাবিক স্নেহের আশা এখন দুরাশায় পরিণত হইয়াছে; বৃদ্ধার ভাঙা বুক আরও ভাঙিয়া পড়িয়াছে। বৃদ্ধা এ সময়ে নানা রোগে কষ্ট পাইতেছিল। সে একদিন মধ্যরাত্রে আপনার প্রাণাধিকা তনয়াদিগকে নাম ধরিয়া ডাকিল; ডাকিয়া ডাকিয়া ক্লান্ত হইয়া নয়ন জলে ভাসিল। তারপর, নিঃশব্দে পড়িয়া রহিল; আর জাগিল না। মানুষ গরীব দুঃখীর ঘরে নীরবে কাঁদে, নীরবে ছটফট করে এবং নীরবেই মৃত্যুর গ্রাসে ঢলিয়া পড়ে; কেহ তাহা দেখিয়াও দেখে না, জানিয়াও জানে না। বৃদ্ধা একাকিনী মনের আগুনে পুড়িয়া পুড়িয়া মৃত্যুর গ্রাসে ঢলিয়া পড়িল। পৃথিবীতে কেহই তাহার খবর লইল না।

বৃদ্ধা যে দিন যে সময় আয়র্লণ্ডের নির্জন কুটীরে তনুত্যাগ করে, ঠিক সেই দিন সেই সময় তাহার সকল যন্ত্রণার মূল লর্ড লিটেলটন লণ্ডনের হিল স্ট্রীট প্রাসাদে ঘোর নিদ্রায় বিভোর। সে রমণীয় প্রাসাদের নিত্যনিয়মিত নৈশ ভোজব্যাপার হাস্যপরিহাসের আমোদ-হিল্লোলে, সুখসন্তোষে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ভৃত্যগণ অনেকক্ষণ হইল প্রভুর শয়নকক্ষে আলো নিবাইয়া নিজ নিজ স্থানে প্রস্থান করিয়াছে। লিটেলটন সুকোমল সুখশয্যায় আরামে নিদ্রা যাইতেছেন। তিনি হঠাৎ ঘুমের ঘোরে চমকিয়া

উঠিলেন— যেন শুনিতে পাইলেন, জানালার নিকট পাখীর পাখার শব্দ হইতেছে। যে দিক হইতে শব্দ আসিতেছিল তিনি সেই দিকে ফিরিয়া চাহিলেন। চাহিয়া দেখিলেন— পাখী নহে, একটি রমণীমূর্তি দণ্ডায়মানা। রমণীর শরীরে শ্বেত পরিচ্ছদ। ফস্‌ফরসের আলোকে সমস্ত গৃহ আলোকিত। লিটেল্‌টন ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলেন। দেখিয়া চিনিলেন, রমণী তাঁহার বিলাস-সঙ্গিনীদিগের দুঃখিনী জননী। সেই রমণীমূর্তি ক্রোধজ্বলিত কঠোর দৃষ্টিতে তাঁহার পানে তাকাইয়া রহিয়াছে। তিনি অন্য দিকে মুখ ফিরাইতে চাহিতেছেন, কিন্তু পারিতেছেন না। তাঁহার চক্ষু ঐ রমণীমূর্তি'র জ্বলন্ত বহ্নিখণ্ড সদৃশ ভয়ঙ্কর চক্ষুর সহিত যেন এক সূতায় গাঁথা রহিয়াছে। তাঁহার প্রাণটা ধুক ধুক করিতেছে। কণ্ঠ শুকাইয়া গিয়াছে। শরীর অবশ হইয়া আসিতেছে। তখন তিনি শুনিলেন, রমণী কেমন একপ্রকার শুষ্ক অথচ গভীরস্বরে কহিতেছে— 'রে পাপিষ্ঠ, তোর কাল পূর্ণ হইয়াছে; তুই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হ।' ভয়চকিত লিটেলটন যেন স্বপ্নাবেশেই উত্তর করিলেন— 'কি ?— মৃত্যু ? না-না; এত শীঘ্র নহে! আশা করি দুমাসের মধ্যেও সে আশঙ্কার কারণ নাই।' রমণী কহিল— 'দুমাস নহে, তিন দিবসের মধ্যে।' সেই ঘরে একটা বৃহৎ ঘড়ি ছিল। ধনী লোকদিগের ঘরে ঐরূপ ঘড়ি থাকে। ঘড়িতে তখন বারটা। রমণীমূর্তি দক্ষিণ হস্তের তর্জনী অঙ্গুলিটি ঘড়ির কাঁটার দিকে নির্দেশ করিয়া ধীরে কহিল— 'এই দেখ্, ঘড়িতে বারটা বাজিতেছে। ভাল করিয়া দেখিয়া রাখ্। অদ্য হইতে তৃতীয় দিবসের রাত্রিতে যখন ঘড়ির কাঁটা আবার এই স্থানে আসিবে, তখনই তোর সব ফুরাইবে, তখন তোকে লইয়া যাইব।'

কথা শেষ হইতে না হইতেই ঘরের সেই উজ্জ্বল আলো নিবিয়া গেল। গৃহ ও গৃহস্বামীকে পূর্বাপেক্ষাও গভীরতর অন্ধকারে ডুবাইয়া দিয়া সে ছায়া মূর্তি কোথায় জানি অদৃশ্য হইল! লিটেলটন বুঝিলেন না, এ কি দেখিলেন। ইহা কি স্বপ্ন— না বাস্তব ঘটনা ?— না বিকৃত-বিহ্বল চিত্তের বিভীষিকাময়-অমূলক কল্পনা ? কিন্তু তিনি এতদূর ভীত ও উত্তেজিত হইয়া পড়িলেন যে, তৎক্ষণাৎ ভৃত্যকে আহ্বান করিলেন। ভৃত্য পার্শ্বের কোঠায় শয়ান ছিল। সে আলোক লইয়া প্রভুর শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। আসিয়া দেখিল লিটেলটনের সমস্ত শরীর ঘর্মাক্ত— তিনি যারপরনাই অধীর।

রাত্রি প্রভাত হইল। লিটেলটন বাহিরে আসিলেন। কিন্তু আজ তাঁহার হৃদয়ের সে প্রমোদতারল্য— প্রাণের সেই প্রফুল্লতা নাই। অবিরামবাহি রসিকতার স্রোত যেন অকস্মাৎ নিরুদ্ধ হইয়াছে। সে উল্লাসতরঙ্গও আজি স্তম্ভিত। তিনি বাড়ির সকলের নিকটই উল্লিখিত নৈশ ঘটনা সবিস্তর বর্ণনা করিলেন। তাঁহার সহচর ও সুহৃদ্‌বর্গ সকলেই একবাক্যে কথাটাকে অলীক স্বপ্ন বলিয়া উড়াইয়া দিতে যত্ন করিলেন। কিন্তু তাঁহারা উড়াইয়া দিলেও, উহা লিটেলটনের চিত্ত হইতে একেবারে উড়িয়া গেল না। তাঁহার মনটা বড় ভার ভার হইল। তিনি আবার আমোদ উল্লাসে যোগদান করিতে সমর্থ হইলেন বটে, কিন্তু প্রাণে সম্পূর্ণরূপে প্রবোধ পাইলেন না। কল্য বৃহস্পতিবার স্বপ্ন দেখিয়াছেন। আজ শুক্রবার, শনিবার রাত্রি বারটার কথা গল্প-আমোদের মধ্যেও এক এক বার তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল ; এবং তিনি চকিতের ন্যায় অলক্ষিতভাবে অন্তরে শিহরিয়া উঠিতে লাগিলেন।

পূর্বে বলিয়াছি লর্ড লিটেলটন পরকাল মানিতে চাহিতেন না। কিন্তু, যদি একান্তই একটা পরকাল থাকে তাহা হইলে তাঁহার গতি কি হইবে ? এই ভয় ও ভাবনা তাঁহার মনটাকে সময় সময় মেঘাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতে আরম্ভ করিল। তিনি তখন গায়ের জোরে প্রাণের ধুক্‌ধুকি ভুলিতে চাহিলেন। কিন্তু পারিলেন না। প্রাণের মধ্যে কে যেন কিসের প্রভাবে তাঁহাকে দুই চারিটি কশাঘাত করিয়া অবাধ্যতার কিঞ্চিৎ প্রতিশোধ লইল। লিটেলটন শুক্রবার রাত্রিতে পার্লিয়ামেণ্টে গিয়াছিলেন। যাইবার সময় নিজ শরীরের দিকে তাকাইয়া বলিলেন— 'আমি ত বেশ সুস্থ ও সবল আছি। আমার আসন্ন সময় এত নিকটবর্তী, ইহা কি সম্ভবপর ? শনিবার রাত্রি বারটা কাটিয়া গেলেই সে স্বপ্নদৃষ্ট সয়তানীকে ফাঁকি দিতে পারি।'

আজ শনিবার, লর্ড লিটেলটন হিল স্ট্রীটের বাড়ী হইতে পিট্‌প্লেসে চলিয়া আসিয়াছেন। আজি লিটেলটনের সমস্ত বন্ধুবর্গ সুহৃৎ ও সহায়গণ পিটপ্লেসে সমবেত। কেবল লিটেলটনের প্রিয়তম স্বজন ও সংগী, কমন্‌স্‌ সভার মেম্বর, মাইলস্‌ পিটার এনড্রুস্‌ (Miles Peter Andrews) অপরিহার্য প্রয়োজনের অনুরোধে ডার্টফোর্ডে চলিয়া গিয়াছেন। কথা আছে, লর্ড লিটেলটন রবিবার প্রাতে ডার্টফোর্ডে যাইয়া প্রিয়সংগী এনড্রুসের সহিত মিলিত হইবেন। পিট্‌প্লেস্‌ হইতে ডার্টফোর্ডে ত্রিশ

মাইল দূরে।

পিট্‌প্লেসে আসিবার অল্পক্ষণ পরেই লিটেলটন শ্বাসরোধ হেতু ক্ষণকাল কষ্ট পাইলেন। যথাসময়ে নৈশ ভোজের আয়োজন হইল। লিটেলটন সুহৃদ্‌দিগের সহিত মনের স্ফূর্তিতে ভোজন ব্যাপার সম্পন্ন করিলেন। ভোজনের পর গল্প, আমোদ ও নানা বিষয়ে আলাপ চলিল। কিন্তু তিনি এক একবার ঘড়ি খুলিয়া দেখিতে লাগিলেন। রাত্রি কতটা হইয়াছে? সুহৃদ্‌বর্গ পূর্বেই পরামর্শ সহকারে পিট্‌প্লেসের সমস্তগুলি ঘড়িতে সময় এক ঘণ্টা বাড়াইয়া রাখিয়াছিলেন। সুতরাং প্রকৃত ঘড়িতে যখন সাড়ে দশটা, তখন লর্ড লিটেলটনের ঘড়িতে সাড়ে এগারটা হইল। ঘড়ির দিকে চাহিয়া লর্ডের মুখখানি একটু মলিন হইল। তিনি আর বেশী কথাবার্তা কহিতে পারিলেন না। অর্ধ ঘণ্টাকাল নীরবে বসিয়া রহিলেন। অতঃপর যেই তাঁহার ঘড়ির কাঁটা বারটার ঘর অতিক্রম করিল, তিনি অমনি বালকের মত করতালিযোগে আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিয়া উঠিলেন— 'আ বাঁচিলাম। আপনারা এখন আমার কল্যাণে মদ্যপান করুন। মিথ্যাবাদিনী সয়তানীর ভয়প্রদর্শন মিথ্যা হইয়াছে। আমি কি নির্বোধ! আমি স্বপ্নের একটা অলীক ঘটনায় বিশ্বাস করিয়া কটা দিন কি অশান্তিতেই না কাটাইয়াছি।' তাঁহার ঘড়ির কাঁটা যখন সাড়ে বারটার সন্নিহিত, তিনি তখন বিশ্রামার্থ শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন।

এখনও প্রকৃত ঘড়িতে বারটা হয় নাই। সুহৃজ্জনেরা সেই সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়া যাওয়াই স্থির করিলেন। এ দিকে শয়নকক্ষে যাইয়া নৈশপরিচ্ছদ পরিধান প্রভৃতি শয়নসময়ের আয়োজন উদ্যোগ করিতে করিতে লিটেলটনের ঘড়িতে একটা ও প্রকৃত ঘড়িতে বারটা বাজিল। লিটেলটন শয়ন সময়ে যে ঔষধ খাইতেন, তাহা খাইলেন। তৎপর ভৃত্যকে একটা চামচ লইয়া আসিবার জন্য অনুমতি করিয়া স্বয়ং বিছানায় উপবেশন করিলেন। ভৃত্য ফিরিয়া আসিল। কিন্তু, ফিরিয়া আসিয়া প্রভুকে আর প্রকৃতিস্থ দেখিল না। দেখিল, লিটেলটন মূর্ছাপন্ন। সম্মুখে শঙ্কাসূচক ঘণ্টা (alarm bell) ছিল। বিলাতে প্রায় সর্বত্রই তাহা থাকে; সুতরাং সে ঝন্‌ঝন্‌ করিয়া ঘণ্টা বাজাইল। সুহৃৎ স্বজনেরা দ্রুতবেগে শয়নকক্ষে উপস্থিত হইলেন। আসিয়া দেখিলেন লর্ড লিটেলটনের প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গিয়াছে। এবং তাঁহার প্রভাহীন নির্জীব শব ভৃত্যের বাহুবলম্বনে শয্যাতলে বিলুণ্ঠিত রহিয়াছে।

লর্ড টমাস লিটেলটন যে সময়ে পিট্‌প্লেসে তনুত্যাগ করেন, সে সময়ে তাঁহার প্রাণবন্ধু এনড্রুস 'ডার্টফোর্ডে' আপন শয়নকক্ষে তন্দ্রা-গ্রস্ত। তাঁহার একটু অসুস্থতা ছিল। সুনিদ্রা হয় নাই। ঘরে মৃদু আলো জ্বলিতেছিল। রাত্রি যখন বারটা, তখন সহসা কে তাঁহার মশারি টান দিল। চমকিয়া চাহিলেন। চাহিয়া দেখিলেন ও চিনিতে পারিলেন, তাঁহার সম্মুখে— অঙ্গে নৈশ-পরিচ্ছদ, শিরে নৈশ-শিরস্ত্রাণ— লর্ড টমাস লিটেলটন দণ্ডায়মান। শুধু দেখিলেন এমন নহে— তাঁহার কথা স্পষ্ট শুনিতে পাইলেন। লিটেলটন বলিলেন, 'আমার সব ফুরাইয়া গিয়াছে। স্বপ্ন সত্য হইয়াছে। আমি এই সংবাদই তোমাকে বলিতে আসিয়াছি।'

পূর্বকৃত বন্দোবস্ত অনুসারে রবিবারে প্রাতে না আসিয়া লিটেলটন এরূপ অসময়ে এইভাবে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, ইহাতে এনড্রুস বড় বিরক্ত হইলেন। লিটেলটন তাঁহার সঙ্গে এরূপ কৌতুক পূর্বে আরও অনেকবার করিয়াছেন। এনড্রুস সিদ্ধান্ত করিলেন, ইহাও স্বপ্নদৃষ্ট ঘটনা উপলক্ষে লিটেলটনের তেমনই একটা কৌতুক মাত্র। এনড্রুস স্বপ্ন বিশেষের সত্যতা ও ছায়া-দর্শন-তত্ত্বে ঘোরতর অবিশ্বাসী ছিলেন। তিনি কহিলেন, 'এমন অসময়ে এসেছ, এখন বল দেখি, কোথায় তোমার শয়নের স্থান করি, কোথায় বসিতে দেই।' এই বলিয়া কৃত্রিম কোপ প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে সম্মুখস্থিত চটি লিটেলটনের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। মূর্তি পার্শ্ববর্তী কোঠায় সরিয়া গেল। এনড্রুস শয্যা ত্যাগ করিলেন। শয়নকক্ষের পার্শ্বের কোঠায় তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলেন। ভৃত্যদিগকে ডাকিলেন। সমস্ত বাড়িতে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন, কোথাও আর লিটেলটনের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। বাড়ীর সমস্ত দ্বার রুদ্ধ। কোন ভৃত্য কোন খবর রাখে না, লিটেলটন কিরূপে শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিলেন, এনড্রুস ইহা ভাবিয়া বিস্মিত হইলেন, কহিলেন— 'যেমন মানুষ, তেমন শাস্তি। যেমন অসময়ে রঙ্গ করিতে আসিয়াছেন, তেমন এখন যাইয়া ঘোড়ার আস্তাবলে কিংবা বহিঃস্থ হোটেলে শয়ন করুন।'

রাত্রি প্রভাত হইল। লর্ড লিটেলটন আসিলেন না। অবশেষে— অপরাহ্নে, আরিন্দা সংবাদ লইয়া আসিল। সংবাদ এই যে, লর্ড লিটেলটন গত রাত্রি ১২টার সময় পিটপ্লেস প্রাসাদে ইহলোক হইতে অন্তর্ধান করিয়াছেন। এই সংবাদ শ্রবণ মাত্র এনড্রুস মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। ঐ সময় হইতে তিন বৎসরের মধ্যে তিনি ভালরূপ প্রকৃতিস্থ হইতে

পারেন নাই।

এই কাহিনী এনড্রুস স্বয়ং কমন্স সভার সহযোগী সভ্য মেঃ প্লুমার এডোয়ার্ড সমীপে বর্ণনা করেন। ইহার আদ্যোপান্ত বিবরণ লইয়া বড় বেশী আলোচনা হওয়ায় সে সময় পিটপ্লেস নামক প্রাসাদে যতগুলি লোক ছিল, লিটেলটনের সুহৃজ্জনেরা তাহাদিগের সকলেরই সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই সাক্ষীদিগের মধ্যে লিটেলটনের প্রিয়তম ভৃত্য উইলিয়ম স্টাকির নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। কারণ, লিটেলটন মৃত্যুকালে তাহারই ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িয়াছিলেন। আর উল্লেখযোগ্য দুঃখিনী বিধবা এমক্লেটের দুইটি অভাগিনী কন্যার নাম, কারণ তাহারাও সেই বাড়ীতে ছিল এবং আগাগোড়া সকল ঘটনাই জানিতে পাইয়াছিল। লিটেলটন এখন কোথায় চলিয়া গিয়াছেন তাহা কেহ জানে না। কিন্তু তাঁহার আমোদ-বিহ্বল জীবনের এই অবসান-কাহিনী— এই আতঙ্কজনক কথা অধ্যাত্মতত্ত্বের একটি অধ্যায় রূপে ইতিহাসে গাঁথা হইয়া রহিয়াছে। ইহা নিশ্চয়ই মনুষ্যকে গম্ভীরস্বরে উপদেশ করিতেছে— ইহলোকের পর পরলোক আছে— অবিচারের পর বিচার আছে; সুতরাং পরলোকের কথা একবারে বিস্মৃত হওয়া ভাল নহে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

উপক্রম

ছায়া-দর্শন যে-শাস্ত্র অথবা দর্শন ও বিজ্ঞানের যে-শাখার অন্তর্গত, তাহা এইক্ষণ ইয়োরোপ, আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি সমস্ত সুসভ্য দেশে, ইংরাজি ও ফরাশি প্রভৃতি বিবিধ ভাষায়, Psychic Science ও Psychic Philosophy প্রভৃতি বিবিধ গৌরবাত্মক নামে* অভিহিত হইয়াছে। এই নামগুলির সারার্থ সংকলন করিলে, এ তত্ত্বকে বাঙ্গালায় অধ্যাত্ম-দর্শন, অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান অথবা আত্মিক-তত্ত্ব প্রভৃতি নামে নির্দেশ করাই সঙ্গত বোধ হয়।

অনেকে অধ্যাত্ম-তত্ত্ব স্থলে প্রেত-তত্ত্ব শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকেন। প্রেত-তত্ত্ব এই নাম পুরাতন। কিন্তু পুরাতন হইলেও এইক্ষণ নানা কারণে পরিবর্তব্য। যাঁহারা জগদীশ তর্কালঙ্কারের শব্দ-শক্তি-প্রকাশিকা লইয়া পরিশ্রম করিতে ইচ্ছা করেন নাই, তাঁহারাও ইহা বিশিষ্ট রূপে অবগত আছেন যে,'শব্দের শক্তি পরিবর্তনশীল। শব্দের অর্থ সকল দিন সমান থাকে না। সন্দেশ বলিলে আগে বুঝাইত শুধুই সংবাদ, তারপর বুঝাইত মধুর সংবাদ। এখন বুঝায় মোদক, মণ্ডা অথবা বাজারের সন্দেশ। রাগ বলিলে আগে বুঝাইত প্রাণের ভালবাসা, অথবা বসন্ত ও ভৈরব প্রভৃতি বিশেষ প্রকারের প্রাণপ্রিয়-স্বরলহরী; এখন বুঝায় ক্রোধ। পুরাতন বৈদিক সাহিত্যের কোন কোন শব্দ এইক্ষণ এমনই অশ্রোতব্য কদর্য অর্থের প্রতিপাদক হইয়াছে যে, ভদ্রলোকেরা ভুলিয়াও তাহা মুখে আনেন না। প্রেত শব্দের অর্থও যে কালক্রমে, এবং বিশেষতঃ বঙ্গদেশে ঐরূপ পরিবর্তিত হইয়াছে; তাহা বোধ হয় সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন।** প্রেত (প্রে+ইত) বলিলে আগে

* The Science of Soul, The Science of Spritualism অথবা Spiritual Philosophy নামগুলিও পাঠকের স্মর্তব্য।

** ব্যাস যে সময় মহাভারত রচনা করেন, বোধ হয়, সেই সময় হইতেই প্রেতমূর্তি ও প্রেত-যোনি প্রভৃতি শব্দ ঘৃণাবাচক হইয়াছে। প্রেতের আকৃতি ভয়ংকর, দেহ দুর্গন্ধময় এবং জীবন-কর্মফলের অলঙ্ঘনীয় শাসনে যারপরনাই

বুঝাইত প্রকৃষ্টরূপে গত, অর্থাৎ স্বর্গগত, সূক্ষ্মশরীরী ; এখন যাহা বুঝায় তাহা জিহ্বায় আনিতেও সঙ্কুচিত হই। কেননা, পরলোকগত পিতৃপুরুষেরা, অথবা সূক্ষ্ম শরীরী ও সংস্থিতা সুহৃৎজনে, মনুষ্যমাত্রেরই ভক্তিভাজন। তাঁহাদিগকে পুরাতন সংস্কৃত অনুসারে, স্ত্রীত্বাদি-ভেদে, সংস্থিতা, এবং এখনকার অধ্যাত্মতত্ত্ব অনুসারে আত্মিক বা আত্মিকা বলিলেই সর্বাংশে সুসঙ্গত হয় না কি ?

এখানে প্রসঙ্গতঃ সংস্থিত শব্দের অর্থ লইয়া একটুকু আলোচনা করিলে পাঠক সম্ভবত চিত্তে প্রীতিলাভ করিবেন। পুরাতন ঋষিরা পরলোকগত পিতৃপুরুষকে কি অর্থে সংস্থিত বলিতেন ? বলিতেন এই অর্থে যে, যাঁহারা এতকাল এই পৃথিবীতে সংসার-সমুদ্রে একটি নির্মাল্য ফুল অথবা একগাছি তৃণের মত সুখদুঃখের তরল তরঙ্গে ভাসিতেছিলেন, তাঁহারা এইক্ষণ সেই সমুদ্রের পরপারে যাইয়া মাটীতে দাঁড়াইয়াছেন, দৃঢ় ভিত্তির উপর সংস্থিত হইয়াছেন। জ্ঞানগুরু ঋষিরা শুধু এই একটি শব্দের মধ্যে কত অর্থই সম্পূরণ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন তাহা চিন্তা করিলে চিত্ত আপনা হইতেই অবসন্ন হয়। আজি আমরাও সকলেই আশা ও আকাঙ্ক্ষার স্রোতে কখনও শৈবাল, কখনও বা সুখ-শোভন কুসুমের মতো ভাসিয়া যাইতেছি, কখনও বা উদ্দাম প্রবৃত্তির আবর্তে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছি। কিন্তু আমরাও এক সময়ে অবধারিতই পরপারে যাইব। এবং সেখানে যাইয়া দাঁড়াইবার 'স্থান' পাইয়া সংস্থিত হইব।

সেই স্থান কেমন ? আমরা এখানে যাহাকে স্থান বলি তাহা স্থূল পদার্থ, স্থূল পরমাণুতে গঠিত। সেখানকার স্থান সূক্ষ্মতর পদার্থ— সেইস্থানের দেহ, প্রাণ ও কর্মেন্দ্রিয়ের উপযোগী সূক্ষ্মতর অথবা অধ্যাত্ম পরমাণুতে গঠিত। এই মাত্র প্রভেদ।

এই যে আমার হাতে একটি লোহপিণ্ড রহিয়াছে, ইহাকে আমি বস্তু বলি। কিন্তু উহা বস্তু না অবস্তু সে বিষয় আমার সাক্ষী কে ? এক সাক্ষী চক্ষু, আর-এক সাক্ষী ত্বক্ অর্থাৎ স্পর্শেন্দ্রিয়। চক্ষে দেখিতেছি

ক্লেশজনক। মানুষ পৃথিবীতে কিরূপ দুষ্কৃত হইলে মৃত্যুর পর প্রেত-মূর্তি প্রাপ্ত হয়, মহাভারতে শান্তিপর্বে তাহার বিবৃতি আছে ; 'স প্রেতো জায়তে নরঃ' এই বাক্যের পুনঃপুনঃ আবৃত্তিতে ঐ প্রেত শব্দ পুনঃপুনঃই ঘৃণার অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

কাল বর্ণ ও গোল আকার, আর হস্তের স্পর্শে অনুভব করিতেছি কঠিন। এই দুই সাক্ষীর সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া যতটুকু জ্ঞান লাভ করিয়াছি, এই লৌহপিণ্ড সম্পর্কে আমার তাছাড়া আর কি প্রকৃত বস্তুজ্ঞান হইতে পারে?* যদি এই পিণ্ডটিরে তাপ-সহ তপ্ত কটাহের উপরে রাখিয়া কিছুক্ষণ উপযুক্ত পরিমাণ আগুনের তাপ দেওয়া যায়, তাহা হইলে এখন যাহা কাল দেখিতেছি তাহা আগে জবাকুসুমের ন্যায় লাল হইবে, তারপর ঈষৎ নীলাভ-শ্বেত ও সর্বশেষে সূর্যরশ্মির মত শাদা হইয়া যাইবে। যাহা এতক্ষণ নীরন্ধ্র ঘন ছিল, তাহা প্রথমতঃ টগবগ দ্রব-বহ্নির মূর্তি ধারণ করিয়া, অবসানে বাষ্পের আকারে আকাশে যাইয়া মিশিবে। লৌহ-পিণ্ডের এই পরিণতির দ্বারা ইহাই কি প্রত্যক্ষ প্রমাণিত হইতেছে না যে, আমরা যে পদার্থকে যে ভাবে বস্তু মনে করি, উহা প্রকৃত প্রস্তাবে সে ভাবের বস্তু নহে। উহার বস্তুত্ব কএকটা ইন্দ্রিয়ের সাক্ষ্য মাত্র। আমরা বাতাসকে চক্ষে দেখি না। কিন্তু তথাপি উহাকে বস্তু বলিয়া জানি, বস্তু বলিয়া মানি এবং বাতাস যখন বেগবিহ্বল শক্তিতে বটবৃক্ষের শাখা ও প্রশাখাগুলিরে মড়-মড় করিয়া ভাঙিতে আরম্ভ করে, আমরা তখন উহার বস্তুত্ব চিন্তা করিয়া ভয়ে জড়সড় হই। বাতাসের বস্তুত্ব কিসের উপর নির্ভর করে?— না, শুধুই স্পর্শেন্দ্রিয়ের সাক্ষ্যের উপর। চিনিটুকু যখন দুধে মিশাই, তখন উহার বস্তুত্ব লোপ পায় কি? তখন চিনিটুকু আমরা আর চক্ষে দেখিতে পাই না। কিন্তু চক্ষে দেখিতে না পাইলেও আমরা রসনায় উহার স্বাদ পাইয়া থাকি, এবং শুধু রসনার সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়াই উহাকে বস্তু জ্ঞানে ভালবাসি।

এইরূপ, যাঁহারা পরপারে যাইয়া অধ্যাত্মতনু লাভ করিয়াছেন, যাঁহারা আমাদিগের নিকট এইক্ষণ আত্মিক ও আত্মিকা মাত্র, তাঁহারাও দাঁড়াইবার জন্য বাস্তব স্থান পাইয়াছেন, এবং এখানে যেমন আমরা বন উপবন, তরু লতা, জলের ঝরনা অথবা তরঙ্গময় জলস্রোত দেখিয়া পুলকিত হই, তাঁহারাও সেখানে সেইরূপ বৃক্ষ-বহুলা বনভূমি, বনান্তশোভিত উপবন, বর্ণবিচিত্র তরুলতার বিচিত্র বন্ধন, এবং বিবিধ মূর্তি স্রোতস্বতীর জলতরঙ্গ দেখিয়া চিত্তে বিস্মিত রহিতেছেন। আমরা যেমন আমাদিগের গায়ে

* Sir William Hamilton এবং তদীয় প্রধান শিষ্য Mansal প্রভৃতি সমস্ত প্রধান দার্শনিকেরই এই সিদ্ধান্ত এবং বলা বাহুল্য যে বর্তমান কালের দর্শন ও বিজ্ঞানেও এই সিদ্ধান্তই সমর্থিত হইতেছে।

হাত দিয়া আপনাকে আপনি বস্তু মনে করি, তাঁহারাও সেইরূপ তাঁহাদিগের হস্ত পদ প্রভৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সারবৎ বস্তু মনে করেন ; এবং আমরা যেমন এখানে আমাদিগের পদতলস্থিত মৃত্তিকাকে সারবতী দৃঢ়ভূমি মনে করি, তাঁহারাও সেইরূপ তাঁহাদিগের পদতলস্থিত মৃত্তিকাকে দৃঢ়বস্তু ও দৃঢ়ভূমি মনে করিয়া থাকেন। তবে আমরা সে স্থল, সে জল, সেই সারবস্তু-নিচয় চক্ষে দেখি না কেন ? দেখি না, আমাদিগের পার্থিব চক্ষু, আমাদিগের এখনকার দর্শনেন্দ্রিয়, সে সকল সূক্ষ্ম পরমাণু-গঠিত অধ্যাত্ম বস্তুর দর্শনলাভের উপযোগী নহে বলিয়া। জ্ঞানীরা বলেন যে, পরলোকগত পিতামাতা, ভ্রাতাভগিনী এবং আত্মীয়-স্বজনেরা মাঝে মাঝে পৃথিবীতে আসিয়া শোকাকুল পুত্র, কন্যা প্রভৃতিকে চক্ষে দেখিয়া যান, এবং স্বপ্নের আবেশে অথবা অন্তঃশ্রুতির উপদেশে তাহাদিগকে সান্ত্বনা দান করিতে যত্ন করিয়া থাকেন। আমরা সাধারণতঃ তাঁহাদিগকে দেখিতে পাই না। কিন্তু যখন তাঁহারা অধ্যাত্মজগতের নিয়ম অনুসারে পৃথিবীর স্থূল-পরমাণু আকর্ষণ করিয়া মুহূর্তের তরেও মৃন্ময় তনু * ধারণ করেন, আমরা তখনই তাঁহাদিগকে চক্ষে দেখিয়া, অথবা কানে তাঁহাদিগের কথা শুনিয়া চমৎকৃত হই।

এখন এখানে সকলের মনে স্বভাবতঃই সর্বপ্রথম এই প্রশ্নের উদয় হইবে যে, এ সকল অলৌকিক কথার প্রমাণ কি ? প্রমাণ ঋষি যোগীর কথা, প্রমাণ মহাজন-বাক্য, প্রমাণ কঠোর-পরীক্ষাপ্রিয় বিজ্ঞানশাস্ত্রের মহাসাক্ষ্য। ইহা সকলেরই স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, যাহা অলৌকিক তাহা অস্বাভাবিক নহে। এজগতের কোথাও অপ্রাকৃত অথবা অস্বাভাবিক ঘটনার সম্ভাবনা নাই। কেননা, যিনি প্রকৃতির প্রাণদেব, তিনি পূর্ণজ্ঞান, পূর্ণমঙ্গল, পূর্ণস্বরূপ। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত কোন নিয়মেরই উল্লঙ্ঘন অথবা অন্যথাঘটন সংঘটিত হইতে পারে না। কিন্তু অলৌকিক সম্বন্ধে কোন অংশেও একথা খাটে না। কারণ, কল্য যাহা অলৌকিক, অর্থাৎ লোকে অপ্রসিদ্ধ ছিল, অদ্য তাহা লৌকিক হইয়াছে, এবং সমস্ত লোকেই সে অলৌকিকের তত্ত্ব-রহস্য পরিজ্ঞাত হইয়া তাহাকে স্বভাবসিদ্ধ সম্ভবপর ঘটনা জ্ঞানে আপনার কাজে লাগাইতেছে।

---

* এখনকার ইংরেজীতে যাহা materialization বলিয়া কথিত হয়, তাহাই এস্থলে মৃন্ময়-তনু-ধারণ বলিয়া উল্লিখিত হইল। মৃৎ বলিলে শুধুই মাটী বুঝায় না। জড় পরমাণুর ঘনীভূত অবস্থাও বুঝাইয়া থাকে।

ড্যাগারোটাইপ নামক প্রভাবচিত্রের আবিষ্কর্তা শুদ্ধাত্মা লুই ড্যাগেইর যখন গৃহ-প্রাচীর-প্রতিফলিত সূর্যপ্রভার দিকে তাকাইয়া চিত্রবিদ্যার মূলতত্ত্ব চিন্তা করিতেন, তখন তাঁহার প্রিয়তমা সহধর্মিণীও তাঁহাকে পাগল মনে করিয়া নির্জনে অশ্রুবিসর্জন করিতেন। তাঁহার জীবনচরিত সম্প্রতি আমাদিগের সম্মুখে নাই। কিন্তু যতদূর মনে পড়ে, তাহাতে বলিতে পারি যে লুই ড্যাগেইর তাঁহার অলৌকিক প্রতিভার পুরস্কারে কিছু কালের তরে পাগলের কারাগারে অবস্থান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

ভিক্টোরিয়া যখন মায়ের কোলে দুধের শিশু, তখন না ছিল রেলের গাড়ী, না ছিল ধুঁয়ার জাহাজ, এবং না ছিল টেলিগ্রাফ। এসকল কথাকে তখনকার উন্নতিবিমুখ বৈজ্ঞানিকেরাও অলৌকিকের কথা বলিয়া ঘৃণার সহিত উপেক্ষা করিয়াছিলেন। যে সকল বিচক্ষণ ব্যক্তিরা পৃথিবীতে টেলিগ্রাম প্রবর্তিত করিবার জন্য নিখিল-জগন্নিয়ন্তার নিয়মাবলীর উপর দৃঢ় নির্ভরের ভাবে, দৃঢ় সংকল্পে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে কে না প্রথমতঃ পাগল বলিয়া উপহাস করিয়াছিল? কিন্তু এখন সে উপহাসকারী বিজ্ঞ লোকেরাই বা কোথায়? আর উল্লিখিতরূপ উন্নতিপ্রবর্তক পাগলেরাই বা কোথায়? বিজ্ঞলোকেরা বলিয়াছিলেন পাগল; আর ধর্মজ্ঞ ও সাধুশিষ্ট সদাশয় যাজকেরা বলিয়াছিলেন সয়তানের চেলা। মানুষ পৃথিবীর এক প্রান্তে বসিয়া আর-এক প্রান্তবর্তী আত্মীয়ের কাছে তাড়িতশক্তির অলৌকিক প্রয়োগে তারে তারে সংবাদ পাঠাইবে এরূপ অসম্ভব কার্যকে ধর্মযাজকেরা ধর্মশাস্ত্র কল্পিত সয়তানের * কার্য ভিন্ন আর কিছুই মনে করিতে পারেন নাই। কিন্তু এখন কিবা মূর্খ, কিবা পণ্ডিত, সকলেই একদেশে বসিয়া দেশান্তরবাসী প্রিয়জনের কাছে তারে সংবাদ পাঠাইতেছে, পরস্পর তারে তারে কথা কহিতেছে এবং অলৌকিক তাড়িত-শক্তির উপর আনন্দফুল্ল আরোহীর ন্যায় উপবিষ্ট হইয়া আরও অসংখ্য লৌকিক কার্য সম্পাদন করিয়া লইতেছে।

মূর্খ মনুষ্য সকলই বুঝে, বুঝে না অনন্ত-লীলাময়ী ও অনন্ত-

---

* প্রচলিত পাদ্রিয়ানা ধর্মের একদিকে পূর্ণ-মঙ্গল ঈশ্বর, আর-একদিকে পাপ-মূর্তি সয়তান। এই দুইয়ে নিত্য বিরোধ। Satan অর্থাৎ সয়তান সমস্ত সৎকার্যের নিত্য শত্রু।

চৈতন্যরূপিণী প্রকৃতির অনন্তপ্রকার শক্তির অনন্ত মহিমা। তাই, যে যতটুকু জানে তাহার অতিরিক্ত সে জানিতে চাহে না ; যে যতটুকু শিখিয়া রাখিয়াছে অথবা শুনিয়া শিখিয়াছে, তাহার অতিরিক্ত কথা তাহার প্রাণে সহে না। সুতরাং, যেটুকু যাহার পূর্বপরিজ্ঞাত কথার অতিরিক্ত কথা, সে-টুকুই তাহার কাছে অলৌকিক ও অসম্ভব কথা। কিন্তু আমাদিগের ভরসা আছে, যাঁহাদিগের শরীরে সেই জগৎপূজ্য ভারতীয় আর্যের বিন্দুমাত্র শোণিত বিদ্যমান রহিয়াছে, সেই বিশ্বাসনিষ্ঠ ও ভক্তিপরায়ণ ধর্মজীবন হিন্দু পাঠক কখনও অলৌকিকের দোহাই শুনিয়া আত্মস্খলিত হইবেন না। কারণ, যাহা জগতে অলৌকিক তাহা চিরকালেই হিন্দুর কাছে লৌকিক। অলৌকিককে পরিত্যাগ করিলে হিন্দুর লৌকিক-জীবন অর্থাৎ পিতৃ-তর্পণাদি প্রাত্যহিক ও পবিত্র অনুষ্ঠান-নিচয়ও একবারে বিলুপ্ত হইয়া যায়।

লৌকিক ও অলৌকিক ঘটিত আলোচনার পর প্রমাণ সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিতে হইবে। ছায়া-দর্শন নামক প্রবন্ধের প্রস্তাবনায়ই বলিয়াছি যে, বাল্মীকি ও ব্যাস প্রভৃতি ঋষি তাপসেরা পরলোকগত আত্মার দর্শন ও স্পর্শন এবং তাঁহাদিগের সহিত মনুষ্যের কথোপকথন বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু, যাঁহারা বাল্মীকি ও ব্যাসের ঐতিহাসিক অস্তিত্ব বিষয়েও সন্দিহান তাঁহারা তাঁহাদিগের সাক্ষ্যের উপরে নির্ভর করিতে সম্মত হইবেন কি ? বোধ হয় না। বিশেষতঃ, কিবা বাল্মীকি, কিবা ব্যাস, উভয়েরই লেখার কতকটা ইতিহাস, কতক উপন্যাস। সে ইতিহাস ও উপন্যাসের অপূর্ব মিশ্রণ এমনই এক আনন্দময় বস্তু হইয়া মানবজাতিরে মোহিত রাখিয়াছে যে, তাহার মধ্য হইতে প্রকৃত ইতিহাসটুকু বাছিয়া লইতে কাহারও প্রাণ ও মন অগ্রসর হইবে না। কিন্তু পাষাণ-কঠিন বৈজ্ঞানিকের সাক্ষ্য পৃথক্ কথা। বিজ্ঞান কোন কালেও কল্পনার কম-বিচিত্র কারুকার্যে পক্ষপাতিতা প্রদর্শন করে নাই। বিজ্ঞানের আরাধ্য বিগ্রহ সত্য, আরাধনার প্রণালী প্রত্যক্ষ বস্তু ও প্রত্যক্ষ শক্তির গতি ও পরিণতি বিষয়ে সাধারণ-নিয়ম-নির্ধারণ। সুতরাং ছায়ামূর্তির বস্তুত্ব ও সত্যতা সম্পর্কে ঊনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান যে সাক্ষ্য দান করিয়াছে, সত্যপ্রিয় বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাত্রই তাহার কাছে গভীর ভক্তি ও গভীর শ্রদ্ধার সহিত মাথা নোয়াইতে ভালবাসিবেন।

যাঁহারা বিজ্ঞান-শাস্ত্রে অনুরাগী তাঁহারা অবশ্যই বর্তমান কালের

অন্যতম বিজ্ঞানগুরু, বিখ্যাত-কীর্তি এলফ্রেড রাসেল ওয়ালেসের নাম সসম্ভ্রমে উচ্চারণ করিয়া থাকেন। ডক্টর ওয়ালেস * যুগ-তত্ত্ব-প্রবর্তক ডারউইনের সহযোগী ও সমান-পদবীরূঢ় বৈজ্ঞানিক। তিনি বিজ্ঞান-শাস্ত্রের উন্নতিকল্পে যে সকল তত্ত্ব আবিষ্কার ও গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহা আজি-কালি-কার বৈজ্ঞানিক সাহিত্যে অমূল্য সম্পদরূপে আদৃত রহিয়াছে। ওয়ালেস এখনও জীবিত আছেন এবং এখনও বিজ্ঞান-সাহিত্যের অনুশীলন করিয়া বৃটিশ গভর্নমেণ্টের বৃত্তি ভোগ করিতেছেন।

ডক্টর ওয়ালেস আগে ঘোরতর অস্তি-বিমুখ অথবা অজ্ঞমনী † ছিলেন। এই পৃথিবীতে যাহা কিছু অলৌকিক, তাহাই তিনি উপহাসের কথা বলিয়া উড়াইয়া দিতেন। যাহারা ছায়া-দর্শনের কথা বলিত, তাহাদিগকে তিনি আধ-পাগল বলিয়া অবজ্ঞা করিতেন। যদি কখনও সম্ভ্রান্ত বিজ্ঞলোকেরা তাঁহার কাছে ছায়া-দর্শনের সত্যতা সম্পর্কে সাক্ষ্যদান করিতেন, সে সাক্ষ্যকে তিনি চিরদিনই রুগ্ন-কল্পনা, স্বপ্ন-জল্পনা, অথবা রোগগ্রস্ত চক্ষুর দৃষ্টিবিড়ম্বনা বলিয়া মনে মনে অবধারণ করিয়া রাখিতেন। কালক্রমে তাঁহার চিত্তে একটুকু কৌতূহল জন্মিল। এত লোকে এত দেখিতেছে, এত কহিতেছে, ইহার মধ্যে কিছু সত্য থাকিতে পারে কি? যদি একান্তই কিছু সত্য থাকে, তাহা হইলে সে কথার সহিত মানব জীবনের পরিণাম এবং ইহকাল ও পরকালের বড়ই ত ঘনিষ্ট সম্পর্ক। ওয়ালেস এইরূপ চিন্তার সূত্রে আকৃষ্ট হইয়া, অতিকঠোর বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে অধ্যাত্ম-তত্ত্বের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন; এবং ক্রমিক বিশ বৎসরের অনুসন্ধানের পর আপনার হাতে ছায়ামূর্তির ফটোগ্রাফ তুলিয়া ও একখানি ফটোগ্রাফকে আপনারই স্বর্গগত মাতার প্রতিকৃতিরূপে নিঃসংশয় চিনিতে পারিয়া একেবারে বিস্ময়ে আবিষ্ট ও বিশ্বাসে আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। তিনি মানবজাতির নিকট এই মহাসত্যের সাক্ষিরূপে দণ্ডায়মান হইয়া বহু গ্রন্থপত্র লিখিয়াছেন, বহু

* Dr. Alfred Russel, Wallace, D. C. L, L. L. D, F. R. S.

† আত্মানম্ অজ্ঞম্ মন্যতে ইতি অজ্ঞমনী। যিনি আপনাকে আপনি, অভিমান অথবা অবিশ্বাসের ভাবে অজ্ঞ বলিয়া নির্দেশ করেন, তাঁহাকে Agnostic অর্থে অজ্ঞমনী বলা যায় কি না, সুবিজ্ঞ সাহিত্যিকেরা তাহার বিচার করিবেন। আত্মমননে খশ্চেতি পাণিনিঃ—৩।২।৮।

বক্তৃতা করিয়াছেন। আমরা আজি এস্থলে তাঁহারই দুই-একটি প্রসিদ্ধ বাক্যের অনুবাদ করিয়া এই প্রস্তাবনার উপসংহার করিব।

ডক্টর ওয়ালেস বলিয়াছেন, 'আমি অনেক অনুসন্ধানের পর, এইক্ষণ যে সিধান্তে পহুঁছিয়াছি, তাহাতে বলিতে পারি যে অধ্যাত্ম-তত্ত্বে যে সকল কথা লইয়া এত আন্দোলন হইতেছে, তাহার সমস্তই সম্পূর্ণ সত্য। প্রমাণের উপর এত প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে যে, আর অধিকতর প্রমাণের প্রয়োজন নাই। অন্যান্য বিজ্ঞানের বৃত্তান্ত সকল যেরূপ প্রমাণের উপর অবস্থিত রহিয়াছে, অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের ঘটনা সকলও ঠিক সেইরূপ প্রমাণের দ্বারা প্রকৃত সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে।

*　　　*　　　*

'আমি যে পর্যন্ত অধ্যাত্ম-তত্ত্বের বিবিধ বৃত্তান্ত পরীক্ষার দ্বারা সত্য বলিয়া নির্ণয় করিতে সমর্থ হই নাই, সে পর্যন্ত আমি অতি কঠোরমতি দার্শনিক ও অবিশ্বাসী বলিয়া পরিচিত ছিলাম। এখন যেমন হর্বার্ট স্পেন্সরের গ্রন্থপত্রে আমার গাঢ় অনুরাগ, তখন সেইরূপ ভল্টেয়ার, স্ট্রাউস এবং কারল্‌ ফক্টের গ্রন্থপত্রে আমার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। আমি তখন অতি বড় ভয়ানক এবং দৃপ্ত ও দৃঢ়ীভূত জড়বাদী ছিলাম। অধ্যাত্ম-মূর্তি ও অধ্যাত্ম-শক্তির কথাই নাই, এ জগতে জড় বস্তু ও জড় শক্তি ভিন্ন আর কিছুই যে থাকিতে পারে, ইহা আমার বুদ্ধি তখন একবারেই পরিগ্রহ করিতে পারিত না। কিন্তু যখন অনেক দিন পরীক্ষা করিলাম— যখন চক্ষে দেখিয়া ও কানে শুনিয়া, বৃত্তান্তের সহিত বৃত্তান্ত মিলাইলাম— তখন জানিলাম যে বৃত্তান্ত বড় বিচিত্র ও কঠিন বস্তু। প্রকৃত বৃত্তান্তের কাছে সকলকেই হার মানিতে হইবে, আমিও হার মানিলাম, বৃত্তান্ত আমাকে পরাভব করিল।* আমি এতকাল যাহা অসত্য বলিয়া উড়াইয়া দিতাম, আমাকে তত্তাবৎ সমস্তই সত্য বলিয়া মানিতে হইল; আমার ইচ্ছা থাকুক বা না থাকুক, আমি সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইলাম। আমার এখন এই দৃঢ় বিশ্বাস যে, মনুষ্য পৃথিবীর দেহ ত্যাগ করিয়া পরলোকে যাইয়া সূক্ষ্ম দেহ ধারণ করে এবং সেখানে সূক্ষ্মদেহী আত্মিকরূপে অবস্থান করিয়া আপনার পার্থিব-

* 'Facts, however, are stubborn things. The facts beat me. They compelled me to accept them as facts long before I could accept the spiritual explanation of them.' &c.

জীবনের কর্মফল ভোগ করিয়া থাকে। আমার ইহাও দৃঢ় বিশ্বাস যে, পরলোকগত আত্মা অবস্থা-বিশেষে ও অধ্যাত্মজগতের বিশেষ বিশেষ নিয়মানুসারে বিশিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সময় সময় আমাদিকে দেখা দিতে পারেন, আমাদিগের সহিত কথা কহিতে পারেন, এবং আমাদিগের মন ও জীবনের উপর কার্য করিতে পারেন। আমি ইহাও দৃঢ়তার সহিত বিশ্বাস করি যে, যাঁহারা সত্যের উপাসনা করিতে শিখিয়াছেন এবং সত্যপ্রিয়তার সহিত তত্ত্বের অনুসন্ধান ও বৃত্তান্তের পরীক্ষা করিবেন, তাঁহারা সকলেই অধ্যাত্মবিজ্ঞানের এসকল কথাকে এক সময়ে প্রকৃত সত্য বলিয়া জানিতে পাইবেন।'

এখানে ডক্টর ওয়ালেসের যে উক্তি উদ্ধৃত হইল, তাহা বিগত অর্ধ-শতাব্দীর মধ্যে প্রায় একশত বৈজ্ঞানিক এবং এক সহস্র সুধন্যনামা সুপণ্ডিতের সাক্ষ্যে সমর্থিত হইয়াছে। তাই অধ্যাত্ম-তত্ত্বের মুখ্য কথা মনুষ্যমাত্রেরই জন্য অতি গুরুতর কথা, অতি গুরুতর সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। 'To be or not to be; that is the question.'— যখন চক্ষু বুজিব, তখনই জীবনের শেষ হইবে, না তার পরেও কিছু ঘটিবে? আজি এই যে আমি অভিমানের ছেঁড়া পাল উড়াইয়া, অথবা ঈর্ষা, অজগর-ক্রোধ এবং সুখলালসা ও স্বার্থপরতা প্রভৃতি কুৎসিত বুদ্ধির ক্রূর প্রণোদনায় আত্মহারা হইয়া পরের সুখ, স্বার্থ, শান্তি ও সম্মানের উপর শক্তি ও সম্পদের গাড়ি চালাইয়া যাইতেছি, আপনার অতি ক্ষুদ্র ও ক্ষণিক লাভের জন্য পরের সর্বনাশ করিতেছি, যে আমাকে অন্ধ বিশ্বাসে ভালবাসিত তাহার বক্ষঃস্থলে নিদারুণ আঘাত করিয়া পিশাচের মত খলখল হাসিতেছি; যে শত প্রকার উপকার করিত, স্বতঃপরতঃ ও শতপ্রকারে তাহার অপকার করিয়া গোপনে নিজের ক্ষতিলাভ গণিতেছে; ইহার কি এখানেই পরিসমাপ্তি, না পরেও কিছু আছে?

পাঠকদিগের মধ্যে যাঁহারা এ প্রশ্নের গুরুত্ব অনুভব করিবেন, তাঁহাদিগের নিকট আজিকার উপহৃত কাহিনীটি কর্মফলের একটি অপূর্ব ইতিহাস বলিয়া বিস্ময়াবহ বোধ হইবে।

আত্মিক-কাহিনী

[যৌবনের উন্মাদনা ও জীবনের অবসাদ]

ওয়াকার ইংলণ্ডের একজন গ্রাম্য ভদ্রলোক; কুলীনও নহেন; কাঙালও নহেন; কিন্তু ভদ্রসন্তান। তিনি উত্তর ইংলণ্ডে ডারহাম-শায়রের অন্তর্গত চেস্টার-লি-স্ট্রীট নামক স্থানে বাস করিতেন। ওয়াকারের কেহ নাই। স্ত্রী ছিলেন। তিনি অল্পবয়সে, সন্তানবতী হইবার পূর্বেই কালের গ্রাসে ঢলিয়া পড়িয়াছেন। ওয়াকার উপার্জনশীল গৃহস্থ। তাঁহার এক্ষণ ধন আছে, জন নাই। গৃহ আছে, গৃহস্থালী নাই। তিনি চক্ষে অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন।

কিছুকাল পরে একটি দূর-সম্পর্কিতা যুবতী কুটুম্বিনী তাঁহার আশ্রয় লইলেন। ওয়াকারের গৃহস্থালী এক্ষণ তাঁহারই হাতে গড়াইয়া পড়িল। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে সময় সময় কোন কোন অবিবাহিতা যুবতী পরিণামে পরিণয়ের প্রীতিকর আশ্বাস পাইয়া, অকৃতদার অথবা বিপত্নীক পুরুষের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই যুবতীও সেইরূপ কোন মধুর আশ্বাসে মুগ্ধ হইয়া ওয়াকারের গৃহবাসিনী হইয়াছিলেন কিনা, জানিনা। কিন্তু তাঁহার যত্নে অল্পদিনের মধ্যেই ওয়াকারের গৃহে আবার সর্ববিষয়ে সুখ-শৃংখলা সংস্থাপিত হইল। তাঁহার আঁধার ঘরে আবার আলো জ্বলিল।

যুবতী যেমন স্নেহশীলা, তেমনই গৃহকর্ম-নিপুণা। ওয়াকার সমস্ত দিন কর্মশালায় কর্ম করিতেন। যুবতী তাঁহার সুখ-সুবিধার নিমিত্ত যাহা কিছু আবশ্যক হইত, বিশেষ যত্ন, প্রীতি ও আগ্রহ সহকারে তাহা প্রস্তুত করিয়া রাখিতেন। ওয়াকারের দিন বড়ই সুখে অতিবাহিত হইতে লাগিল।

কিন্তু জলস্রোতে যেমন জোয়ার আছে, ভাঁটা আছে; জীবনের স্রোতেও সেইরূপ সুখদুঃখের জোয়ার ও ভাঁটা আছে। সুখের জোয়ার কাহারও জীবনেই চিরদিন সমান চলে না। ওয়াকারের সুখের জোয়ারেও দেখিতে দেখিতেই ভাঁটা লাগিল। তাঁহার গৃহস্থিতা সেই অবিবাহিতা যুবতী পরিণীতা না হইয়াও প্রসূতি হইবার শোচনীয় অবস্থায় যাইয়া পৌঁছিতেছেন, এই কথা লইয়া পাঁচজনের মধ্যে একটুকু বেশী ঘৃণা ও

বিদ্বেষের কানাকানি চলিল। এই প্রকার কানাকানিতে ওয়াকারের প্রাণে তেমন তুষের আগুন না জ্বলিলেও, তাঁহার সেই গৃহরক্ষিণী, অভাগিনী, লজ্জায় ও অপমানে অহোরাত্র দগ্ধ হইতে লাগিলেন।

মার্ক সারুপ নামে ওয়াকারের একটি অনুগত অনুজীবি ছিল। সে কয়লার খনিতে কয়লা খননের কাজ করিত। লাংকেশায়রের অন্তর্গত ব্লাকবরণ তাহার জন্মস্থান। একদা সন্ধ্যার প্রাক্কালে ওয়াকারের গৃহস্থিতা রমণী সেই সারুপের সহিত কোথায় যেন চলিয়া গেলেন। কোথায় গেলেন, কেহ তাহা জানিল না। অথচ সকলেই ইহা নিশ্চয় জানিল যে তিনি চলিয়া গিয়াছেন। তিনি লোকলজ্জা-ভয়ে আপনা হইতে অপসৃত হইয়াছিলেন কি? কে তাহা বলিবে? কিন্তু ইহার পর হইতে ওয়াকারের বাড়ীতে আর কেহই তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। তাঁহার সম্পর্কে কেহ কাহারও নিকট কোন কথাই জিজ্ঞাসা করিল না। যাহা কিছু কুকথা উঠিয়াছিল, তাহা কালে নীরব হইয়া আসিল এবং ওয়াকারের মান ও যশ ভদ্রলোকের মধ্যে তেমনি অক্ষুণ্ণ রহিল।

শীতকাল। ইংলণ্ডের শীত আর এদেশের শীত এক কথা নহে। ইংলণ্ডে শীতের নাম মৃত্যু, গ্রীষ্মের নাম নবজীবন। সর্বজীব-ভয়াবহ, সাক্ষাৎ-মৃত্যুস্বরূপ শীত আসিয়া ইংলণ্ডকে গ্রাস করিয়াছে। দিনমান সঙ্কুচিত, চার ও পাঁচ ঘণ্টায় পরিণত হইয়াছে। সকল দিন কুয়াসাচ্ছন্ন সূর্যের মুখ এই চারি পাঁচ ঘণ্টা কালও ভাল করিয়া দেখা যায় না। তুষার-শীতলা সুদীর্ঘ শীত-যামিনী দিবসের অধিকার কাড়িয়া লইয়া আঁধারের আধিপত্য বাড়াইয়া দিয়াছে। ফল অদৃশ্য হইয়াছে। ফুল ঝরিয়া পড়িয়াছে। পুষ্পপত্র-হীন তরুরাজি গায়ে বরফ মাখিয়া বিচিত্র স্ফটিক ঝারের মত এখানে ওখানে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। শীত-ক্লিষ্ট বিহঙ্গমকুল কলসঙ্গীত বন্ধ করিয়া কোটরে বা কুলায়ে মাথা লুকাইয়াছে। অনলও যেন জুড়াইয়া আসিয়াছে; অনলের তেজে এখন আর সহজে ফোস্কা পড়ে না। জল জমিয়া গিয়াছে; নদী চলে না। কীট পতঙ্গ নড়ে না। পশু পক্ষী চরে না। আত্মরক্ষণক্ষম কর্মজীবি মনুষ্যেরাও তুষারসমাচ্ছন্ন ক্ষীণরশ্মি ভাস্করের অধিকৃত দীনদশাপন্ন দিনমানে স্ব স্ব কর্তব্য কর্ম নিঃশেষে সম্পন্ন করিতে পারে না। সুতরাং তাহারা অধিক রাত্রি পর্যন্ত কর্মশালায় কর্মনিরত রহিতে বাধ্য হইয়া পড়িয়াছে।

জেম্‌স্ গ্রেহাম নামে ওয়াকারের একটি কর্মঠ কর্মাসক্ত প্রতিবেশী ছিলেন। শীতকালের রাত্রি। একটা বাজিয়া গিয়াছে। জেম্‌স্ গ্রেহাম তখনও একাকী আপনার কারখানায় বসিয়া যাঁতা পেষিতেছেন। তিনি যাঁতা পেষণের ব্যবসা করেন। গ্রেহামের বাড়ী ওয়াকারের গৃহ হইতে প্রায় দুই মাইল দূরবর্তী। রাত্রি অত্যধিক হইয়াছে। গ্রেহাম বড়ই ক্লান্ত হইয়াছেন। তিনি যাঁতা ছাড়িয়া উঠিলেন এবং পেষিতাবশিষ্ট শষ্যগুলিকে ভাল করিয়া গুছাইয়া তুলিয়া রাখিলেন। অবশেষে বাটী-গমন উদ্দেশ্যে কারখানার কবাট বন্ধ করিয়া নামিয়া আসিলেন।

গ্রেহামের হাতে একটি আলো। তখন কোনদিকে কোনরূপ সাড়া শব্দ নাই। বরফবর্ষিণী হিমযামিনী ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। গ্রেহাম অঙ্গনে দৃষ্টিপাত করিলেন। অদূরে ও কি ?— ও কে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। আলো ধরিয়া ভালো করিয়া চাহিলেন। দেখিলেন— রমণীমূর্তি ! রমণীর কেশপাশ উন্মুক্ত ও আলুলায়িত ! উন্মুক্ত কেশগুচ্ছে অবিরামবাহী রুধিরধারা ! মস্তকে কএকটা ভয়াবহ অস্ত্রাঘাতের ক্ষতচিহ্ন। ঐ সকল ক্ষতমুখ হইতে যেন চলকে চলকে রক্ত উছলিয়া উঠিতেছে ! গ্রেহাম আর চাহিয়া দেখিতে পারিলেন না। তাঁহার রোমাঞ্চ হইল। তিনি নয়ন মুদিয়া ভগবানের নাম করিলেন। ক্ষণপরে একটু স্থিরচিত্ত হইয়া পুনরায় চক্ষু মেলিলেন। দেখিলেন— সেই মূর্তি তেমনই ভাবে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। গ্রেহাম ভাবিলেন, এ তবে বিভীষিকা নহে ; প্রকৃতই কোন মানবী এই রূপে বিপন্ন হইয়া আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু মানবী হইলে মস্তকে এতগুলি সাংঘাতিক আঘাতের পরও সে জীবিত ও দণ্ডায়মান রহিল কিরূপে ? মানবী না আত্মিকা ?— যাহাই হউক, তিনি এবার সাহসে ভর করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কে তুমি ? এত রাত্রিতে এ বেশে এখানে কেন ?'

অতি গভীর অথচ যন্ত্রণাক্লিষ্ট কাতর কণ্ঠে উত্তর হইল— 'গ্রেহাম, তুমি তো জান, ওয়াকারের গৃহে এক অভাগিনী বাস করিত। আমিই সেই হতভাগিনী। আমি অন্তর্বত্নী হইয়াছিলুম। ওয়াকার লোকগঞ্জনা-ভয়ে আমাকে কোন নির্জন স্থানে পাঠাইবার সংকল্প করে। কথা ছিল, যে পর্যন্ত সন্তান না জন্মে এবং প্রসবের পরে যে পর্যন্ত আমার শরীর ভালরূপ সুস্থ না হয়, সেই সময় পর্যন্ত আমি সেই স্থানে যত্নে

রক্ষিত ও লুক্কায়িত রহিব। তার পর শরীর সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হইলে ফিরিয়া আসিব এবং পূর্ববৎ তাহার গৃহরক্ষা কার্যে নিযুক্ত হইব। এই পরামর্শ অনুসারে এক দিন সে আমাকে প্রাক্‌কালে মার্ক সারূপ্‌ নামক এক ব্যক্তির সহিত নির্দিষ্ট স্থানে পাঠাইয়া দিল। আমি আশ্বস্ত ও নিশ্চিন্ত-চিত্তে সার্পের সহিত চলিয়া যাইতে লাগিলাম। যাইতে যাইতে আমরা ক্রমে একটা জনশূন্য বিলের নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলাম। তখন আঁধার হইয়া আসিযাছে। ঘোর অন্ধকার দেখিয়া আমি আর বেশী সাবধানে চলিলাম। এমন সময় হঠাৎ সারূপ্‌ কয়লা খননের একটা কুঠার লইয়া আমার মস্তকে বারংবার কঠোর আঘাত করিতে লাগিল। হায়! আমি তখন একটু শব্দ করিবারও সময় পাইলাম না। দুঃসহ যাতনায় মুহূর্তমাত্র হাত পা আছাড়িয়া অচেতন হইয়া পড়িলাম। যখন চৈতন্য জন্মিল, তখন দেখিলাম আমার সেই ক্ষতবিক্ষত দেহ মাটীতে পড়িয়া রহিয়াছে, আমি দেহ হইতে বাহির হইয়া রক্ষা পাইয়াছি। এই যে আমার মাথায় এখন পাঁচটা বড় বড় ক্ষতচিহ্ন দেখিতেছ, এই সমস্তই সেই নিষ্ঠুর অসুরের আঘাতের ফল। মার্ক সারূপ্‌ ইহার পর আমার সেই রুধিরাক্ত নির্জীব দেহটাকে দ্রুতবেগে টানিয়া নিয়া নিকটবর্তী একটা কয়লার গর্তে ফেলিয়া দিল; কুঠারটাও সেই স্থানে পুতিয়া রাখিল। সারূপের জুতা ও মোজাতে রক্ত লাগিয়াছিল। সে উহা ধুইয়া ফেলিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিল; কিন্তু পারিল না। রক্তের দাগ কিছুতেই নিঃশেষ হইয়া উঠিয়া গেল না। সুতরাং জুতা ও মোজাও সেই স্থানে গাড়িয়া রাখিয়া সেই নারীঘাতী দুর্বৃত্ত দ্রুতপদে চলিয়া গেল।'

রমণী ক্ষণকাল নীরবে রহিয়া পুনরপি কহিল, 'আমি ক্রোধ ও প্রতিহিংসার আগুনে অহোরাত্র দগ্ধ হইতেছি। গ্রেহাম, তুমি যদি দয়া করিয়া আমার এই জ্বালা জুড়াইবার পথ করিয়া দাও, আমার এই কাহিনী মাজিস্ট্রেটের নিকট প্রকাশ কর, তাহা হইলে আমি তোমাকে মনে প্রাণে আশীর্বাদ করিব। আর যদি প্রকাশ না কর, তাহা হইলে আমি নিশ্চিত বলিতেছি তোমাকে অভিসম্পাত করিব।'

সে ছায়ামূর্তি এই শেষোক্ত কথা কয়টি একটু কর্কশ কণ্ঠে কহিয়াছিল। কহিতে কহিতে, চক্ষের পলকে, ঐ ভয়ঙ্করী ছায়া বাষ্পে পরিণত হইয়া শূন্যে মিলিয়া গেল। কোথায় বা সেই রুধির ধারা, কোথায় বা সেই আলুলায়িত কুন্তল, কোথায় বা সেই ভীষণ ক্ষতের ভয়াবহ দৃশ্য, আর

সেই অমানুষ কণ্ঠের কাতর স্বর! সমস্তই সে ছায়ার সংগে শূন্যে মিশিয়া গেল। গ্রেহাম কিছুকাল আড়ষ্ট ও স্তম্ভিতভাবে আত্মবিস্মৃতের মত রহিলেন।

এইক্ষণ প্রশ্ন হইতে পারে যে, পরলোকগত আত্মার অবিনশ্বর সূক্ষ্মশরীরে জড়দেহের ক্ষতচিহ্ন বর্তমান থাকা সম্ভবপর কি? বিজ্ঞেরা বহু পরীক্ষাদ্বারা অবগত হইয়াছেন যে, জড়শরীরের ক্ষতচিহ্ন অথবা রোগ ও যন্ত্রণার কোন নিদর্শন সে অধ্যাত্ম শরীরে থাকে না। কিন্তু আত্মিকগণ অবস্থা বিশেষে কখনও কখনও পরিত্যক্ত পার্থিব শরীরের অবস্থাজ্ঞাপক মূর্তি পরিগ্রহ করিতে সমর্থ। তাঁহারা পৃথিবীর লোকের নিকট আত্মপরিচয় প্রদান অথবা কোন বিশেষ অবস্থা জ্ঞাপনার্থই ইহা করিয়া থাকেন। হিন্দু ঋষিরা এই প্রকার মূর্তিকে কাম-রূপ অর্থাৎ কামনার অনুরূপ বলিয়া নির্দেশ করিতেন। গ্রেহাম তাদৃশ রূপই দেখিয়াছিলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, ইহা কি? এ কি দেখিলাম? এ কি শুনিলাম? তিনি কিছুই বুদ্ধিস্থ করিতে না পারিয়া ক্ষণকাল বজ্রাহতের ন্যায় নিস্পন্দ রহিলেন। ইহা কি প্রকৃত ঘটনা, না চোখের ধাঁধা? যদি ধাঁধা হয়, ধাঁধা শুধু চোখের নহে। চোখের ধাঁধা, কানের ধাঁধা এবং সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধি ও মনেরও ধাঁধা। সমস্ত ধাঁধাই কি একসঙ্গে আসিয়া মিলিল? যদি মনুষ্যের সমস্ত ইন্দ্রিয়েই এরূপে একই সময়ে সুসঙ্গত ধাঁধা লাগিতে পারে তাহা হইলে নিজের অস্তিত্বকেও ঐরূপ একটা ধাঁধা বলিয়া গণ্য করা যাইবে না কেন?

গ্রেহাম মনে মনে এইরূপ নানা জল্পনা করিতে করিতে ভারাক্রান্ত প্রাণে বহু কষ্টে বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। বাড়ী আসিয়া শয়ন করিলেন। শয়নে নিদ্রা হইল না। রাত্রি প্রভাত হইল। তিনি এই অলৌকিক ঘটনা সম্পর্কে কাহারও নিকট কোন কথা ব্যক্ত করিলেন না। মনে মনে দৃঢ় সংকল্প করিলেন, ব্যবসায় মাটী হইয়া গেলেও তিনি আর কখনও অত রাত্রি পর্যন্ত কারখানায় থাকিয়া কাজ করিবেন না।

গ্রেহাম বিশেষ সতর্ক হইয়া চলিতে লাগিলেন। কিন্তু কোন সতর্কতায়ই কোন ফল ফলিল না। তিনি ঐ ছায়ামূর্তির হাত এড়াইতে পারিলেন না। ইহার পর আর-একদিন গ্রেহাম আপনার কারখানার অঙ্গনে দাঁড়াইয়া আছেন। সূর্য অস্ত গিয়াছে। কিন্তু তখনও অন্ধকারের গাঢ় ছায়াপাত হয় নাই। গ্রেহাম সহসা চমকিয়া উঠিলেন।

আবার সেই ভীষণা ছায়ামূর্তি তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। আজি আর সে মূর্তির মুখে কাতরতার লেশমাত্র নাই। মূর্তি রুক্ষস্বরে কহিল— 'তুমি আমার কথা রাখিলে না, আমার কথা মাজিস্ট্রেটের কাছে কহিলে না, আচ্ছা থাক।' কহিতে কহিতে উহার চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল এবং অধিকতর ক্রোধের সহিত বলিল— 'আবারও বলি, এখনও আমার কথা রাখ, নচেৎ তোমার ভারি অকল্যাণ।' মূর্তি আবার অদৃশ্য হইল। গ্রেহাম তথাপি এ কাহিনী মুখ ফুটিয়া কাহারও নিকট ব্যক্ত করিলেন না। কিন্তু ঐ দিন হইতে কারখানার দিকে যাতায়াত এক প্রকার বন্ধ করিয়া ফেলিলেন।

বঙ্গে যেরূপ দুর্গোৎসব, খৃষ্টীয়ানের দেশে সেইরূপ খৃষ্টমাস। ক্রমে খৃষ্টমাসের দিন সন্নিহিত হইয়া আসিল। এই সময়ে গ্রেহাম একদিন সন্ধ্যার অল্প একটু পূর্বে বাগানবাড়ীতে হাঁটিয়া বেড়াইতেছেন। সঙ্গে অন্য কেহ নাই। হঠাৎ অদূরে আবার সেই দৃশ্য! গ্রেহামের প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। গ্রেহাম চাহিয়া দেখিলেন, সম্মুখে সেই করাল মূর্তি সন্ধ্যার রক্তিমরাগে অধিকতর ভীষণ ভঙ্গিতে তাঁহার পথ আগুলিয়া রহিয়াছে! আজি উহার চক্ষু, চক্ষু নহে, যেন দুটা জ্বলন্ত অনল খণ্ড ধগ্‌ধগ্‌ করিয়া জ্বলিতেছে। মুখচ্ছবি ক্রোধোদ্দীপ্ত, বিকট ও ভয়ঙ্কর। রমণী মর্মভেদি তীক্ষ্ণস্বরে কহিল— 'এখন, এখন পালাবি কোথায়? আজ আর কিছুতেই তোর আমার হাতে অব্যাহতি নাই।'

দেখিতে দেখিতে রমণীর মূর্তি আরও দুর্দর্শ হইয়া উঠিল। গ্রেহাম আর উহার পানে তাকাইতে পারিলেন না। সে মর্মভেদী স্বরও কানে সহিল না। ভয়ে মন ও প্রাণ অবসন্ন হইয়া পড়িল। গ্রেহাম অমনি শপথ করিয়া কহিলেন— 'আমি কল্যই তোমার কথা মাজিস্ট্রেটের নিকট আদ্যোপান্ত খুলিয়া বলিব। তোমার কাছে করজোড়ে কাকুতি করিয়া বলি, তুমি আর এরূপে আমার অনুসরণ করিও না, এমন করিয়া আর আমাকে ভয় দেখাইও না।' মূর্তি আবার অদৃশ্য হইল।

গ্রেহাম কম্পিত প্রাণে গৃহে ফিরিলেন। বলা বাহুল্য যে, ভীতি-বিহ্বল গ্রেহামের সে রাত্রিও ঘুম হইল না। পর দিন প্রত্যুষেই গ্রেহাম ঐ স্থানের মাজিস্ট্রেট সমীপে উপস্থিত হইলেন। মাজিস্ট্রেট তাঁহার মুখে ছায়ামূর্তির কথিত কাহিনী আদ্যোপান্ত শুনিলেন। শুনিলেন বটে, বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। কথাটারে আগাগোড়াই উপন্যাস বলিয়া

বোধ হইল। কার না হয়? ম্যাজিস্ট্রেটেরও হইল। ম্যাজিস্ট্রেট উপন্যাসের উপর বিশ্বাস করিয়া কার্য করিতে চিত্তে প্রথমতঃ খুব বেশী সাহস পাইলেন না। কিন্তু তথাপি তিনি গ্রেহামের অত্যধিক আগ্রহ ও অনুরোধে বাধ্য হইয়া অবশেষে একান্ত অনিচ্ছায় অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করিলেন। অনুসন্ধানের আরম্ভটা হেলায় তাচ্ছিল্যে ও অনিচ্ছার ভাবে হইলেও, উহার পরিসমাপ্তি যারপরনাই বিস্ময়কর হইয়া পড়িল। কথিত কয়লার গর্তে বস্তুতই একটি স্ত্রীলোকের মৃতদেহ পাওয়া গেল। শবের মস্তকে প্রকৃতই বড় বড় পাঁচটা অস্ত্রক্ষত। কুঠার, মোজা ও জুতাও যথানির্দিষ্ট স্থান হইতে উদ্ধৃত হইল! শীতকাল, তুষারপাতহেতু জুতা ও মোজার শোণিত চিহ্ন তখনও অবিকৃত ছিল।

পুলিশ এইরূপে হত্যার সূত্র পাইয়া ওয়াকার ও মার্ক সারূপকে গ্রেপ্তার করিলেন। ডারহামের পরবর্তী সেশনে তাহাদের বিচার হইল। বিচারে উভয়েই দোষী সাব্যস্ত হইয়া ঐ নিষ্ঠুর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিল। উভয়েই চরম দণ্ডে দণ্ডিত হইল। কেহ কেহ বলেন, ছায়ামূর্তি জজ ও জুরিপতিকেও দেখা দিয়াছিল। তাঁহারাও হত্যা সম্বন্ধে ছায়ামূর্তির মুখের কথা শুনিয়াছিলেন।

এই ভয়ঙ্কর হত্যা ও ছায়া-দর্শনের এই ভয়াবহ ও অদ্ভুত কাহিনী এখনও ইংলণ্ডের উত্তর প্রদেশে লোকের মুখে মুখে কথিত হইয়া থাকে। যে জজের কাছে ওয়াকার ও সারূপের বিচার হয়, সেই জজ স্বয়ং ছায়া-মূর্তির দর্শনলাভের বিষয় স্পষ্ট উল্লেখ করিয়া সার্জেণ্ট হটনের নিকট এক-খানি পত্র লিখেন। সেই পত্র হইতেই এই কাহিনী সঙ্কলিত।

এই কাহিনীকে সর্বাংশে অলৌকিক বলিয়া অঙ্গীকার করিতে প্রস্তুত আছি। কেননা, লোকজগতে ইহা সর্বদা প্রত্যক্ষ হয় না। কিন্তু ইহার কোন একটি ঘটনাও অপ্রাকৃত, অতিপ্রাকৃত অথবা অস্বাভাবিক নহে, কেননা, অধ্যাত্মজগৎও জড়জগতের ন্যায় প্রকৃতির অন্তর্গত এবং অধ্যাত্ম-দেহীদিগের দর্শন-দান ও তিরোধান, অথবা মনুষ্যের মনের উপর বিবিধ কার্যের অনুষ্ঠান, সমস্তই প্রাকৃত জগতের নানাবিধ অনুল্লংঘনীয় নিয়মের দ্বারা অনুশাসিত। সে সকল নিয়ম এখন পর্যন্ত আমাদিগের নিকট অন্ধকারে আচ্ছন্ন। এইজন্যই, কেন একজনে দেখা দিলেন, সকলে দেখা দিলেন না, অথবা কেন ওপারের সকলেই আসিয়া এই পারের সকলের সহিত কথা কহিলেন না, ইত্যাদি সর্বপ্রকার প্রশ্নের উত্তর

পাওয়া সকল সময়ে সহজ নহে। কিন্তু ডক্টর ওয়ালেস প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকেরা যে প্রকার প্রগাঢ় ভক্তির সহিত অনুসন্ধান করিতেছেন, তাহাতে ভরসা করা যায় যে এই 'প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান' জড়জগতের নিয়মের ন্যায় অপ্রত্যক্ষ অধ্যাত্মজগতের কার্যপ্রণালী কিংবা নিয়মাবলীও অতি শীঘ্রই পৃথিবীর সর্বত্র পরিজ্ঞাত কথার মধ্যে পরিগণিত হইবে। তবে যে পর্যন্ত মনুষ্য জানিতে পাইয়াছে, তাহাতে ইহা প্রত্যক্ষবাদী বৈজ্ঞানিকের পরিচিত গাম্ভীর্যের সহিত গভীর স্বরে বলা যাইতে পারে যে—

পরলোক সত্য ;

এবং পরলোকের বিচার ও কর্মফলের দণ্ডপুরস্কারও

পরম সত্য।

তৃতীয় অধ্যায়

উপক্রম

'রূপে ও সৌরভে যেন বনের যূথিকা।'

ফুলের মধ্যে বন্য যূঁই; আর ফুল্লপ্রায়া যুবতীর মধ্যে, সমাজের বহিশ্চারিণী, সুখ-সম্পদ-শূন্যা বনবাসিনী সুন্দরী।

অতি ক্ষুদ্র যূঁই ফুল আপনার ক্ষুদ্র তনুতে রূপ ও সৌরভের সলজ্জ মাধুরীটুকু লইয়া জনশূন্য অরণ্যে, অথবা গ্রাম ও নগরের উপকণ্ঠে অযত্ন-সম্ভূত উদ্যানে, যেন লোকলোচনের অগোচরে আপনাতে আপনি প্রস্ফুটিত হয়— ফুটিয়া— উহার সেই যূথিকাযোগ্য জীবনব্রত উদ্‌যাপন করিয়া— যূথিকার রূপ ও সৌরভের সহিত অনন্ত-রাগ-মিশ্রিত জগদ্-গাথার সমতান-লয়-সম্পর্ক-বদ্ধ সরস-মধুর সঙ্গীতটি গাইয়া, কালের পূর্ণতায় আপনা হইতে আপনি বৃন্তচ্যুত হইয়া ঝরিয়া পড়ে। ইহাই যূঁই ফুলটির স্বাভাবিক পরিণতি। সূর্যকিরণ-চুম্বিত, সূর্যকিরণ-সমুন্মীলিত, প্রভাত-শিশির-সিক্ত প্রফুল্ল শতদল, অথবা সায়ন্তনী শোভার রাজরানী, শত চক্ষুর সুখ-বিলাসিনী সিরাজী গোলাপের কাছে যূঁই ফুলটিরে ফুল বলিয়াও বোধ না হইতে পারে। কিন্তু ঐ শতদল ও সিরাজী গোলাপও যেমন ফুল, যূঁইটিও তেমনই ফুল— ফুলের রাজ্যে সমান— ফুলের বিকাশ ও বিলাস এবং বিলুপ্তি ও শেষ পরিণতি বিষয়ে একই নিয়তির অধীন।

উদ্ভিদ-জগতে যেমন যূঁই ফুলটি— প্রাণজগতে— অসংখ্য-প্রাণ-সূত্রিত সোপান-পরম্পরার বহু ঊর্ধ্বে— গ্রাম ও জনপদের অদূরবর্তী বন্য-ভূমিতে, অতি দুঃখী কাঙ্গালের ঘরে, সেইরূপ অর্ধস্ফুট যুবতী। কেহ দেখে না, কেহ জানে না, কেহ ভুলিয়াও কোন সংবাদ লয় না। কিন্তু সে আরণ্য তমসাচ্ছাদিতা ঈষন্মুকুলিতা যুবতী রূপে ও সৌরভে আপনাতে আপনি প্রস্ফুটিত হয়— ফুটিয়া উহার সেই দীন-জন-যোগ্য দীন-ভোগ্য জীবন উদ্‌যাপন করিয়া জগন্ময় মহাসঙ্গীতের সহিত আপনার জীবন-সঙ্গীত মিলিত-স্বরে অথচ অজ্ঞাত সারে গাইয়া কালের পূর্ণতায়

ঢলিয়া পড়ে। ইহাই দুঃখিনী যুবতীর দুঃখ-পূত মুগ্ধ-জীবনের স্বাভাবিক পরিণতি। সুসভ্য, সুশিক্ষিত ও শত-হৃদয়ের প্রীতিস্নেহ ও প্রণয়ানুরাগে সংবর্ধিত, স্বর্ণাভ-বর্ণ-মণ্ডিত প্রাসাদ-সুন্দরীদিগের কাছে— ঐ নিরক্ষরা, নিরাভরণা, অনাঘ্রাত-সভাজীবনা বন্য সুন্দরীকে রমণী বলিয়াও বোধ না হইতে পারে। কিন্তু রোমের লুক্রিসিয়া* ও ফ্রান্সের লা ভালিয়ার† যেমন রমণী, ঐ ছিন্নাম্বরা কাঙ্গালিনীও তেমনই রমণী— রমণীর রূপরাজ্যে সমান— রমণীর বিকাশ ও বিলাস এবং ক্ষণিক বিলুপ্তি ও চরম পরিণতি বিষয়ে একই নিয়তির অধীন।

ঐ যুঁইটি যদি অকালে বৃন্তচ্ছিন্ন হইয়া ব্যাধ কিংবা বন্য জন্তুর পাদপেষণে নিষ্পেষিত হয়, তাহা হইলে উহার জীবনের গতি জগন্ময়ী প্রকৃতির ধীর পদবিক্ষেপ-সূচিত মাঙ্গল্য গতির সহিত মিলিল না। জগতে একটি অবিহিত কার্যের অনুষ্ঠান হইল। আর ঐ বন্য যুবতীও যদি বনচর ব্যাঘ্র-ভল্লুকের মতো নিষ্ঠুর পুরুষের পাশব লালসায় নিপীড়িত হইয়া অকালে কালের স্রোতে ঢলিয়া পড়ে, তাহা হইলে উহার জীবনের গতিও সর্বমঙ্গলা জগন্ময়ীর নিত্য-নিয়মিত গতির সহিত মিলিল না। এবার শুধু অবিহিত অনুষ্ঠান নহে, জগতে একটা মহাপাতকের অনুষ্ঠান হইল; এবং সে মহাপাতক মহাপ্রতিশোধ-জনক প্রতিবিধানের জন্য প্রকৃতির দ্বারে প্রার্থী হইয়া দাঁড়াইল।

যুঁই ফুলটি আকৃতিতে যত ক্ষুদ্র হউক না কেন, এই অনন্ত লীলাময়ী প্রকৃতির সহিত উহার অতি ঘনিষ্ঠ ও গূঢ় সম্বন্ধ আছে। যুঁই উহার ঐ বৃন্তচ্যুত অথবা বৃন্তচ্ছিন্ন অবস্থায় রৌদ্রে শুকাইয়া, বৃষ্টিতে ভিজিয়া, বায়ুর মৃদুল-দোলনে দোলায়িত হইয়া আপনার উপাদান পরমাণু গুলিরে পুনরায় প্রকৃতির ভাণ্ডারে বুঝাইয়া দিবে; এবং যিনি প্রকৃতির প্রাণদেবতা, তাঁহার প্রেমময় মঙ্গল-নিয়মের অনুল্লংঘনীয় শাসনে জগতে আর কোন স্থানে, আর কোন মূর্তিতে বিকশিত হইয়া নূতন জীবনের নূতন ব্রত আরম্ভ করিবে। এ কথা এখন আর কবিকল্পনা নহে। ইহাই অধুনাতন বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের শিক্ষা ও সিদ্ধান্ত।

---

* লুক্রিসিয়া রোমীয় ইতিহাসের সতী লক্ষ্মী সম্ভ্রান্ত ললনা। শেক্ষপীরের লেখনীও তাঁহাকে সম্মান করিয়াছে।

† লা ভালিয়ার চতুর্দশ লুইর প্রথম নায়িকা— দেবস্বভাবা রমণী, দেব-কন্যার ন্যায় রূপ-মোহিনী।

যূথিকানুরূপিণী দুঃখিনী যুবতীও বাহুবল-দৃপ্ত ও বহিঃসম্পদ-মত্ত মনুষ্যসমাজে যত কেন উপেক্ষার বস্তু হউক না, উহার সহিত প্রকৃতির অধিকতর ঘনিষ্ঠ এবং অধিকতর গূঢ়-গভীর স্নেহ সম্বন্ধ। কেননা, উহা অনন্ত ধামের অধিকারী চৈতন্যময় জীব। সুতরাং উহাও সেই প্রেমময়ের বিধানলীলায় উৎকৃষ্টতর গতি প্রাপ্ত হইয়া, আর-এক স্থানে, আর-একভাবে বিকশিত হইবে— এবং উহার সেই অভিনব জীবন উহাকে অধিকতর শক্তি ও সম্পদ দান করিয়া, তাঁহার সান্নিধ্যের দিকে আর-একটি সোপান ঊর্ধ্বে লইয়া যাইবে।

আজি আমরা পাঠকবর্গকে একটি মর্মদলিত মানব-যূথিকার দুঃখের কাহিনী উপহার দিলাম। পাঠক দেখিতে পাইবেন যে বিশ্বনিয়ন্তার বিশ্বদর্শিনী ও বিশ্বরক্ষিণী স্নেহদৃষ্টি আলোকে ও অন্ধকারে, নগরে ও কান্তারে এবং প্রাসাদে ও পর্ণকুটীরে সর্বত্র সমান। যে যেখানে জীবের সুখ শান্তি ও উন্নতি-কামনায় যাহা কিছু ভাল করিতেছে, তাহা প্রকৃতির প্রেমসূত্রে গ্রথিত হইয়া পুরস্কারের প্রীতিপদ কুসুমমালায় পরিণত হইতেছে। সে মালা একদিন তাহার কণ্ঠে শোভা পাইবে। তাহার তাপিত প্রাণ মালার প্রাণ-শীতল পীযূষ স্পর্শে কৃতার্থ হইবে। আর, যে যেখানে জীবের অসুখ অশান্তি ও অবনতির দিকে যাহা কিছু মন্দ করিতেছে, তাহাও প্রকৃতির স্মৃতিসূত্রে গ্রথিত হইয়া পরিশোধ ও পরিশোধনের বজ্র ও বহ্নিরূপে পরিণত হইতেছে। সে বজ্র একদিন তাহার বুকে পড়িবে ; সে বহ্নি, স্বর্ণশোধক পার্থিব বহ্নির ন্যায়, এক সময়ে তাহাকে পোড়াইয়া পোড়াইয়া দেবতার ন্যায় পবিত্র করিয়া লইবে।

আত্মিক-কাহিনী

[বন-যূথিকা ও বন্য বর্বর]

জামেকা একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ। জামেকা ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান দ্বীপমালার কণ্ঠবিচ্যুত ও দূরবিক্ষিপ্ত মধ্যমণির ন্যায় কারিব সাগরে অবস্থিত। ইহা পূর্বে স্পেনের অধিকারে ছিল। শেষে রত্নাকর-তরঙ্গ-বিলাসী রত্নভোগী বৃটিশরাজ ইহাকে আপনার অঙ্গাভরণ করিয়া লইয়াছেন। কিউবা দ্বীপের নাম সকলেই শুনিয়াছেন। কিউবা উপলক্ষে সে দিন আমেরিকা যুক্ত-

রাজ্যের সহিত স্পেনের যে সংঘর্ষ ঘটিয়াছিল তাহাও বোধ হয় বিস্মৃতির অন্ধকারে ডুবিয়া যায় নাই। কিউবা ও হেইতি প্রভৃতি দ্বীপ উত্তর দিকে জামেকাকে অতলান্ত বা আটলাণ্টিক মহাসাগরের উত্তাল তরঙ্গরাজি হইতে রক্ষা করিতেছে। পূর্ব দিকে মেক্সিকো সাগরের ঊর্মিমালা প্রণালীপথে উঁকি দিয়া প্রতিনিয়ত জামেকার সংবাদ লইতেছে। পশ্চিম দিকে আটলাণ্টিক মহাসাগরের অনন্ত বিস্তার ধূ ধূ দূরে যাইয়া চন্দ্র, সূর্য ও গ্রহ-নক্ষত্রখচিত প্রকৃতির নীলাম্বরকে সসম্ভ্রমে চুম্বন করিতেছে। দক্ষিণে কারিব-সাগরের পরপারে পানামা-যোজক। পানামার ক্ষীণ তনু দুই পার্শ্বে দুই অতল সমুদ্রের উন্মত্ত আস্ফালন নিত্য সহিয়া লইয়া আমেরিকার উত্তর ও দক্ষিণ, অর্থাৎ সাম্য ও স্বাধীনতা এবং দাসত্ব ও প্রভুত্বের দুই বিরাট রঙ্গভূমিকে শত প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও যেন কোন মন্ত্রবলে একসূত্রে গাঁথিয়া রাখিয়াছে। জামেকা দক্ষিণ দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া যেন সেই তত্ত্বেরই রহস্যচিন্তা করিতেছে।

ইংলণ্ডের দুই-তিনটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাউণ্টি বা শায়র একত্র করিলে যতটুকু হয়, জামেকা আয়তনে তাহা অপেক্ষা বড় নহে। ইহার দৈর্ঘ্য পূর্ব-পশ্চিমে; প্রস্থ উত্তর-দক্ষিণে। ইহার প্রায় ঠিক মধ্য দিয়া পূর্ব হইতে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত সুদীর্ঘ পর্বতশ্রেণী। এই বিস্তৃত পর্বতমালার নাম 'ব্লু মাউনটেন্' বা নীলগিরি। নীলগিরির শ্যামশিখর স্থানে স্থানে অভ্রভেদী ও তুষারমণ্ডিত। জামেকা পর্বতের এই পাষাণময় কটিবন্ধ কোমরে বেষ্টিয়া তরঙ্গায়িত সাগরবক্ষে প্রফুল্লমুখে বিরাজমান। ইহার একদিকে কুসুম-গুচ্ছ-সজ্জিত লতাকুঞ্জ, আর-একদিকে ফলভারাবনত তরুরাজি; একদিকে বিবিধ বিহঙ্গের কলকুজন, আর-একদিকে পর্বত-বাহিনী শত স্রোতস্বিনীর উচ্ছ্বসিত আনন্দধারা। জামেকাকে দ্বীপ বলিলেও হয়; প্রকৃতির সাগর-বিলাসিনী বিহারভূমি বলিলেও চলে।

নীলগিরির উত্তর ও দক্ষিণ উভয় দিক্ দিয়া প্রায় একশত কুড়িটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিত। কিন্তু এই সকল নদী এমন অল্প পরিসরা ও বেগমতী যে একমাত্র ব্লাক রিভার বা কৃষ্ণা নদী ভিন্ন অন্য কোনটিতেই নৌকা চলিতে পারে না।

জামেকার জলবায়ু বড়ই সুখ-স্ফূর্তিজনক ও স্বাস্থ্যকর। এদেশের পক্ষে যেমন দার্জিলিং, যুক্তরাজ্যের পক্ষে তেমন জামেকা। যুক্তরাজ্যে কাহারও স্বাস্থ্যভঙ্গ ঘটিলে সে জামেকায় যাইয়া জামেকার স্বাস্থ্যপ্রদ

সাগর-সমীরে অচিরেই স্বাস্থ্য লাভ করিয়া থাকে। জামেকায় উত্তাপ দিবাভাগে অতি বেশী হইলে ৯০ ডিগ্রিতে উত্থিত হয় এবং রাত্রিতে ৭০ ডিগ্রিতে নামিয়া পড়ে। জামেকায় বর্ষা হয় বৎসরে দুইবার; একবার বসন্তে, আর-একবার গ্রীষ্মে। জামেকার নৈসর্গিক উপদ্রব প্রধানতঃ দুই— এক ভূমিকম্প, আর বিদ্যুজ্ঝলসিত বজ্রবিঘোষিত ভয়ঙ্কর তুর্নেড (tornado)। ভূমিকম্প অবশ্যই নিত্যকার ঘটনা নহে। কিন্তু তুর্নেড, বসন্তে কি গ্রীষ্মে কখন কি ভাবে কোথায় কি সূত্রে প্রলয় নিনাদে গর্জিয়া আসিবে, তাহার কোনই স্থিরতা নাই। জামেকার রাজধানী কিংস্টন। ফেলমাউথ প্রভৃতি উহার নগর।

জামেকার প্রধান অধিবাসী কৃষ্ণকায় নিগার। কিন্তু ইউরোপীয় শ্বেতাংগাদিগের সংস্রবে এখানে আরও দুটি নূতন জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। একটির নাম 'মুলাটো'। আর-একটির নাম 'কোয়াদ্রুণ'। শ্বেতাংগ পিতা, নিগারী মাতা, অথবা শ্বেতাংগী মাতা, নিগার পিতার সংযোগে উৎপন্ন সন্তানের নাম 'মুলাটো'। শ্বেতাংগ পিতা, মুলাটো মাতা, অথবা মুলাটো পিতা, শ্বেতাংগী মাতার সন্তান 'কোয়াদ্রুণ'। কোয়াদ্রুণেরা শারীরসৌন্দর্যের জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ।

জামেকার এক পাদপ-বহুল পল্লীগ্রামে ডনকানের বাসগৃহ। ডনকান কোয়াদ্রুণ যুবতী। ডনকান বড় সুন্দরী। তাহার পিতামাতা জীবিত ছিল কিনা— এবং সে পিতামাতার অভাবে কোন পিতৃতুল্য আত্মীয়ের আশ্রয়ে কি ভাবে জীবনযাপন করিত, তৎসম্পর্কে কোনরূপ লিপিবদ্ধ বিবরণ পাওয়া যায় না। এ সংসারে লোকে সুখ-সমৃদ্ধিশালিনী পণ্যবিলাসিনীরও ইতিহাস লিখিতে পারিয়াছে— কিন্তু কোনদিনও পর্ণগৃহ-নিবাসিনী পূতস্বভাবা কাঙ্গালিনীর জীবনকাহিনী লিখিতে ভালবাসে নাই। তবে এই পর্যন্ত জানা যায়, ডনকানের বিবাহ হইয়াছিল না। যৌবনের প্রথম স্ফুরণে তাহার রূপরাশি তাহাকে একটি প্রস্ফুট কুসুমের কান্তি প্রদান করিয়া থাকিলেও তাহার চিত্তে কোন পরিবর্তন ঘটিয়াছিল না। সে আপনাকে বালিকা বলিয়া জানিত, বালিকার শুদ্ধ ও সরল প্রাণে সকলকেই সমান ভালবাসিত— এবং বালিকার অমায়িক স্বাধীনতায় এখানে সেখানে ঘুরিয়া বেড়াইত।

একদিন প্রতিবেশীরা দেখিতে পাইল ডনকান তাহার গৃহে নাই। শূন্য কুটীর সে সুন্দরী কাঙ্গালিনীর অভাবে অন্ধকার। সে বন্য যূথিকার

প্রফুল্ল জ্যোতিঃতে আর সে স্থান আলোকিত নহে। যাহারা ঐ রূপসী বালিকারে প্রাণের অকৃত্রিম অনুরাগে স্নেহ করিত, সম্ভবতঃ তাহাদেরই কেহ সর্বাগ্রে ডনকান কোথায় গেল একবার খুঁজিয়া দেখা আবশ্যক মনে করিল। কিছুকাল পরে পুলিশে খবর পহুঁছিল যে, বড় রাস্তার অদূরে একটা নির্জন স্থানে ডনকানের মৃতদেহ বিদলিত অবস্থায় পাড়িয়া রহিয়াছে। পুলিশ অমনি অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। শব যথাস্থানে আনীত ও পরীক্ষিত হইল।

কলিকাতায় করোনারের অফিস আছে। কোন হত্যাব্যাপার সংঘটিত হইলে করোনার, ডাক্তার ও জুরি সহযোগে শব-পরীক্ষার দ্বারা হত্যার প্রকার ও প্রণালী অবধারণ করেন। জামেকাতেও এইরূপে করোনারের বিচার-প্রথা প্রচলিত আছে। ডনকানের শব পরীক্ষা করিয়া করোনার ও ডাক্তার সিদ্ধান্ত করিলেন যে কোন বলবান্ ব্যক্তি বলপ্রয়োগে বালিকার সর্বনাশ করিয়াছে এবং সেই পাশব অত্যাচারের অসহ্য ক্লেশে উহার মৃত্যু ঘটিয়াছে। কোন্ নিষ্ঠুর নরপিশাচ জামেকার ঐ বনশোভিনী যূথিকাটিরে এমন করিয়া পদদলিত করিল? কে সে দুর্বৃত্ত? কোথায় সেই রাক্ষসের অবস্থান? ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় গর্জিয়া উঠিয়া পুলিশ এই অনুসন্ধানে সমগ্র জামেকাকে তোলপাড় করিয়া তুলিল। কিন্তু কোন দিক্ দিয়া হত্যার কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না। একটি বৎসর ঘুরিয়া গেল, আসামী ধরা পড়িল না। গভর্নমেণ্ট বৃহৎ পুরস্কার ঘোষণা করিলেন। তথাপি কিছুই হইল না।

ইতিমধ্যে পেণ্ড্রিল ও চিতি নামে দুটি বলিষ্ঠ নিগার যুবক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপরাধে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইল। একজনের দণ্ড হইল একস্থানে, অন্যজনের দণ্ড হইল আর-একস্থানে। একজনের এক অপরাধে। অন্যজনের আর-এক অপরাধে। একজন প্রেরিত হইল কিংস্টনের সংশোধিনী কারায়। আর-একজন প্রেরিত হইল দ্বীপের উত্তরাংশে ফেলমাউথের জেলে। এই দুই স্থানের দূরত্ব আশী মাইল। চিতিও জানে পেণ্ড্রিল দণ্ডিত হইয়াছে; পেণ্ড্রিলও জানে চিতি জেলে গিয়াছে।

দণ্ড দীর্ঘব্যাপী নহে। একদিন দুইদিন করিয়া দিন যাইতেছে, আর তাহাদিগের দণ্ডের ভার লঘু হইয়া আসিতেছে। এই ভাবে আর কয়েকটি দিন কাটিয়া গেলেই তাহারা কারাগার হইতে মুক্তি পাইয়া নিজ নিজ বাসস্থানে যাইতে পারে। তাহারা যখন আশায় এইরূপ উল্লসিত,

তখন একদিন রাত্রিকালে একজন কিংস্টনের সংশোধিনী কারায়, অন্যজন ফেলমাউথের কারাগারে, পরস্পর আশী মাইল দূরে—একসঙ্গে প্রায় একই সময়ে নিদ্রিত অবস্থায় চীৎকার করিয়া উঠিল। পেণ্ড্রিলের চীৎকারে যে কথা, চিতির চীৎকারেও প্রায় সেই কথা। দুজনে দুই স্থানে যেন কার কিরূপ ছায়ামূর্তি দর্শন করিয়া, কাহাকে যেন প্রত্যক্ষ লক্ষ্য করিয়া, একই ভাবে কাকুতি মিনতির সহিত কহিতে লাগিল— 'তুমি— তুমি— ডনকোন তুমি! পায়ে ধরি— পায়ে ধরি— এখনই এখান হইতে সরিয়া যাও। ডনকোন, আমি তোমার কাছে অপরাধী। তুমি দেবতা হইয়াছ, —ক্ষমা কর— পায়ে ধরি— ক্ষমা কর। ওঁক-ওঁক—ঐ আগুনের হাত, —ঐ আগুনের হাতে আমাকে ধরিও না।'

একদিন নহে, দুদিন নহে—কিছুকাল ব্যাপিয়া ক্রমাগত প্রতি রাত্রিতে প্রায় একই সময়ে, একই ভাবে, প্রায় একই রকমের উক্তিতে দুই স্থানের দুই কারাগারে পেণ্ড্রিল ও চিতি নামক দুটি বন্দী নিদ্রিত অবস্থায় ডনকোনকে সম্ভাষণ করিয়া আর্তনাদ করিতে লাগিল এবং তাহাদিগের ঐরূপ ছায়া-দর্শন ও আর্তনাদের কথা ক্রমে সর্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়িল। প্রথমে কারারক্ষীরাই ইহা শুনিতে পাইল। কথা ক্রমে ঊর্ধ্বতর কর্তৃপক্ষের কানে পহুঁছিল। কর্তৃপক্ষ উভয় স্থানের রিপোর্ট মিলাইয়া যারপরনাই বিস্মিত ও একান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইলেন। তবে কি ডনকোনের হত্যার সহিত এই ঘটনার কোন সম্পর্ক আছে? সকলের মনেই এই সন্দেহ ক্রমে প্রবল হইয়া উঠিল। পেণ্ড্রিল ও চিতিকে লইয়া ডনকোনের হত্যা বিষয়ে পুনরায় বিশেষ যত্ন ও আগ্রহের সহিত অনুসন্ধান আরম্ভ হইল।

একদিকে প্রতি রাত্রিতে নিদ্রাবেশে উৎকট বিভীষিকা দর্শন, অন্যদিকে পুলিস ও কর্তৃপক্ষের প্রশ্নপীড়ন। পেণ্ড্রিল ও চিতি উভয়েই অবশেষে অপরাধ স্বীকার করিল। তাহারা কোথায় কিভাবে কিরূপ দুঃসহ পাশবিক অত্যাচারে বালিকা ডনকোনের ধর্মনাশ ও সেই সূত্রে প্রাণনাশ করিয়াছে, সমস্ত বিবরণ খুলিয়া কহিল। অবশেষে বিচারে উভয়েই দোষী সাব্যস্ত হইয়া কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত হইল।

এই অভিনব, অদ্ভুত ও বিস্ময়কর কাহিনীটির প্রামাণিকতার জন্য 'এনাটমী অব্ স্লীপ' (Anatomy of Sleep) অর্থাৎ নিদ্রার বিশ্লেষত্ব নামক গ্রন্থপ্রণেতা প্রসিদ্ধ ডাক্তার এডোয়ার্ড বিনস এম. ডি. মানব-জগতের

নিকট দায়ী। ডাক্তার বিনুসের জামেকাতে অবস্থান সময়ে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল। স্থানীয় গভর্নর স্যার চার্লস মেটকাফ তাঁহার প্রিয় সুহৃৎ ছিলেন। তিনি সেই গভর্নরের সাহায্যে স্বয়ং ইহার আমূল অনুসন্ধান করিয়া এই কাহিনীটি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন ; এবং রবার্ট ডেল ওয়েন প্রভৃতি বহুমানাস্পদ পণ্ডিতেরা তাঁহারই সাক্ষ্য ও সম্মানের উপর নির্ভর করিয়া ইহা সবিশেষ সমালোচনা করিয়াছেন।

এইক্ষণ প্রশ্ন এই যে, এই ঘটনার অর্থ কি ?— ইহা কি কল্পনা-সম্ভূত অলীক স্বপ্ন মাত্র ?— না, ছায়ামূর্তিতে প্রকাশিত পরলোকগত আত্মার পার্থিব ক্রিয়া ? স্বপ্ন হইলে, পরস্পর আশী মাইল দূরে দুই ব্যক্তির অন্তরে একই সময়ে একই ভাবে একই স্বপ্নের এই প্রকার প্রাত্যহিক আবেশ কিরূপে সম্ভবপর হয় ? কেহ অনুমান করিতে পারেন যে, ইহা অপরাধক্লিষ্ট বিবেকের আত্মপীড়ন। বিবেকের বিষদংশন কোন অংশেও অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু দুই অপরাধী দুই স্থানে থাকিয়া একই প্রকার মূর্তিদর্শনে ভয় পাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিবে কেন ? আর তাহারা ডনকানের মূর্তি-দর্শন সম্পর্কে মিথ্যা কথা কহিয়া আপনাদিগের মাথার উপর রাজদণ্ডের অমন কঠোর বজ্রই বা ডাকিয়া আনিবে কোন স্বার্থে ? প্রকৃত কথা অন্যরূপ। পৃথিবীর প্রমোদ লীলা-মুগ্ধ জড়পিঞ্জররুদ্ধ অভিমানী মনুষ্য সেইটাই বুঝিতে চাহে না— বুঝিলেও সহজে বিশ্বাস করিতে ভালবাসে না। কিন্তু যিনি একটু ভাবিয়া দেখিবেন, তাঁহারই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিবে যে, হতভাগ্য ওয়াকারের অধিকতর হতভাগিনী গৃহসঙ্গিনী গ্রেহামকে দেখা দিয়াছিল যে উদ্দেশ্যে, —দুঃখিনী ডনকান তাহার দুঃখ-দুর্গতির কারণ স্বরূপ কারাবাসী যুবকদ্বয়কেও দেখা দিয়াছে সেই উদ্দেশ্যে। উভয়েরই প্রাণের মধ্যে প্রতি-হিংসার ভয়ঙ্কর বহ্নিশিখা। ইহা আত্মার আশানুরূপ উন্নতির বিঘ্নবিশেষ। বন-যূথিকা ডনকান এই বিষজ্বালা হইতে মুক্তি পাইলেই দেবভোগ্য নন্দনবনে পুনরায় দেব-যূথিকার ন্যায় ফুটিতে পাইবে। কিন্তু যাহারা অপরাধী, তাহারা এখানে এড়াইলেও, সেখানে যাইয়া অনুতাপের আগুনে শোধিত হইবে। এই পরিশোধ ও পরিশোধন ব্যবস্থার অন্যথা নাই।

চতুর্থ অধ্যায়
উপক্রম

'All Evolution is an awakening to Higher realization.'

*   *

'Discovery, Desire and Development are the Successive Steps of Progress.'

'সম্মুখে অনন্ত কাল— অনন্ত উন্নতি ;
ইহাই অদৃষ্ট রেখা, বিধাতার কর-লেখা,
সুখ-দুঃখ পরীক্ষিত মঙ্গল্য-নিয়তি ;—
অনন্ত আকাঙ্ক্ষা-রথে, অনন্ত কর্মের পথে,
বিশ্বময় জীবনের নিয়মিত গতি—
নিজ নিজ কর্ম-ফলে, আনন্দে বা অশ্রুজলে,
বিকাশ-বৈচিত্র্যধর্মে ক্রম-পরিণতি—
শেষ-চিত্র সৌন্দর্যের অনন্ত মুরতি।'

ত্রয়োদশ বৎসরের তরল-নয়না বালিকা দৈবজ্ঞের হাতের উপর আপনার কচি হাতখানি তুলিয়া দিয়া একবার আশায় মৃদু মৃদু হাসিতেছে ; আবার বুঝি দৈবজ্ঞের মুখখানি একটুকু ভার দেখিয়া— ভয়ে ধুক ধুক করিতেছে ; এবং মাঝে মাঝে মায়ের চক্ষের দিকে সলজ্জ চক্ষে তাকাইয়া যেন চোখে চোখে কি কহিতে চাহিতেছে। তাহার ঐ ঈষন্মুকুলিত প্রাণের অর্ধসঞ্জাত আশা কি পূর্ণ হইবে ? বালিকা কি মনের মত বর পাইয়া —সে যেরূপ সুশীল সুন্দর সুমধুর ভাষা বরের কথা দিদিমার কাছে শুনিয়াছে সেইরূপ সোনার চাঁদ বরের কণ্ঠমালা হইয়া— কোনদিন আনন্দে ভাসিবে ? সাড়ে তের বছর বয়স। এ বয়সে তাহার কতই বা বুদ্ধি হইতে পারে ? কিন্তু বালিকা বুঝুক আর না বুঝুক তাহার আত্মার অন্তস্থলে ঋষিদিগের উপদিষ্ট অদৃষ্টবাদ। যে অদৃষ্টবাদ কৃষ্ণোক্ত মহাবাক্যের অর্থানুবাদে ঈশ্বরকে জগতের সর্বসাক্ষী সর্বময় সজীব-সত্তা এবং ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সমস্ত কার্যের সতত-ক্রিয়াশ্বিত সাক্ষাৎ নিয়ন্তা বলিয়া উপদেশ করে, বালিকার হৃদয় সেই অদৃষ্টবাদের অস্ফুটভাবে পরিপূর্ণ।

এইরূপ আবার তিরাশি বৎসরের বিষয়-চিন্তামগ্ন বিরস কঠোর বৃদ্ধ। আর বেশী দিন বাকী নাই; তথাপি তাঁহার মন ঐ বিষয়ের কথা ছাড়া আর কিছুতেই আকৃষ্ট হয় না। তিনি চিরজীবন বহুলোকের হৃদয়রক্ত শোষণ করিয়া বিত্ত সঞ্চয় করিয়াছেন। তাঁহার সেই বিষয়-বিত্ত, সেই তিল-তিল সঞ্চিত শত তাল পরিমিত সম্পত্তি, উচ্ছৃংখলচারী আত্মজবর্গের উদ্দাম ভোগ-বাসনার ভীষণ ঝটিকায় ভগ্নস্তূপের ন্যায় উড়িয়া যাইতেছে। তিনি দৈবজ্ঞকে হাত না দেখাইয়া জ্যোতির্বিদের নিকট কোষ্ঠিপত্র লইয়া বসিয়া আছেন। তিনি এতদিন আপনাকেই কর্তা বলিয়া জানিতেন, এখন বুঝিয়াছেন যে, কর্তার উপরও কর্তা আছেন। সেই সর্বেশ্বর কর্তা, তাঁহার কর্মফলের স্বাভাবিক পরিণাম স্বরূপ কপালে কি লিখিয়া রাখিয়াছেন তাহা বুঝিবার আর পথ না পাইয়া, জ্যোতির্বিদকে তিনি কোষ্ঠী দেখাইতেছেন। বলা বাহুল্য যে, তাঁহার আত্মার অন্তঃপ্রকোষ্ঠে ঐ ভয়ংকর অদৃষ্টবাদ।

অদৃষ্টবাদ ইয়ুরোপ প্রদেশেও বহুকাল হইতে বহুসহস্র জ্ঞান-বৃদ্ধ বিচক্ষণ ব্যক্তির বিশ্বাসের বস্তু। গ্রীকগুরু সক্রেতিস অদৃষ্ট মানিতেন। রোমক-বীর সিজর অদৃষ্টে বিশ্বাস করিতেন; এবং অধুনাতন পৃথিবীর অদ্বিতীয় কর্মবীর, বীরচূড়ামণি বোনাপার্টি অদৃষ্টলিপির অখণ্ডনীয়তার উপর নির্ভর করিয়াই কিবা যোদ্ধবেষ্টিত রণক্ষেত্রে, কিবা জিহ্বা-যুদ্ধ-কল-কলায়িত জাতীয় প্রতিনিধি সভায় অটল ও অক্ষুব্ধ দণ্ডায়মান রহিতেন।

ফলতঃ, অদৃষ্টবাদ বড় বিষম সমস্যা— জ্ঞানজগতের অতি বড় গভীর রহস্য। এক দিকে মনুষ্যের স্বাধীনতা অথবা স্বেচ্ছাতন্ত্র গতি; আর-একদিকে অদৃষ্টের অনুল্লংঘনীয় বিধি, এবং অনন্ত উন্নতিমূলক মংগল্য নিয়তি। এই দুইয়ের দার্শনিক সামঞ্জস্য কিরূপ কঠিন কথা, তাহা চিন্তাক্ষম ব্যক্তিকে বিবরিয়া বলা অনাবশ্যক। মনুষ্য কখন কি করিবে এবং তাহার কৃতকর্মের অবশ্যম্ভাবী ফল তাহাকে কোথায় লইয়া পহুঁচাইবে, তাহা যদি অনাদি কাল হইতে আগাগোড়া শৃংখলিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার কর্ম-সম্পর্কিত স্বাধীনতা ও কর্মসূত্রিত দায়িতার আর অর্থ কি? কিন্তু এই স্বাধীনতা ও কর্মসূত্রিত দায়িতা সত্ত্বেও অদৃষ্ট অথবা নিয়তির আধিপত্য একেবারে অস্বীকার করা মনুষ্যের পক্ষে অসাধ্য। মনুষ্য অনেক সময় যাইতে চায় উত্তরে; কিন্তু সে কেমন

এক প্রকার অচিন্তিত ও অপরিজ্ঞাত অবস্থাচক্রের আবর্তে পড়িয়া বাধ্য হইয়া যায় দক্ষিণে। হার্বার্ট স্পেন্সার ও ফিস্কে প্রভৃতি বিজ্ঞান-দৃঢ় দার্শনিকেরা ভারতীয় ঋষির অদৃষ্টবাদ অথবা বোনাপার্টির (Destiny) নিয়তিতত্ত্বে বিশ্বাস করিতে চাহেন না। কিন্তু তাঁহারা যুগ-যুগান্তর প্রবর্তিত Evolution (ক্রম-বিকাশ) ও Environment অর্থাৎ আবরণিক অবস্থার শাসনী-শক্তিকে যেরূপে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়াছেন, তাহার সহিত অদৃষ্ট-লেখার বড় বেশী পার্থক্য নাই।

যাঁহারা দেহান্তর-প্রাপ্ত হইয়া দেবধামের অধিকারী হইয়াছেন; অথবা এখনও কর্মফল-পরীক্ষার অধীন রহিয়া মাঝে মাঝে পৃথিবীবাসী সুহৃৎ স্বজনকে প্রতিশ্রুতির অনুরোধে কিংবা প্রীতি ও প্রয়োজনের অনুশাসনে দর্শনদানে বিস্ময়ে ডুবাইতেছেন, তাঁহারাও কতকটা অদৃষ্টবাদী; 'পরিণামে পূর্ণ মঙ্গল' এই মহাসত্যের উপাসক হইয়াও অদৃষ্টে বিশ্বাসী। যদি পৃথিবীর মনুষ্যই মনুষ্যের ভাবি-জীবন-সম্পর্কিত শুভাশুভ ঘটনার কথা কিঞ্চিৎ পরিমাণে অবগত হইতে পারে, তাহা হইলে যাঁহারা পরপারে যাইয়া জীবনের গতিবিধি বিষয়ে অপেক্ষাকৃত গূঢ় জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা যে সে বিষয়ে অধিকতর অভিজ্ঞ হইবেন, ইহাতে আশ্চর্যের বিষয় কি?

আমরা আজি পাঠকের নিকট একটি পুরাতন ও প্রসিদ্ধ অধ্যাত্ম-কাহিনী উপস্থিত করিতেছি। পাঠক এই প্রকৃত ঘটনামূলক পারিবারিক ইতিবৃত্তের আদ্যোপান্ত আলোচনা করিলে দেখিতে পাইবেন যে, আমরা যাহা চক্ষে দেখিতেছি না, অন্যেরা তাহা দেখেন; আমারা যাহা কর্ণে শুনিতেছি না, অন্যেরা অদৃশ্যরূপে কাছে কাছে থাকিয়া সতত তাহা শুনেন; এবং আমরা আত্ম-সম্পর্কে কোনক্রমেই যাহা জানিতে পারিতেছি না, অন্যেরা সূক্ষ্মতর দৃষ্টির সাহায্যে সর্বদা তাহা জানিতে পান। পাঠকের ইহাও প্রতীতি হইবে যে, আমাদিগের পার্থিব জীবনের পূর্বাপর সমস্ত ইতিহাস ঊর্ধ্ব জগতে পটের ন্যায় চিত্রিত রহিয়াছে; সে পটে জীবনের কর্মানুসারে যখনই নূতন রেখা পড়িতেছে, তখনই তাহা আলোচনার বিষয়ীভূত হইয়া আত্মীয়জনের হৃদয়ে আনন্দ অথবা অবসাদ জন্মাইতেছে, অথচ আমরা তাহার কিছুই না জানিয়া, কিংবা জানিবার জন্য কিঞ্চিৎমাত্রও যত্ন না করিয়া কখনও অভিমানের স্ফুরণে, মশক ও পিপীলিকের অনুকরণে, পরের প্রাণে দংশন করিতেছি, কখনও বা লোভ ও

লালসার অধীন হইয়া, পরের স্বত্ব কাড়িয়া লইতেছি, অথবা আপনার অমূল্য প্রাণটি পাশব-পিপাসার দুর্বারস্রোতে ভাসাইয়া দিয়া কিছুকালের তরে যেন একেবারে মনুষ্যত্ব হইতে পরিভ্রষ্ট হইতেছি। মনুষ্যের হৃদয় মনুষ্যমাত্রকেই সময়ে সময়ে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে, কত কাল— আর কত কাল, ইচ্ছা করিয়া এইরূপ অন্ধ রহিবে ?

আত্মিক-কাহিনী

[কর্মফলের ভয়ংকর পরিণাম]

ইংলণ্ডের পশ্চিম-প্রান্ত-শোভী আইরিশ সাগরের পরপারে মন্দাকিনী মেখলা অমরাবতীর ন্যায় সাগরাম্বরা আয়র্লণ্ডের কোন সমৃদ্ধ গৃহে একটি সুকুমারমতি বালক ও কুসুম-কলিকা-সদৃশী সুন্দরী বালিকা, একই পিতামাতার প্রযত্ন-রক্ষিত ভ্রাতা ও ভগিনীর ন্যায় গলায়-গলায় গাঁথা ছিল। বালক ও বালিকা এক পিতামাতার সন্তান নহে। কিন্তু উভয়েই পিতৃহীন, এবং উভয়েই অতি শৈশব হইতে বৃন্তচ্যুত মুকুলের মত নিরবলম্ব। উভয়েরই আবার অভিভাবক ও পরিরক্ষক এক ব্যক্তি। অভিভাবক প্রৌঢ়বয়স্ক— স্নেহশীলতা ও মধুরতা প্রভৃতি পুণ্যগুণে শিশুজনের একান্ত প্রিয়। বালক ও বালিকার শিশুবুদ্ধি অভিভাবককেই পিতা বলিয়া বুঝিত এবং আপনাদিগকেও পরস্পর ভ্রাতা ও ভগিনী বলিয়াই মনে করিত। শিশু দুটির বিশ্রাম ও ভোজন একত্র, বিশ্রব্ধ ভ্রমণ এবং শৈশবের শিক্ষা ও দীক্ষা, ক্রীড়া ও কৌতুক একই সঙ্গে ও একই মন্ত্রে। এই দুই শিশু কালে ইংলন্ডীয় সমাজে লর্ড টাইরণ এবং লেডী বেরেস্‌ফোর্ড নামে বিশেষরূপে পরিচিত হইয়া ছিলেন। আমরাও এই প্রবন্ধে এই দুই নামেই তাঁহাদিগের কথা লিখিব। লর্ড টাইরণ এবং লেডী বেরেস্‌ফোর্ডের জীবনের আরম্ভ অভিভাবকের নিতান্ত আশাপ্রদ হইল।

অভিভাবক নিতান্ত সুশীল ও সজ্জন হইয়াও ধর্মবিষয়ে বড় সন্দিহান ছিলেন। তিনি নামমাত্র ঈশ্বর মানিতেন ; কিন্তু প্রার্থনার আবশ্যকতা ও পরলোক মানিতেন না। শিশু দুটিও অভিভাবক ও শিক্ষকের ধর্মভাব, মাতৃস্তন্যের ন্যায় পান করিয়া প্রথম বয়সেই পরকাল-তত্ত্বে

একপ্রকার সন্দিহান হইয়া উঠিল। কিন্তু তাহাদিগের এই শিক্ষা দীর্ঘস্থায়িনী হইল না। তাহাদিগের বয়স যখন চৌদ্দ বৎসর, তখন তাহাদিগের সেই পিতৃস্থানীয় অভিভাবক ইহলোক হইতে অন্তর্ধান করিলেন। যাঁহারা অতঃপর তাহাদিগের অভিভাবক স্বরূপ হইলেন, তাঁহাদিগের ধর্মমত স্বতন্ত্র। তাঁহারা পরকালে বিশ্বাসবান্, প্রার্থনা-ধর্মে রীতিমত দীক্ষিত। বালক-বালিকা এখন নূতন অভিভাবকদিগের মুখে ধর্ম বিষয়ে নূতন তত্ত্বের নূতন কথা শুনিতে পাইল। ইহাতে তাহাদিগের পুরাতন বিশ্বাস কতকটা টলিল বটে, কিন্তু সে শৈশব-সংস্কার সমূলে উন্মূলিত হইল না। তাহাদের চিত্তক্ষেত্রে একটা প্রবল সন্দেহের ভাব, বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের নিরন্তর বিরোধে একেবারে বদ্ধমূল হইয়া রহিল।

কতিপয় বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। বালক আর এখন অভি-ভাবকের মুখ-প্রেক্ষী শিশু নহে; লর্ড টাইরণরূপে সংসারে প্রবিষ্ট ও সমাজে প্রতিপন্ন। বালিকাও আর বালিকা নহে, সার্ মার্টিন বেরেস্-ফোর্ডের প্রিয়তমা পত্নী লেডী বেরেস্ফোর্ড। জীবনে পরিবর্ত ঘটিয়াছে। কিন্তু তাঁহাদিগের জীবনসূত্র জড়িত সেই শৈশবসৌহার্দ্যে কিছুমাত্র পরিবর্তন ঘটে নাই। এখনও লর্ড টাইরণ ও বেরেস্ফোর্ড একে অন্যকে ভ্রাতা ও ভগিনীর চক্ষে দর্শন করেন এবং প্রকৃতই অন্তরের সহিত ভালবাসেন। লর্ড টাইরণ স্বভাবে উদার, আকারে প্রিয়দর্শন এবং সৌহার্দ্যের ধর্মে পর্বতের মত অটল। লেডী বেরেস্ফোর্ড রূপবতী, বুদ্ধিমতী, বড়ই উদারপ্রকৃতি এবং প্রীতি ও স্নেহের প্রফুল্ল-ব্রততী। যে তাঁহার সান্নিধ্যে আসিত সেই তাঁহার স্নেহমাধুর্যে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রীতির চক্ষে দেখিত— তিনিও তাঁহার সতত ঢলঢল ভালবাসা লইয়া সর্বদাই সন্নিহিত প্রিয়জনের প্রাণ শীতল করিতেন। তিনি যেন কাহাকেও ভালবাসিতে পারিলেই আনন্দে উৎফুল্ল রহিতেন। তিনি স্বভাবতঃ ধর্মানুরাগিণী ছিলেন। কিন্তু তাঁহার ধর্মবিশ্বাস শৈশবের শিক্ষাদোষে সংশয়দোলায় দোলায়িত থাকিয়া সময়ে সময়ে তাঁহার চিত্তে ঘোরতর অশান্তি উপস্থিত করিত।

দুই পরিবারে প্রগাঢ় প্রণয়। পরস্পর সাক্ষাৎকার ও সময়ে সময়ে একত্র অবস্থানাদি প্রীতিকর অনুষ্ঠান প্রতিনিয়ত চলিতেছে। কিন্তু এখনও লর্ড টাইরণ ও লেডী বেরেস্ফোর্ড ধর্ম-বিষয়ে কোনপ্রকার স্থির

সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিতেছেন না। তাঁহাদিগের মধ্যে একদিন ধর্ম সম্বন্ধে নানা কথা হইতেছিল। কথা প্রসঙ্গে পরকালের কথা উঠিল। তাঁহারা উভয়ে কিছুকাল বাদানুবাদ করিয়া অবশেষে প্রতিজ্ঞা করিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অগ্রে যাঁহার মৃত্যু হইবে, যদি সম্ভবপর হয় তাহা হইলে তিনি অন্যকে অবশ্যই দেখা দিবেন ; এবং পরলোক, জগদীশ্বর এবং কোন্ ধর্ম সত্য ও প্রকৃত প্রস্তাবে ঈশ্বরানুমোদিত তাহা বলিয়া যাইবেন। ইউরোপ প্রভৃতি দেশে প্রণয়ের এই এক প্রথা। অনেকেই এইরূপে প্রতিজ্ঞা-পাশে আবদ্ধ হইয়া থাকেন। এদেশে কেহই কখনও এরূপ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হওয়া আবশ্যক মনে করেন না।

লর্ড টাইরণ বিবাহ করিয়াছেন। তাঁহার একটি কন্যা মাত্র জন্মিয়াছে। লেডী বেরেস্‌ফোর্ডও দুটি কন্যার মা হইয়াছেন। লর্ড টাইরণ ও লেডী বেরেস্‌ফোর্ড আপন আপন গৃহে সুখ-স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতেছেন। কিছু দিন হইল তাঁহাদিগের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ ঘটে নাই। লর্ড টাইরণ কোথায় কেমন আছেন সার্ মার্টিন ও লেডী বেরেস্‌ফোর্ড তাহাও সম্যক অবগত নহেন।

গভীর রাত্রি। লর্ড ও লেডী বেরেস্‌ফোর্ড আপন গৃহে খুব বড় একটা সুসজ্জিত খট্টায় শয়ান রহিয়াছেন। উভয়েই নিদ্রাগত। গৃহে মৃদু আলো জ্বলিতেছে। কোন দিকে কোনরূপ সাড়াশব্দ নাই। হঠাৎ লেডী বেরেস্‌ফোর্ডের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন ; চাহিয়া দেখিলেন লর্ড টাইরণ তাঁহার শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্ট। প্রথম বিস্ময়— লর্ড টাইরণ অমন অসময়ে ওখানে কিরূপে আসিলেন। তারপর সলজ্জ বিরক্তি— কেনই বা তিনি আজ এমন অশিষ্টের ন্যায় পতি-শয্যায় শয়ানা সুন্দরী যুবতীর শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত। একি সত্যই লর্ড টাইরণ ? লেডী বেরেস্‌ফোর্ডের বুক কাঁপিয়া উঠিল। তিনি চীৎকার করিলেন। কিন্তু সে চীৎকারে সার্ মার্টিনের ঘুম ভাঙ্গিল না। চীৎকার যেন কণ্ঠেই নিরুদ্ধ রহিল। লেডী বেরেস্‌ফোর্ড ইহার পর একটু সাহসে ভর করিয়া লর্ড টাইরণের পানে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'একি ভাই ! লর্ড টাইরণ, তুমি এসময়ে এমন অসঙ্গত রূপে কি উদ্দেশ্যে কোন্ পথে কেমন করিয়া এখানে আসিলে ?'

লর্ড টাইরণ কহিলেন— 'সব ভুলিয়াছ ? তোমার কি সেই ভয়ঙ্কর প্রতিজ্ঞার কথাও মনে নাই ? গত মঙ্গলবার অপরাহ্ণ চারিটার সময় আমার

তনুত্যাগ হইয়াছে। ঈশ্বরানুপ্রাণিত হইয়া দেবপুরুষ আমাকে আমার প্রতিজ্ঞাধর্ম পালনার্থ তোমার নিকট উপস্থিত হইতে অনুমতি প্রদান করিয়াছেন।— যাহা মনে ভাবিয়া রাখিয়াছ, প্রকৃত কথা তাহা নহে; পরলোক সত্য, পাপ-পুণ্যের কর্মফল অনিবার্য। যাহা করিতেছ, যাহা বলিতেছ, যাহা ভাবিতেছ, সমস্তই পরলোকে কর্মপটে দৃঢ় অঙ্কিত হইয়া রহিতেছে।

'আরও বলি ঈশ্বর সত্য।— এক অনন্ত প্রেমময় পূর্ণমঙ্গল— ন্যায়-বিধাতা পরমপুরুষ ইহকাল ও পরকাল আবরিয়া রহিয়াছেন। অটল বিশ্বাস ও অবিচল ভক্তির সহিত সেই জগদীশ্বরে আত্ম-সমর্পণই আমাদিগের পরিত্রাণের একমাত্র পথ।' ইহা কহিয়া লর্ড টাইরণ কঙ্কাল নীরব রহিলেন। তারপর আবার কহিতে লাগিলেন, 'আমি ইহাও তোমাকে জানাইতে আদিষ্ট হইয়াছি যে, তুমি সত্বরই পুত্রবতী হইবে; এবং সেই পুত্র কালে আমার কন্যার পাণিগ্রহণ করিবে। কিন্তু ভীত হইও না, অধীর হইও না, তোমার বৈধব্য অনিবার্য। পুত্র জন্মিবার অল্পকাল পরেই সার্ মার্টিন পরলোকগত হইবেন। তাহার কিছুকাল পরে তুমি দ্বিতীয় পতি গ্রহণ করিবে। এই দ্বিতীয় পতির দুর্ব্যবহারে তোমার জীবন নিতান্তই দুর্বহ ও একান্ত দুঃখময় হইয়া উঠিবে। এই দ্বিতীয় পতি হইতে তোমার আগে দুইটি কন্যা ও অবশেষে একটি পুত্র জন্মিবে। পুত্র জন্মিলে এক মাসের মধ্যে ঠিক সাতচল্লিশ বৎসর বয়সের আরম্ভে তোমার মৃত্যু হইবে। কিছুতেই ইহার অন্যথা নাই।'

লেডী বেরেসফোর্ড এই কঠোর ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়া ভয়ে একেবারে আড়ষ্ট হইলেন। তিনি ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া ধীরে ধীরে অতি কাতর-কণ্ঠে কহিলেন, 'আমি এই ভবিতব্য, এইভয়াবহ নিয়তির কোনপ্রকারেই পরিবর্তন ঘটাইতে পারি না কি?'

ছায়ামূর্তি কহিলেন, 'অবশ্যই পার। কেন না পারিবে? তুমি স্বাধীনা, স্বকর্ম ফলভাগিনী আত্মিকা।* তুমিও জগদীশ্বরের প্রিয়তম সন্তান, সেই অনন্ত শক্তির একটি অস্ফুট কলিকা; অনন্তধামের যাত্রিণী— অনন্ত মঙ্গলের অধিকারিণী। সুতরাং তোমার ভবিতব্য সকল সময়েই

---

* আত্মা শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ নাই। কিন্তু আত্মা আর স্বার্থে প্রযুক্ত ইক-প্রত্যয়-নিষ্পন্ন আত্মিক শব্দ একার্থবোধক। সুতরাং স্ত্রীলিঙ্গে আত্মিকা বলা যাইতে পারে।

কিয়দংশে তোমার হস্তে। তুমি দৃঢ় সংকল্পে অধিরূঢ় হইয়া কায়মনপ্রাণে যত্ন করিলে অবশ্যই নিয়তির পরিবর্ত ঘটাইতে পার। কিন্তু সে যত্ন বড় কঠিন কর্ম। দ্বিতীয়বার পতিগ্রহণের প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারিলে তোমার অদৃষ্টের গতি অন্যরূপ হইবে। কিন্তু হায় তুমি জান না তোমার প্রাণে ভোগ ও ভালবাসার তৃষ্ণা এবং প্রীতিসুখলালসা কিরূপ প্রবল; জান না, তোমার প্রবৃত্তিনিচয় কিরূপ শক্তিমান ও দুর্দম। বিশেষতঃ তুমি জীবনে আর কখনও এমন কঠোর পরীক্ষার অধীন হও নাই। দেবপুরুষ আমায় ইহার অতিরিক্ত আর কিছু জানিতে দেন নাই এবং বলিতেও অনুমতি প্রদান করেন নাই। কিন্তু একটি কথা দৃঢ়তার সহিত বলিতেছি, তুমি যদি ইহার পরও মনে ধর্মবিষয়ে অবিশ্বাসের ভাব পোষণ কর তাহা হইলে পরকালে দুর্গতির সীমা থাকিবে না। তাই সাবধান, সাবধান, সাবধান। জগমংগল অনন্তদেবে অটল বিশ্বাস স্থাপন করিয়া জীবনে অগ্রসর হও। মানবজীবন মরীচিকা অথবা মন কল্পিত স্বপ্ন নহে।'

লেডী বেরেসফোর্ড বলিলেন— 'ভাল, একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, পরলোকে যাইয়া তুমি কি সুখী হইয়াছ?' ছায়ামূর্তি উত্তর করিলেন, 'একটুকু সুখে না থাকিলে আমি কখনও তোমার নিকট উপস্থিত হইতে পারিতাম না।'

লেডী বেরেসফোর্ড বলিলেন, 'তবে বুঝিলাম তুমি ওখানে বেশ সুখে আছ।' ছায়ামূর্তি এবার আর উত্তর করিলেন না। তাঁহার অধরপ্রান্তে ঈষৎ একটু হাসির রেখাপাত হইল। অবিশ্বাস, সংশয় ও কুটতর্কের কুশিক্ষায় লেডী বেরেসফোর্ডের হৃদয় তমসাচ্ছন্ন। তিনি এই বিস্ময়কর দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়াও ইহাতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলেন না। পুনরপি কহিলেন, 'তোমার এই দর্শনদান যে প্রকৃত ঘটনা—আমারই মনের একটি অলীক স্বপ্ন-কল্পনা নহে, নিশি প্রভাতে ইহা কিরূপে বুঝিব?'

ছায়ামূর্তি কহিলেন— 'কেন? কল্যই ত আমার মৃত্যুসংবাদ পাইবে।'

লেডী বেরেসফোর্ড বলিলেন, 'আমার তখন সম্ভবতঃ মনে হইবে, এখন যাহা দেখিলাম ও শুনিলাম এ সমস্ত স্বপ্ন; এবং সেই স্বপ্ন দৈবাৎ সত্য হইয়াছে। না, ইহাতে হইবে না, আমি অন্য প্রমাণ চাই।'

ছায়ামূর্তি কহিলেন, 'আচ্ছা, বেশ কথা। তবে চাহিয়া দেখ।'

ইহা বলিতে বলিতে ছায়ামূর্তি তাঁহার বাহু প্রসারিয়া সেই দৃঢ়-কাষ্ঠফলক বিলম্বিত মশারিটার একটা ভাগ হুকের মধ্যে আটকাইয়া রাখিলেন। ঐ হুকটা এত উর্ধ্বে অবস্থিত যে, অন্য বস্তুর সাহায্য ভিন্ন মানুষের পক্ষে এ কার্য একেবারে অসম্ভব।

লেডী বেরেসফোর্ড বলিলেন, 'ইহাও যথেষ্ট নহে। জাগ্রতাবস্থায় আমরা কখনও যাহা পারি না, সময়ে সময়ে নিদ্রিত অবস্থায় তাহা অনায়াসে সম্পাদন করিতে সমর্থ হই। হয়ত মশারির এই অবস্থা দেখিয়া আমি মনে করিব ইহা আমারই নিদ্রিত অবস্থার অনুষ্ঠিত অজ্ঞাত অন্ধ শক্তির কর্ম।'

ছায়ামূর্তি বলিলেন, 'এই ত এখানে তোমার পকেটবুক আর পেনসিল রহিয়াছে। আমি এই পকেটবুকে আমার নাম লিখিয়া রাখিতেছি। তুমি আমার হস্তাক্ষর বিশিষ্টরূপে চিন। প্রভাতে ইহা দেখিলেই বুঝিতে পারিবে আমার এই সাক্ষাৎকার স্বপ্ন নহে— আমি প্রকৃত প্রস্তাবেই সম্মুখে আসিয়া তোমাকে দেখা দিয়াছি।'

আগন্তুক ইহা কহিয়াই পকেট বহিতে নিজের নাম লিখিয়া উহা রাখিয়া দিলেন।

চিরসংশয়াকুলা লেডী বেরেসফোর্ড ইহাতেও পরিতৃপ্ত নহেন। অবিশ্বাসই শিশুকাল হইতে তাঁহার অন্তরের স্বাভাবিক ভাব। যাহা চক্ষে দেখিতেন তাহাতেও বিশ্বাস করিতে চাহিতেন না। তিনি কহিলেন, 'না, ইহাতেও আমার সন্দেহ দূর হইতেছে না। ইহাও তোমার হস্তাক্ষরের অনুকরণে আমারই স্বপ্নাবস্থার লেখা বলিয়া মনে সংশয় থাকিয়া যাইবে।'

ছায়ামূর্তি এবার একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, 'হা বিশ্বাসশূন্য সংশয়িনী! আমি দেখিতেছি কিছুতেই তোমার বিশ্বাস নাই। তোমায় এখনই স্পর্শ করিতে পারিতাম। কিন্তু পরলোকগত আত্মার স্পর্শ, অধ্যাত্মজীবনের যে অবস্থায় পার্থিব জড় শরীরের পক্ষে সুখ প্রীতিকর হয় আমি এখন পর্যন্ত সে অবস্থায় পহুঁচি নাই। আমার এক্ষণকার স্পর্শে তোমার যে অনিষ্ট হইবে ইহজীবনে কিছুতেই আর সে অনিষ্টের প্রতিবিধান হইতে পারিবে না; সে চিহ্ন উঠিয়া যাইবে না।'

লেডী বেরেসফোর্ড বলিলেন, 'চিরস্থায়ী একটা চিহ্ন পড়িবে বইত

নয়? তা পড়ুক, সে সামান্য খুঁতে আমার কি হইবে?'

ছায়ামূর্তি বলিলেন, 'বটে, তোমার মত অসম সাহসিকার পক্ষে এ উক্তি সম্ভবপর। আচ্ছা, তবে হাত বাড়াইয়া দাও।'

লেডী বেরেস্‌ফোর্ড কেমন একপ্রকার মুর্খ অথবা মোহমুগ্ধ নির্বোধের মত ঔৎসুক্যের সহিত হাত বাড়াইয়া দিলেন। ছায়ামূর্তি তাঁহার করগ্রন্থি নিজ অংগুলি দ্বারা বেষ্টিয়া ধরিলেন, রমণীর শরীর সে স্পর্শে শিহরিয়া উঠিল। তিনি উহা তুষারসিক্ত মারবল অথবা বরফ-বলয়ের ন্যায় দুঃসহ শীতল অনুভব করিলেন। ধৃত স্থানের পেশীগুলি তৎক্ষণাৎ সঙ্কুচিত হইয়া আসিল, স্নায়ুগুলি অমনই শুকাইয়া উঠিল। ছায়ামূর্তি কহিলেন, 'যত কাল বাঁচিয়া থাক, এই চিহ্ন কাহাকেও দেখিতে দিও না। ইহা দেখান নিতান্তই বিধিবিরুদ্ধ, কখনও বা বিপজ্জনক।' ইহা কহিয়াই ছায়ামূর্তি নীরব হইলেন। লেডী বেরেস্‌ফোর্ড ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলেন লর্ড টাইরণ কিংবা সেই ছায়ামূর্তি আর সেখানে নাই।

যাঁহারা আত্মিকতত্ত্বে অভিজ্ঞ, তাঁহারা উপদেশ করেন যে পরলোকগত সকল আত্মার স্পর্শই জীবিত মনুষ্যের পক্ষে ক্লেশাবহ নহে। যে সকল আত্মা দয়াধর্মের আনন্দময় মহিমায় দেহ-ভাবাপন্ন, তাঁহাদিগের স্পর্শ সকল অবস্থায়ই সানন্দ ও সুখশীতল। কিন্তু যাঁহারা পরলোকবাসী হইয়াও পার্থিবলালসা ও পাপজ্বালা হইতে সম্পূর্ণ অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন নাই তাঁহাদিগের স্পর্শ পৃথিবীর জীবের পক্ষে অসহনীয় ও আংশিক অনিষ্টকর।

লেডী বেরেস্‌ফোর্ড যতক্ষণ ছায়ামূর্তির সহিত বাক্যালাপে ব্যাপৃত ছিলেন, ততক্ষণ তাঁহার মন ভয় ও ভাবনা সত্ত্বেও কেমন একপ্রকার পরবশ অথবা বিবশ ও জড়ীভূত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল। তিনি তাই কতকটা প্রশান্ত ও প্রকৃতিস্থ ছিলেন। কিন্তু যেই ছায়ামূর্তি অদৃশ্য হইল, অমনই কোথা হইতে কেমন একটা অস্বাভাবিক আতঙ্ক আসিয়া তাঁহাকে অধীর করিয়া তুলিল, তিনি কাঁপিতে লাগিলেন। তাঁহার বোধ হইল যেন সমস্ত ঘর বাড়ী ও খট্টা প্রভৃতি তাঁহার সংগে সংগে থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। তিনি সার্ মার্টিনকে জাগাইতে যত্ন করিলেন। কিন্তু পারিলেন না; তাঁহার মুখে বাক্যস্ফূর্তি হইল না। তিনি এইরূপে ভয়ে ও বিস্ময়ে অনেকক্ষণ পর্যন্ত অসহ্য কষ্ট পাইলেন। কিছুকালের পর তাঁহার প্রাণে লর্ড টাইরণের জন্য শোকের সঞ্চার হইল।

নয়নযুগলে অল্পে অল্পে গলিত ধারায় অশ্রুপাত হইতে লাগিল ; এবং এই অশ্রুপ্রবাহেই যেন ধীরে ধীরে তাঁহার হৃদয়ের অস্ফুট শোক ও অধীরতা ভাসিয়া গেল। শোকার্ত প্রাণ নয়নজলে শীতল হইল। তিনি ইহার পর কোন্ সময় জানেন না ঘুমাইয়া পড়িলেন।

রাত্রি প্রভাত হইল। স্যার্ মার্টিন শয্যা ত্যাগ করিলেন। মশারির প্রতি তাঁহার চক্ষু পড়িল না, তিনি নিত্যনিয়মিত রীতিতে নিঃশব্দে বাহিরে চলিয়া গেলেন। লেডী বেরেসফোর্ড তখনও নিদ্রাগত। কিছুক্ষণ পরে তাঁহারও নিদ্রাভঙ্গ হইল। প্রথমেই মশারির দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। পাছে মশারির সেই অবস্থা-দর্শনে বাড়ীর লোকের মনে কোন প্রকার সন্দেহের উদয় হয়, তিনি এই হেতু দ্রুতগতি শয্যা ত্যাগ করিয়া কার্নিশ পরিষ্কারের সুদীর্ঘ ঝাড়নিটি লইয়া আসিলেন এবং উহার সাহায্যে মশারির ঊর্ধ্বক্ষিপ্ত অংশ উপর হইতে কষ্টে নামাইলেন। অবশেষে করগ্রন্থির সেই চিরস্মরণীয় চিহ্নের উপর তাঁহার চক্ষু পড়িল। তিনি সেই তুষারস্পর্শসঙ্কুচিত কৃষ্ণরেখালাঞ্ছিত চিহ্নের স্থানে তাড়াতাড়ি কাল ফিতা জড়াইয়া স্বামীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। রাত্রির উদ্বেগ ও উপদ্রবের নানাবিধ লক্ষণ তখনও তাঁহার মুখচ্ছবিতে স্পষ্ট প্রতিফলিত ছিল। পতি চিরপ্রফুল্লমুখী ও প্রেমশীলা পত্নীর তথাবিধ বিষাদমাখা মলিন মুখ দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন, 'তোমাকে আজি এমন দেখিতেছি কেন ? কোন অসুখ হয় নাই ত ?' তিনি বলিলেন, 'না, আমি বেশ সুস্থ আছি।' পতি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ও কি ? তোমার কব্জায় ঐ কাল ফিতা বাঁধা কেন ? ব্যথা পাইয়াছ ? হাত মচ্‌কিয়া গিয়াছে কি ?' তিনি বলিলেন, 'না, সে সব কিছু নয়, কিন্তু তোমার নিকট আজি আমি করজোড়ে একটি প্রার্থনা করিতেছি, আমার প্রার্থনা পূর্ণ হইবে ত ? কাকুতি করিয়া বলিতেছি, তুমি এই ফিতা সম্পর্কে কখনও আমাকে কোন প্রশ্ন করিও না। আমি যতকাল বাঁচিব এই ফিতাটিও ততকাল আমার হাতে এমনই বাঁধা থাকিবে। তুমি আমার স্বামী, তুমি আমার প্রাণাধিক। তোমার নিকট আমার কিছুই গোপনীয় নাই। বোধ হয় আমি কখনও তোমার কোন অভিপ্রেত-রক্ষায় কোনরূপ অসম্মতি প্রকাশ কিংবা আপত্তি করি নাই। তুমি জেদ করিলে আমি অবশ্যই ইহার আমূল বৃত্তান্ত তোমার নিকট খুলিয়া বলিতে বাধ্য। কিন্তু তাহাতে তোমার অনিষ্ট ঘটিতে পারে। তাই আমার

বিনীত অনুরোধ তুমি আমাকে এ বিষয়ে ক্ষমা করিবে।' সার্ মার্টিন ঈষৎ হাস্যসহকারে বলিলেন, 'তোমার যখন এই সামান্য বিষয়ে এত অনুরোধ, আমি এ সম্পর্কে তোমাকে আর কখনও কিছু জিজ্ঞাসা করিব না।'

ইহার পরে আর কোন কথা হইল না। প্রাতরাশের কার্য নীরবে সম্পন্ন হইল। লেডী বেরেস্‌ফোর্ড আজি বড়ই উন্মনস্ক। তিনি যেন কোথা হইতে কাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন— যেন কি একটা পাইবার প্রত্যাশায় বারংবার চঞ্চলনয়নে দ্বারের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, আজিকার ডাক আসিয়াছে কি ?' তখনও ডাক আসে নাই। তিনি ক্ষণে ক্ষণেই পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু তখনও ডাক আসিয়া পহুঁচে নাই। সার্ মার্টিন জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি ডাকের জন্য এত আকুল কেন ? ডাকে কোন জরুরি চিঠি আসিবার কথা আছে কি ? তিনি বলিলেন, 'জরুরি আর কি, মৃত্যুসংবাদ— লর্ড টাইরণের মৃত্যুসংবাদ আসিতেছে ! তিনি গত মঙ্গলবার অপরাহ্ণ চারিটার সময় তনুত্যাগ করিয়াছেন।' সার্ মার্টিন বলিলেন— 'আমি জানি তোমার কোনরূপ কুসংস্কার নাই। বোধহয় তুমি কল্য রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিয়াছ ; আর সেই স্বপ্নের অসার ও অলীক কাণ্ড সত্য মনে করিয়াই আজ এমন আকুল ও অধীর হইতেছ।' কথা শেষ হইতে না হইতেই একটি ভৃত্য কালচিহ্নাঙ্কিত একখানি চিঠি লইয়া ঐ ঘরে প্রবেশ করিল ; লেডী বেরেস্‌ফোর্ড চিঠিখানি দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন— 'আহা, যাহা আশংকা করিতেছিলাম, তাহাই হইয়াছে !— লর্ড টাইরণ জীবিত নাই।'

সার্ মার্টিন পত্র খুলিয়া পাঠ করিলেন। পত্রখানি লর্ড টাইরণের স্টুয়ার্ডের লেখা। উহাতে প্রকৃতই লর্ড টাইরণের মৃত্যুসংবাদ। লেডী বেরেস্‌ফোর্ড যে তারিখে, যে সময়ে লর্ড টাইরণের মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া নির্দেশ করিতেছিলেন, ঠিক সেই তারিখে সেই সময়েই ঐ শোকাবহ ঘটনা ঘটিয়াছে। সার্ মার্টিন বিস্মিত হইলেন এবং আপনার মনের আবেগ সংবরণ করিয়া লেডী বেরেস্‌ফোর্ডকে শোক-সংবরণার্থ নানাপ্রকারে সান্তনা ও প্রবোধ দিতে লাগিলেন। লেডী বেরেস্‌ফোর্ড কিয়ৎকাল স্তম্ভিত ও হতবুদ্ধির মত রহিয়া শেষে বলিলেন, 'আমার শোক নাই— আমি অনেকক্ষণ হইল শোক-সংবরণ ও চিত্তের স্থৈর্য সম্পাদন করিয়াছি।

যাহা হউক, এই দুঃখের মধ্যেও তোমাকে আমি একটি আশ্চর্য সংবাদ বলিব। তুমি শীঘ্রই একটি পুত্রসন্তান লাভ করিবে। এ সংবাদে কোন সংশয় করিও না।' সার্ মার্টিন শুনিয়া প্রীতির সহিত বিস্ময় প্রকাশ করিলেন।

নির্দিষ্ট কতিপয় মাস অতীত হইয়া গিয়াছে। লেডী বেরেস্ফোর্ড পুত্রবতী হইয়াছেন। সার্ মার্টিন প্রীত ও প্রফুল্ল। কিন্তু লেডী বেরেস্ফোর্ড তত সুখী হইতে পারিতেছেন না। সম্মুখে বৈধব্যের আশংকা। পতি আর দীর্ঘকাল জীবিত থাকিবেন না, এই ভয়ে ও দুঃখে তাঁহার বুক ভাঙিয়া যাইতেছে। তিনি নির্জনে সদ্যোজাত শিশুর মুখপানে তাকাইতেছেন, আর নীরবে অশ্রুপাত করিতেছেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, ছায়ামূর্তির কথিত একটি কথাও মিথ্যা হইবার নহে। পুত্র জন্মিবার পরে সার্ মার্টিন চারি বৎসর এক মাস মাত্র বাঁচিয়া ছিলেন।

লেডী বেরেস্ফোর্ড এখন বিধবা। তিনি পতিহীনা হইলেও নিঃসম্বলা নহেন ; পতিপরিত্যক্ত প্রচুর ধনসম্পত্তি তাঁহার ভোগ্য। তিনি বিপন্ন হইলেও নগণ্যা নহেন ; এখনও পতির গৌরবান্বিত সুপরিচিত নামেই তাঁর পরিচয়। অপিচ তিনি অনাথা হইলেও অনাশ্রয় নহেন, দুটি কন্যা ও একটি শিশুপুত্র তাঁহার প্রাণের সম্বল। কিন্তু তথাপি তিনি শোকাতুরা এবং অহোরাত্র বিষাদমলিনা ও ক্লিষ্টা। পতিই স্ত্রীলোকের সকল আভরণের শ্রেষ্ঠ আভরণ, সকল সম্পদের সার সম্পদ। বিধবা যুবতী হইলেও বৃদ্ধা ; রূপবতী হইলেও বিরূপা ; এবং প্রাসাদবাসিনী হইলেও পথের কাঙ্গালিনী। প্রাণের অভ্যন্তরে প্রণয়ের স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস ; প্রণয়াস্পদ পতি পরলোকের অন্ধকারে ; শৈশবসুহৃদ সহোদর-সদৃশ লর্ড টাইরণ স্বর্গগত। শোকাতুরা ও দুঃখবিহ্বলা লেডী বেরেস্ফোর্ড চক্ষে অন্ধকার দেখিলেন।

ভারতীয় ঋষির ব্যবস্থানুসারে, বিধবা তপোরত ব্রহ্মচারিণী। লেডী বেরেস্ফোর্ড যে দেশের বিধবা, সে দেশের বৈধব্যব্রতের কোনরূপ কঠোর ব্যবস্থা নেই। কিন্তু তথাপি লেডী বেরেস্ফোর্ড কিঞ্চিৎ পরিমাণে যতিধর্মেরই অনুসারিণী হইলেন। তিনি শোকপরিচ্ছদে শরীর ঢাকিলেন, সর্বপ্রকার সুখসম্ভোগ ও বিলাসবাসনা একেবারে পরিত্যাগ করিলেন, এবং যারপরনাই দীন-দুঃখিনীর প্রাণে দুটি কন্যা ও শিশু পুত্রটিকে বুকে আবরিয়া লইয়া জীবন্মৃতের ন্যায় স্বগৃহে নিরুদ্ধ রহিলেন। লেডী

বেরেস্‌ফোর্ড কোন সমাজে মিশেন না, ভোজ কিংবা আমোদ-প্রমোদে যোগদান করেন না। ছায়ামূর্তির সেই ভবিষ্যৎবাণী তাঁহার প্রাণের ভিতরে প্রতিনিয়তই যেন প্রতিধ্বনিত।

ছায়ামূর্তি বলিয়াছেন— চিত্তসংযম দ্বারা দ্বিতীয় পতি গ্রহণের প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারিলে তাঁহার সমস্ত বিপদ কাটিয়া যাইবে। অতএব তিনি সর্বদাই সে বিষয়ে বিশেষ সতর্ক ও সাবধান। তিনি 'পার্যমাণে' কাহাকেও দেখা দেন না; আপনিও কাহারও পানে মুখ তুলিয়া দৃষ্টিপাত করেন না। মানুষের চক্ষুকে বিশ্বাস কি? আর আপনার চঞ্চল মনের প্রতিই বা আস্থা কি? তিনি প্রায়শঃ কোথাও যান না। যান কেবল একমাত্র প্রতিবেশী ধর্মযাজকের গৃহে। উদ্দেশ্য— ধর্মশিক্ষা ও ধর্মোপদেশ গ্রহণে আত্মার পবিত্রতা লাভ।

কিন্তু নিয়তির নিষ্ঠুর কররেখাকে কোথায় কবে সাধারণ লোকে অতিক্রম করিতে পারে? কালক্রমে এই যাজকগৃহেই লেডী বেরেস্‌ফোর্ডের অধঃপাত ও সর্বনাশের সূচনা হইল। যাজকের এক পুত্র ছিল। পুত্র প্রস্ফুট যুবা ও প্রিয়দর্শন; কিন্তু কুসুমের অভ্যন্তরে বিষকীটের ন্যায় তাহার প্রাণের অভ্যন্তরে অতি প্রবল পাশবলালসা ও আবিল ভোগপিপাসা। একদা কুক্ষণে যাজক-পুত্রের সহিত লেডী বেরেস্‌ফোর্ডের চারি চক্ষে মিলন হইল। যুবকের চক্ষু আর ফিরিল না; লেডী বেরেস্‌ফোর্ডের— সেই সন্তানবতী সুন্দরী বিধবার— বিষাদমাখা মলিন মুখে না জানি কি দেখিয়া কি বুঝিয়া কি এক বিচিত্র মোহে যাজক-পুত্রের লালসাকুল নয়ন লাগিয়া রহিল। লেডী বেরেস্‌ফোর্ড অবনত মুখে চক্ষু ফিরাইয়া লইলেন। অনেকদিন পরে সেই পাণ্ডুর গণ্ডে ক্ষণকালের তরে রক্তিমার সঞ্চার হইয়াছিল। তিনি রুমালের আবরণে তাহা লুকাইয়া ফেলিলেন এবং আপনার দুর্বলতায় আপনি যারপরনাই লজ্জা অনুভব করিয়া ভারাক্রান্ত প্রাণে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। এ সংসারে অনেকে একা থাকিতে পারে না। লেডী বেরেস্‌ফোর্ড এই শ্রেণীর মধ্যে অগ্রগণ্য। তাঁহার হৃদয় শিশুকাল হইতেই একা থাকিবার জন্য অযোগ্য এবং স্নেহ লালসায় দুর্বল। তাঁহার প্রাণটা মহত্ত্ব ও উদারতায় পরিপূর্ণ হইয়াও এমনই গঠিত যে উহা যেন মুহূর্তকালও আপনাতে আপনি পরিতৃপ্ত রহিতে অসমর্থ। তথাপি ভবিষ্যদ্‌বাণী মনে পড়িল। তিনি সংকল্প করিলেন যাজক-গৃহে আর কখনও যাইবেন না।

সংকল্প অতি সহজ কথা। সংকল্প রক্ষায়ই প্রকৃত মনুষ্যত্বের পরিচয়। এইদিন হইতে রূপসী বিধবা দিনে দশবার সংকল্প করিতেন, দশবারই সেই সংকল্প ভুলিয়া যাইতেন। যাজকগৃহে যাতায়াতও প্রকৃত থামিল না। তাঁহার চঞ্চল চিত্ত তাঁহাকে কিছু না বলিয়া না বুঝিতে দিয়া ধীরে ধীরে যেন অজ্ঞাতসারে ঐ যাজক-পুত্রের পক্ষপাতী হইতে লাগিল। তিনি তাঁহার পতিধ্যান-নিরত পবিত্র হৃদয়ের প্রতি চাহিয়া দেখিলেন ; সেখানে যৌবনশ্রী-সম্পন্ন কালসর্পস্বরূপ যাজক-পুত্রের প্রতিবিম্বও চোরের ন্যায় চারিধারে ঘুরিয়া ফিরিয়া বিচরণ করিতেছে। কিন্তু তথাপি তিনি আপনার চিত্তবৃত্তিকে যথাশক্তি সংযত রাখিতে প্রাণপণে যত্ন করিতে লাগিলেন।

যাজক-পুত্র সৈনিকবিভাগে প্রবেশ করিতে কৃতসংকল্প। প্রথমে পিতামাতার অমত ছিল। শেষে তাঁহারা পুত্রের আগ্রহে বাধ্য হইয়া সম্মতি দিলেন। যুবক লেডী বেরেসফোর্ডের নিকট শেষ বিদায় গ্রহণার্থ উপস্থিত। যুবক লেডী বেরেসফোর্ডের নিভৃত কক্ষে প্রবেশ করিয়াই তাঁহার চরণোপ্রান্তে জানু পাতিয়া উপবেশন করিল এবং কহিল, 'আমি চলিলাম, চিরজীবনের তরে চলিলাম। সৈনিক-ব্রতে ব্রতী হইয়াছি। উদ্দেশ্য, রণক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন। আমার হৃদয়ে অন্ধকার। আমার জীবনের সমস্ত সুখ ও ভাবী সুখের আশা চিরকালের তরে অন্তর্হিত হইয়াছে। আমার এই বিপত্তির তুমিই একমাত্র কারণ।' বেরেসফোর্ডের বিধবা পত্নী ভালবাসার উদ্বেল প্রবাহ বুকে চাপিয়া রাখিয়া আর আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না। তাঁহার আত্মার সংকল্প খরবাহিনী স্রোতস্বিনীর তটস্থিত ও তরঙ্গাহত বালুস্তূপের ন্যায় ভাঙ্গিয়া পড়িল। সংকল্পের দৃঢ়তা বসন্তবাত-স্পৃষ্ট কর্পূরের ন্যায় উড়িয়া গেল। অবলার চির-পরিচিত পরপ্রীতিকোমল দুর্বল প্রাণ আপন স্বভাবের পরিচয় প্রদান করিল। দ্বিতীয় পরিণয়ের পরিণাম ঘোর বিপত্তি ও নিশ্চিত মৃত্যু। ইহা জানিয়াও প্রণয়মোহমুগ্ধা রমণী নয়নজলে ভাসিতে ভাসিতে সেই অশুভ পরিণয়ের অশুভ প্রস্তাবে, হায় অতি অশুভক্ষণে, সম্মতি প্রদান করিলেন। তিনি যুবকের সম্পর্কে রূপজ মোহ অথবা করুণ স্নেহকেই প্রণয় বুঝিয়া বঞ্চিত হইলেন। অদূরদর্শিনী অবলার উচ্ছ্বসিত প্রীতি কুসুমতরুভ্রমে বিষবৃক্ষকেই হৃদয়ে আলিঙ্গন করিল।

লেডী বেরেসফোর্ড এখন যাজক-পুত্রের পত্নী। সে হতভাগ্য যুবক

মদ্যপায়ী, অপব্যয়ী ও যতদূর সম্ভব স্বার্থপর ও নিষ্ঠুর। মনুষ্যত্বের প্রায় কোন উপকরণই তাহাতে ছিল না। লেডী বেরেসফোর্ড অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই তাঁহার নূতন পতির প্রকৃত পরিচয় পাইলেন। পতির দৌরাত্ম্য ও অত্যাচারে তিনি বিত্তাপচয়ে বিপন্ন, সমাজে বিড়ম্বিত এবং নিজের সংসারে হাড়ে হাড়ে জ্বালাতন হইয়া উঠিলেন। তিনি হত মূর্খ যুবাকে ভালবাসিতেন সেই পরস্নেহ লালায়িত প্রাণের টানে, সে তাঁহাকে আদর করিত পশুভোগ্য বস্তু জ্ঞানে এবং অর্থের প্রয়োজনে। লেডী বেরেসফোর্ডের সরল হৃদয়ে পতির স্বার্থপূর্ণ নির্দয় ব্যবহারে দারুণ আঘাত লাগিল। এখন আর তাঁহার প্রকৃতির সে স্বাভাবিক প্রফুল্লতা নাই, সে সুখ-সংবর্ধিত সুশিক্ষা-মার্জিত সম্ভ্রান্ত বংশ-সমুচিত সমুচ্চ জীবনের চিহ্নমাত্রও নাই। আছে ভগ্নহৃদয়ে আশার ভগ্নস্তূপের নীচে অনুতাপের তুষানল আর কাতর নয়নে অবিরল অশ্রুজল। তিনি অবশেষে এই নীচাশয় দুর্দান্ত পতি হইতে পৃথক হইতে বাধ্য হইলেন। পৃথক হইলে পরে ভবিষ্যদ্বাণী হয়ত বা ব্যর্থ হইতে পারে ইহা ভাবিয়াও তিনি আবার আত্মজীবন সম্বন্ধে কতকটা আশ্বস্ত রহিলেন। অমন পতির সহিত আর কখনও মিলিত হইবেন না। ইহাই কিছুদিনের তরে তাঁহার দৃঢ় সংকল্প হইল! কিন্তু তাঁহার স্নেহ-তরল চঞ্চল চিত্ত দুদিন যাইতে না যাইতেই আবার মোহমুগ্ধ ও বিবশ হইয়া পড়িল। যাচক-তনয়ের কাকুতিমিনতি ও প্রতিজ্ঞাবাক্য তাঁহার অভিমানশূন্য অমায়িক প্রাণের উপর কার্য করিতে লাগিল। তিনি আবার মোহে ভুলিয়া তাঁহার সহিত পত্নীরূপে সম্মিলিত হইলেন।

অনেকের বিশ্বাস যে, ইউরোপের স্বাধীনা রমণী 'সর্বত্রই' বড় ভাগ্যবতী ও নারীজীবনের সুখভাগিনী। লেডী বেরেসফোর্ডও সেই স্বাধীন দেশেরই স্বাধীন কুলকামিনী। তিনি তাঁহার অর্ধজীবন অশেষ সম্মান ও সুখসমৃদ্ধিতে অতিবাহিত করিয়া প্রৌঢ়বয়সে প্রণয়মোহে ধনমান ও দেহপ্রাণ একটা অর্বাচীন অমানুষ যুবকের হাতে তুলিয়া দিলেন। প্রণয়বিবশা প্রেমপিপাসায় আত্মহারা হইয়া অকূল সাগরে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন, পাইলেন প্রেমের বিনিময়ে পদাঘাত, আর উদারতার বিনিময়ে অকথ্য অপমান ও অসহ্য লাঞ্ছনা! অবশেষে অপাত্রে অর্পিত সেই প্রণয় ও জীবন পুনরায় হাতে পাইয়াও, 'স্বাধীনা' অভাগিনী তাহা রাখিতে পারিলেন না। ইহাই কি স্বাধীনতা? আপনার উপর যাহার বিন্দুমাত্রও

আধিপত্য নাই, হায় সেও কি স্বাধীন ? যে স্বাধীনতা অনেক সময়েই এইরূপে বিড়ম্বিত ও লাঞ্ছিত হয় সে স্বাধীনতা অপেক্ষা হিন্দু বিধবার কঠোর যতিব্রত এবং হিন্দু মহিলার অন্তঃপুর-নিরুদ্ধ পরাধীনতাও কি 'বহুস্থলে' সহস্রগুণে শ্লাঘ্য নহে। পতিপ্রাণা ও পুত্রহৃদয়া ভারতললনা লেডী বেরেসফোর্ডকে নিতান্ত বিপথগামিনী রমণী মনে করিতে পারেন। কিন্তু ইউরোপ ও আমেরিকায় এইরূপ বিধবা-বিবাহের শত সহস্র বিকৃত চিত্র অহোরাত্র সমাজের চক্ষে পড়িতেছে ; বিজ্ঞ বিচক্ষণ সামাজিকেরা সে সকল বিড়ম্বনা দর্শনে হৃদয়ে কি মনে কোন অংশেও বিচলিত হইতেছে না।

দ্বিতীয় পতি হইতে লেডী বেরেসফোর্ডের ক্রমে দুটি কন্যা ও অবশেষে একটি পুত্র জন্মিল। কিন্তু তাঁহার অবিরল গলিত অশ্রুধারার বিরাম হইল না। তিনি পুত্র প্রসবের পর একদিন গণনা করিয়া দেখিলেন তাঁহার সেই মারাত্মক সাতচল্লিশ বৎসর বয়স পার হইয়া গিয়াছে। ইহাতে অনুতাপদগ্ধা বিপন্ন দুঃখিনীর প্রাণে সেই দুঃখ-রাশির মধ্যেও যেন ঈষৎ একটু আশার সঞ্চার হইল।

নবজাত পুত্রের বয়স একমাস হইয়াছে। অদ্য লেডী বেরেসফোর্ডের জন্মদিন। লেডী বেট্রীকব্ তাঁহার প্রিয়তমা সখী। জন্মদিন উপলক্ষে লেডী বেরেসফোর্ড প্রিয়সখী বেট্রীকব্ ও আরও কতিপয় বন্ধুবান্ধবকে আমন্ত্রণ করিয়াছেন। প্রাতে সাতটার সময় তাঁহার দীক্ষাগুরু সেই ধর্মযাজক তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। ধর্মযাজকের সহিত তাঁহার আশৈশব ঘনিষ্ঠতা। যাজক জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি শরীরে কেমন আছ ?' তিনি বলিলেন, 'একরকম ভালই আছি। আজ আমার জন্মদিন। আজ আমার আটচল্লিশ বৎসর বয়স আরব্ধ হইল। আপনি অদ্য আমার এখানে আতিথ্য গ্রহণ করিবেন কি ?' যাজক বলিলেন, 'কি ? তোমার বয়স আটচল্লিশ ? না, না, এ তোমার নিতান্তই ভ্রম। এ বিষয়ে তোমার মাতার সহিতও আমার মতদ্বৈধ ও তর্ক হইয়াছিল। কিন্তু এখন জানিতে পারিয়াছি আমার কথাই ঠিক। এক সপ্তাহ হইল তুমি যে পল্লিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছ ঘটনাক্রমে আমি সেই পল্লিতে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। সেখানকার জন্ম-রেজেস্টারী খুঁজিয়া তোমার জন্মতারিখ খাঁটি জানিয়া আসিয়াছি। তদনুসারে অদ্য তোমার সাতচল্লিশ বৎসর বয়সের আরম্ভ।' লেডী বেরেসফোর্ড শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন, 'হায় ! সত্যই কি আজ আমার সাতচল্লিশ বৎসরের প্রথম দিন,

তবে আর বিলম্ব নাই। আপনি আমার মৃত্যুর ওয়ারেণ্ট জারি করিলেন। আমি আর কএকটা ঘণ্টা মাত্র জীবিত আছি।' এই বলিয়া তিনি যাজককে তখনই চলিয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন। কহিলেন, 'আপনি এখন আসুন, মৃত্যুর পূর্বে আমাকে একটা গুরুতর বিষয়ে বন্দোবস্ত করিয়া যাইতে হইবে।' যাজক ইহা শুনিয়া এবং শিষ্যার তখনকার সেই ভাব ও অধীর মুখচ্ছবি দেখিয়া অপ্রস্তুতের ন্যায় ধীরে ধীরে বাহিরে গেলেন।

যাজকের চলিয়া যাওয়ার পর লেডী বেরেস্ফোর্ড তাঁহার প্রথম পক্ষের দ্বাবিংশতি বৎসর বয়স্ক প্রিয়তম পুত্র ও প্রিয়সখী লেডী কবুকে নিকটে ডাকিয়া আত্মজীবনের সেই লোকভয়ঙ্কর গুপ্তকাহিনী আদ্যোপান্ত খুলিয়া বলিলেন। পুত্র ও সখী সমস্ত শুনিয়া একান্ত দুঃখিত, বিস্মিত ও ভীত হইয়া পড়িলেন। তিনি কহিলেন, 'তোমরা ভীত বা দুঃখিত হইও না। আমার ধারণা ছিল আমার বয়স আটচল্লিশ বৎসর। কিন্তু এক্ষণ নিঃসংশয়রূপে জানিতে পারিয়াছি আমার বয়স আটচল্লিশ নহে, সাতচল্লিশ। পরলোকবাসী ছায়ামূর্তির ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা হইবার নহে। আমি আর অল্পক্ষণ মাত্র জীবিত আছি। যাহা হউক আমি এখন আর মৃত্যুকে বিন্দুমাত্রও ভয় করি না। আমি যে অমূল্য ধনে বিশ্বাস হারাইয়া আজীবন অশেষ-বিশেষে বিড়ম্বিত হইয়াছি, হায়, আমি জীবনের চরম মুহূর্তে সেই আরাধনার ধন ফিরিয়া পাইয়াছি। আমি এক্ষণে প্রকৃত বিশ্বাসভক্তির পীযূষমন্ত্রে সুরক্ষিত। মনুষ্যের রিপু মৃত্যু। মৃত্যু এখন আর আমার কি করিবে? বস্তুতঃই আমি এখন নির্ভয়চিত্তে এই নশ্বর দেহ হইতে চিরদিনের তরে বিদায় গ্রহণ করিতে প্রস্তুত। আমার অঙ্গে একটি বিশেষ চিহ্ন আছে। মৃত্যুর সময় আর তাহা ঢাকিয়া রাখা অনাবশ্যক। সখি কবু, তুমি আমার মৃত্যুর পরে আমার হাতের ফিতাটা খুলিয়া দেখিও; আর বৎস, তুমিও ফিতাঢাকা স্থানটি একবার দেখিয়া রাখিও।' এই বলিয়া পুত্রকে সম্ভাষণ করিয়া পুনরপি কহিলেন, 'বাবা, তোমার জন্মদুঃখিনী বিপথগামিনী পতিতা জননী জন্মের মত বিদায় লইতেছে। বৎস, আশীর্বাদ করিও, তোমার দুঃখিনী মায়ের যেন অন্তিমে সদ্গতি হয়। আর আমার একটি অনুরোধ রাখিও। যদি জীবনে সুখী হইতে চাও তাহা হইলে যেরূপে পার লর্ড টাইরণের কন্যার সহিত পরিণীত হইও। আমি এখন একটু ঘুমাই, তোমরা স্থানান্তরে প্রতীক্ষা কর।'

পুত্র ও সখী সাশ্রুনেত্রে সে গৃহ ত্যাগ করিলেন। একটি পরিচারিকা মাত্র সেই কক্ষে নীরবে বসিয়া রহিল। দেড় ঘণ্টা কাল আর কোন সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। অনন্তর হঠাৎ একটি করুণ শব্দ কানে পশিল। পুত্র ও সখী দ্রুতবেগে কক্ষে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন শয্যাতলে লেডী বেরেস্‌ফোর্ডের শূন্য দেহ পড়িয়া রহিয়াছে। উভয়ে জানু পাতিয়া শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন। লেডী কব্‌ সখীর হাতখানি ধরিয়া উঠাইলেন এবং ফিতা খুলিয়া দেখিলেন, লেডী বেরেস্‌ফোর্ড যাহা বলিয়াছিলেন তাহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। করগ্রন্থির পেশী সকল সঙ্কুচিত ও স্নায়ুসমূহ বিশুষ্ক!

কালে লেডী বেরেস্‌ফোর্ডের পুত্র লর্ড টাইরণের কন্যাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়া জীবনে সুখী হইয়াছিলেন। পকেটবুক ও ফিতা লেডী কবের নিকট ছিল। তিনি তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনে বহুবার বহু বিজ্ঞ লোকের নিকট শপথপূর্বক এই কাহিনীর সত্যতা নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। ইংলণ্ডের যে সকল সুসমৃদ্ধ লোক এই কাহিনী লইয়া আন্দোলন করিয়াছেন তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে অধুনাতন অধ্যাত্মবিজ্ঞানের নামও শোনেন নাই। কিন্তু তথাপি তাঁহারা প্রকৃত বৃত্তান্তে অবিশ্বাস করিতে সাহস পান নাই। যাঁহারা বিশ্বাসী তাঁহারা ইহার সমস্ত ঘটনায়ই বিধাতার কররেখা পাঠ করিয়া ভয় ও ভক্তিতে মাথা নোয়াইয়াছেন। তাঁহাদিগের মতে লেডী বেরেস্‌ফোর্ডের জন্যও চরমে মুক্তি ও চিরন্তনী সুখশান্তি ব্যবস্থাপিত রহিয়াছে। কিন্তু তাহা পরত্র ও উচ্চতর ধামে এবং আরও বহুবিধ শিক্ষাজনক পরীক্ষার পরে।

পঞ্চম অধ্যায়

উপক্রম

যাহা অসম্ভব, তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করা নিশ্চয়ই বড় দুষ্কর। এই নিমিত্ত, বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের কথা উঠিলেই লোকে সম্ভব আর অসম্ভবের কথা লইয়া সর্বাগ্রে তর্ক-বিতর্ক করিয়া থাকে।

কবি ও ঐতিহাসিকের আনন্দ-স্মৃতিরূপিণী নর্মদার তটে অদ্যাপি একটি বিশাল বটবৃক্ষ বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐতিহাসিকেরা কহিয়াছেন যে, এক সময়ে দশ হাজার লোক উহার শাখা-প্রশাখা সমাচ্ছাদিত ছায়া-ভূমিতে আশ্রয় লইয়া যারপরনাই সুখে অবস্থান করিয়াছিল। একথা অসম্ভব বোধ হয় না, কারণ মনুষ্য সেই ছায়াভূমির দীর্ঘ ও পাশ মাপিয়া দেখিয়াছে এবং পরিমাপের প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা জানিতে পাইয়াছে যে, সেখানে দশ হাজার লোক এখনও অনায়াসে অবস্থান করিতে পারে।

পক্ষান্তরে, ঐতিহাসিকেরা ইহাও কহিয়াছেন যে ইংলণ্ডের উদারমতি রাজ্যেশ্বর রাজ্যবিপ্লব-বিপন্ন প্রথম চার্লস নর্দামটনসায়ার নামক প্রদেশের অন্তর্গত ডেন্ট্রি নামক স্থানে সসৈন্যে অবস্থানকালে, নেসবীর যুদ্ধের পূর্বদিন, অর্থাৎ ১৬৪৫ খ্রীস্টাব্দের ১৩ই জুন অপরাহ্নে ক্রমে দুইবার তদীয় ভূতপূর্ব সুহৃৎ ও মন্ত্রী স্ট্রাফোর্ডের ছায়ামূর্তি দর্শন করিয়াছিলেন। ছায়ামূর্তি ঐদিন ক্রমে তাঁহাকে দুইবার দেখা দিয়াছিলেন এবং দুইবারই যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। প্রথম চার্লস সে নিষেধ না মানিয়া নেসবীর যুদ্ধে কিরূপ ঘোরতর বিপদে নিপতিত হন, তাহা সকলেই জানেন। ঐতিহাসিকদিগের মধ্যে অনেকে উল্লিখিতরূপ ছায়ামূর্তি দর্শনের অশেষ প্রামাণিক কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু অধিকাংশ মনুষ্যই সে সকল কাহিনী বিশ্বাস করিতে পারেন না। কেননা কাহিনীগুলি অসম্ভব।

কিন্তু বিধাতার এই অনন্তসূত্র জড়িত বিচিত্র জগতে কি সম্ভব আর কি অসম্ভব তাহা আমরা আমাদিগের সামান্য বুদ্ধিতে, সকল সময়ে সহজে অবধারণ করিতে পারি কি? নর্মদার তটশোভী ঐ বিশাল বট

এক সময়ে নয়নের অদৃশ্য অতি ক্ষুদ্র একটি বীজের মধ্যে কিভাবে নিহিত ছিল এবং কিরূপে সেই বীজ হইতে বহির্গত হইয়া ক্রমে ক্রমে বাড়িয়া ঐরূপ বিরাট মূর্তি পরিগ্রহ করিল আমরা সেই সম্ভব অথবা অসম্ভব কথার তত্ত্ব পরিগ্রহ করিতে সমর্থ হই কি ?

ছায়ামূর্তি সম্পর্কে দুইটি কথাই সাধারণ লোকের নিকট অসম্ভব বোধ হইয়া থাকে। (১) জীবাত্মার সূক্ষ্মদেহ ধারণ ; (২) সেই সূক্ষ্মদেহের আশ্রয়ে সময়ে সময়ে মনুষ্যকে দর্শন দান ও মনুষ্যের সহিত কথোপকথন।

যাঁহাদিগের বুদ্ধি বৈজ্ঞানিক শিক্ষার সাহায্যে বিচারশক্তি লাভ করিয়াছে, তাঁহাদিগের নিকট এই দুই কথার একটিও অসম্ভব বোধ হয় না। কারণ, তাঁহারা প্রত্যক্ষ পরীক্ষায় জানেন যে, বায়ু ও বিদ্যুৎ যেমন লোকচক্ষুর অদৃশ্য হইয়াও সূক্ষ্ম অবস্থায় অবস্থিত রহে ও সংসারে নিরন্তর কার্য করে, মনুষ্যের আত্মাও সেইরূপ মৃন্ময় স্থূল দেহ পরিত্যাগের পর সূক্ষ্মতর আকাশিক দেহে পরিচয়ের উপযোগী আকৃতিতে জীবিত ও অবস্থিত রহিতে পারে এবং সেই সূক্ষ্মতর দেহের আশ্রয়ে, নিয়মবিশেষের সহায়তায়, মনুষ্যকে দর্শন দান ও মনুষ্যের সহিত কথোপকথন প্রভৃতি কার্য করিতে সক্ষম হয়।

এ বিষয়ে অধ্যাত্ম তাত্ত্বিকদিগের উপদেশ অপেক্ষা অজ্ঞমানী (অর্থাৎ Agnostic) অথবা জড়বিজ্ঞানী সম্প্রদায়ের জগদ্বিখ্যাত গুরু জন স্টুয়ার্ট মিলের কথা পাঠকদিগের মধ্যে অনেকের নিকট অধিকতর প্রামাণিক বোধ হইবে। মিলের নামে পঞ্চাশ বৎসর কাল পৃথিবীর মনস্বিমণ্ডলে দোহাই চলিয়াছে। মিল এখন পর্যন্তও বহুলোকের মনোরাজ্যে অধীশ্বরের আসনে আসীন। মিলবলিয়া ছেন, 'হৃদয়ের ভাব আর মনের চিন্তা, যেমন প্রকৃত বস্তু, সংসারের আর কিছুই তেমন নহে। আমরা আমাদিগের প্রত্যক্ষ জ্ঞানে শুধু এই দুই বস্তুকেই প্রকৃত বস্তু বলিয়া স্বীকার করিতে পারি।*

* অনুবাদ আশার অনুরূপ সরল ও শুদ্ধ হইল না বলিয়া মূল লেখা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। 'Feeling and thought are much more real than anything else : they are the only things which we directly know to be real.

মিলের এই কথার দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, হৃদয়ের ভাব ও মনের চিন্তা যাহাকে আশ্রয় করিয়া জগতে প্রকাশিত হয়, সেই জীবাত্মা ও জড় বস্তু হইতে অধিকতর সার বিশিষ্ট প্রকৃত বস্তু এবং সুতরাং অবিনাশী অসার জড় বস্তুরই যদি কোনরূপে বিনাশ (annihilation) হইতে না পারে, তাহা হইলে সারত্বে উচ্চতর জীবাত্মার সম্পর্কে বিনাশের সম্ভাবনা থাকে কোথায় ?

তবে, এখানে একটা গুরুতর কথা অনুক্ত রহিতেছে। জীবাত্মা কি জড় দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াও মনে কোনরূপ চিন্তা, হৃদয়ে কোনরূপ ভাব এবং চিত্তে কোনরূপ ইচ্ছা পোষণ করিতে পারে ? মিল এ বিষয়ে অধিকতর স্পষ্ট কণ্ঠে স্পষ্টাক্ষরে কহিয়াছেন, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে আমরা এখানে যেসকল চিন্তা ভাব ও ইচ্ছা এবং অনুভূতি লইয়া জীবিত আছি, ঠিক সেগুলিই দেহত্যাগের পরও এমনই থাকিয়া যাইতে অথবা আর-এক স্থানে, আর-এক অবস্থায় আবার আরব্ধ হইতে পারে।*

মিলের এই সাক্ষ্যের পর বৈজ্ঞানিক সাক্ষ্যের আর কিছু বাকী রহিল কি ? বাকী রহিল প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য। যাহা হইতে পারে তাহা যে অবশ্যই হইয়াছে, ইহা কেহ চক্ষে না দেখিলে কেমন করিয়া মানিব ? এ কথা সংগত কথা। কিন্তু আত্মার অবিনশ্বরতা এবং লোকান্তরগত আত্মার দর্শনাদি বিষয়ে প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যেরও অভাব নেই।

এই যে আমরা এই প্রবন্ধটি লিখিতেছি, এই সময়ে একটি সপ্ততিবর্ষ বয়স্ক সম্ভ্রান্ত ইংরেজ আমাদিগের সমক্ষে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। তিনি সমক্ষে বসিয়া সত্য প্রতীক্ষা করিয়া আমাদিগকে পুনঃপুনঃ কহিতেছেন, 'আপনি লিখুন, আমি চক্ষে দেখিয়াছি। আমি এবং আমার একটি বিশ্বস্ত সুহৃদ, আমরা দুই জনে এক স্থানে একই সময়ে, দুই-তিনটা উজ্জ্বল দীপের প্রখর আলোকে চক্ষে যাহা দেখিয়াছি তাহা মনের ধাঁধা অথবা মিথ্যা কল্পনা হইতে পারে না। আমরা এই নগরের কোন একটি পুরাতন গৃহে একদা রাত্রি ঠিক সাড়ে এগারটার সময়ে আমাদিগের একটি সুপরিচিত স্বর্গগত সুহৃদের ছায়ামূর্তিকে একটা কুঠুরীর মধ্যে—

* 'We may suppose that the same thoughts, emotions, volition, and even sensations which we have here, may persist or recommence somewhere else under other conditions.'

সেই কুঠুরীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বহুক্ষণ বিষণ্ণভাবে পাদচারণ করিতে দেখিয়াছি। যাহা চক্ষে দেখিয়াছি, তাহা কিরূপে অবিশ্বাস করিব ?'

আমরা এই স্থানে যাঁহার সাক্ষ্য উপস্থাপন করিলাম, তিনি তাঁহার নাম স্বাক্ষর করিয়া দিতে প্রস্তুত আছেন। তাঁহার মত আরও অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, বহুজ্ঞ হিন্দু, বিজ্ঞ বিচক্ষণ মুসলমান এবং বহুদর্শী ও বিশ্বাসী ব্রাহ্ম নিজ নিজ প্রত্যক্ষ পরিজ্ঞাত বিষয়ের সাক্ষ্য সম্পর্কে নাম-স্বাক্ষর করিতে সম্মত। কিন্তু তাঁহাদিগের নামের মহিমা কি ? বঙ্গীয় পাঠকদিগের মধ্যে কে তাঁহাদিগকে চিনিবেন ? চিনিলেও কয়জনে তাঁহাদিগের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া আপনার স্বর্গগত পিতৃপুরুষকে প্রকৃত প্রস্তাবে জীবিতজ্ঞানে তদীয় পারলৌকিক মঙ্গলার্থ প্রার্থনা কিংবা পিতৃতর্পণ করিতে প্রস্তুত হইবেন ?

আমরা এই হেতু আজি পাঠককে দুইটি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও পরীক্ষণপটু বৈজ্ঞানিকের প্রত্যক্ষ দৃষ্টিমূলক সাক্ষ্য উপহার দিব ; যাঁহাদিগকে সকলেই চিনে, সকলেই জানে অথবা যাঁহাদিগকে না জানিলে নিজ নিজ মূর্খতা মাত্র প্রমাণিত হয়, তাদৃশ লোকের সাক্ষ্য প্রদান করিব। যদি কাহারও হৃদয় এইরূপ সাক্ষ্যেও অস্পৃষ্ট রহে, তাহা হইলে বুঝিব তিনি এ বিষয়ে আরও কিছুকাল একবার অন্ধকারে রহিলেন।

বঙ্গদেশের বালকেরাও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসাদাৎ প্রফেসর ডি. মরগেনের নামে অনুরক্ত। ডি. মরগেনের সহিত কাব্যউপন্যাস অথবা রসের কথার কোনদিনও কোন সম্পর্ক ছিল না। তিনি গণিত-বিজ্ঞানের কঠোর তত্ত্ব ও কৃচ্ছ্রসাধ্য গণনা লইয়াই জীবন যাপন করিয়াছেন ; এবং যে সকল কথা গণিতশাস্ত্রের সিদ্ধান্তনিচয়ের ন্যায় সার-সত্য বলিয়া গৃহীত না হইতে পারে, তাহা ঘৃণার সহিত উড়াইয়া দিয়াছেন। ডি. মরগেন 'জড় বস্তু হইতে জীবাত্মা'* নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন, 'আমি চক্ষে দেখিয়াছি, কর্ণে শুনিয়াছি। যাহা চক্ষে দেখিয়াছি ও কর্ণে শুনিয়াছি, তাহাতে অধ্যাত্মতত্ত্বে অবিশ্বাস করা একবারে অসম্ভব।'

* পাঠক '*Matter to Spirit*' নামক তাত্ত্বিক গ্রন্থখানি নিজে পড়িলেই ভাল হয়। ঐ গ্রন্থেরই দুইটি পংক্তি এই স্থানে উদ্ধৃত হইল। 'I have both seen and heard, in a manner which would make unbelief impossible regarding things called spiritual.'

ইউরোপের বিদ্যুদ্-বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতবর্গ যাঁহাকে আপনাদিগের শিক্ষক বলিয়া পূজা করিয়াছেন, যিনি সুদীর্ঘকাল ইংলণ্ড ও আমেরিকার অন্তর্জাতীয় টেলিগ্রাফ কোম্পানীর প্রধান বৈদ্যুতিক ও ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন এবং সাগরের অতলগর্ভে তারে তারে তাড়িতবার্তা প্রেরণ বিষয়ে সার্ মাইকেল ফ্যারাডে এবং সার্ উইলিয়ম টম্‌সনকে সবিশেষ সহায়তা করেন, সেই সর্বজন-সুবিদিত সি. এফ. ভার্‌লী ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দে ইহা স্বহস্তে লিখিয়া গিয়াছেন, 'পঁচিশ বছর পূর্বে আমি বড় কঠোর মস্তিষ্ক অবিশ্বাসী ছিলাম। তারপর আমার আত্মপরিবারের মধ্যে অকস্মাৎ এবং নিতান্ত অচিন্তিত প্রকারে ছায়া-দর্শন সংক্রান্ত নানা প্রকার আশ্চর্যঘটনা সংঘটিত হইতে লাগিল···আমি বাধ্য হইয়া অনুসন্ধান করিলাম। অনুসন্ধানের জন্য অনেক প্রকার কলকৌশল করিলাম। সে সকল কলকৌশল এমন ছিল যে কাহারও কোনরূপ স্বার্থশঠতা অথবা আত্মবঞ্চনার সম্পর্ক থাকিলে তাহা ধরা না পড়িয়া যাইত না। ঐরূপ বহু অনুসন্ধানের পর ইহাই আমার দৃঢ় প্রতীতি হইল যে, অধ্যাত্ম ঘটনানিচয় প্রকৃত সত্য। সে বিষয়ে আর প্রমাণের অভাব নাই। প্রমাণ স্তূপীকৃত; এবং সে প্রমাণ সমূহকে উপেক্ষা করিবার দিন এইক্ষণ অতীত হইয়াছে।*

এই স্তূপীকৃত প্রমাণের কথা মনে রাখিলে আত্মিক কাহিনী সকলের নিকটই উপন্যাস অপেক্ষা উচ্চতর পদার্থরূপে প্রতীয়মান হইবে; এবং উহার প্রত্যেক ঘটনা মনুষ্যের আত্মাকে অন্ততঃ মুহূর্তের তরে পরলোকের তত্ত্ব চিন্তা করিতে বাধ্য করিবে।

আত্মিক কাহিনী

[অদৃষ্টবাদ ও আত্মার স্বাধীনতা]

জার্মানীর অন্তর্গত কোন একটি ক্ষুদ্র নগরের এক ক্ষুদ্র গৃহে পতি-মনোমোহিনী মিন্না একাকিনী উপবিষ্টা। বেলা দ্বিপ্রহর অতীতপ্রায়।

* 'Twenty-five years ago I was a hard-hearted unbeliver ···Spirit phenomena, however, suddenly and quite unexpectedly were soon after developed in my own family.···That the phenomena occured there is overwhelming evidence, and it is too late now to deny their existence.'—C. F. Verlay, the distinguished English Electrician &c.&c.

কিন্তু তথাপি মিন্নার বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ হইতেছে না। মিন্না সুন্দরী ও যুবতী। কিন্তু মিন্নার মুখশ্রী নিদাঘদগ্ধ গোলাপের ন্যায় আজি মলিন ও বিশুষ্ক। ভাবনা-কুঞ্চিত নিটোল ললাটে অল্প অল্প স্বেদবিন্দু। নয়নে শূন্য দৃষ্টি। যৌবন-সুলভ সরস হাসির সুখ-নিবাস-স্বরূপ অধর-প্রান্ত আজি বিষাদ ভারাক্রান্ত। রমণী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া আপনা আপনি কহিলেন, 'হায়, এ কাল-সমরের কি শেষ নাই। আজ আমার প্রাণটা এমন হইল কেন? তিনি কুশলে আছেন তো?'

অল্পদিন হয় মিন্নার বিবাহ হইয়াছে। তাঁহার পতি যুবক, সর্বাংশেই শ্রীমান ও বলিষ্ঠ। মিন্না যেমন পতিপ্রেমমুগ্ধা ও পতিগতপ্রাণা; তাঁহার পতিও তেমনই পত্নীসুখানুরাগী প্রেমিক, ও পত্নীগতপ্রাণ। পতি সৈনিকপুরুষ। তিনি এইক্ষণ তাঁহার প্রিয়তমা মিন্না হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সমরক্ষেত্রে সংগ্রামকার্যে ব্যাপৃত। এই হেতুই মিন্নার মুখখানি অমন মলিন, এই হেতুই তিনি ঐরূপ চিন্তাকুলা ও বিষণ্ণা। মিন্না যাঁহাকে তিলেকের তরে না দেখিতে পাইলে পৃথিবী আঁধার দেখিতেন, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস চলিয়া যাইতেছে, তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছেন না। মিন্না জীবন্মৃতবৎ আত্মহারা।

যুদ্ধযাত্রাসময়ে মিন্না গবাক্ষপার্শ্বে দাঁড়াইয়া রণবেশে সজ্জিত পতির বীরমূর্তিখানি তৃষিত নয়নে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। পতিও যতক্ষণ তাঁহাকে দেখা গিয়াছিল, ততক্ষণ বারংবার পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিয়া ঐ গবাক্ষের দিকে করস্থিত রুমাল উড়াইয়া উড়াইয়া সঙ্কেতে বিদায়ি-সম্ভাষণ জানাইতেছিলেন। মিন্নার মানসনেত্র এখনও যেন প্রতিনিয়ত সেই দৃশ্যই দেখিতেছে; এখনও যেন, তাঁহার কর্ণ ক্ষণে ক্ষণেই সেই শ্রেণীবদ্ধ ঘোটকসমূহের সমবিক্ষিপ্ত পদশব্দ শুনিয়া চমকিয়া চমকিয়া উঠিতেছে। মিন্না একবার সেই গবাক্ষের নিকট যাইতেছেন, আবার ফিরিয়া আসিয়া অবসন্ন প্রাণে বসিয়া পড়িতেছেন। আজ আর তিনি কোন প্রকারেই প্রাণে শান্তি পাইতেছেন না।

হঠাৎ সিঁড়িতে শব্দ হইল। মিন্না সেই দিকে কর্ণপাত করিলেন। শুনিলেন, পায়ের শব্দ। কিন্তু ঐ পদশব্দ কোন আগন্তুকের নহে, উহা শ্রুতপূর্ব ও চির পরিচিত। যুবতী ত্রস্তভাবে গাত্রোত্থান করিলেন। একপদ অগ্রসর হইতে না হইতেই দরোজা খুলিয়া গেল, দেখিলেন সম্মুখে পতি দণ্ডায়মান! শরীরে সৈনিক সজ্জা। কিন্তু সে সজ্জা

ছিন্নবিছিন্ন ও রুধিরাক্ত। ললাটে গভীর ক্ষত। ক্ষতমুখে তীব্রবেগে শোণিতধারা প্রবাহিত। প্রাণাধিক প্রিয়তমের এই ভয়াবহ শোচনীয় মূর্তি অকস্মাৎ দেখিতে পাইয়া, মিন্নার বুক ধড়ফড় করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। ইচ্ছা হইল ছুটিয়া যাইয়া আহত পতিকে বুকে আবরিয়া লন। কিন্তু পারিলেন না। ভীতি ও বিস্ময়ে পদদ্বয় অচল ও অবসন্ন হইয়া পড়িল। তিনি বজ্রাহতার ন্যায় আড়ষ্ট ও অর্ধ-মূর্ছাপন্ন অবস্থায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। মুখে বাক্যস্ফূর্তি হইল না।

মূর্তি মিন্নার পানে কাতর চক্ষে তাকাইয়া বলিলেন, 'মিন্না, তুমি বিস্মিত ও ভীত হইয়াছ। ভয় ত্যাগ কর, আমি যাহা বলিতেছি, স্থিরচিত্তে শুন। এই যে আমার ললাটে অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন দেখিতেছ এই সাংঘাতিক আঘাতেই অদ্য রণক্ষেত্রে পৃথিবীর সম্পর্কে আমার মৃত্যু হইয়াছে। মনে আছে ত, আমরা উভয়ে, একদিন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, আমাদিগের মধ্যে অগ্রে যাহার মৃত্যু হইবে, সেই অন্যের সমীপে আত্মিক দেহে উপস্থিত হইব। আমি সেই প্রতিজ্ঞা পালনার্থই তোমাকে এই বেশে দেখা দিতে আসিয়াছি। তুমি আমার বিয়োগ-দুঃখে শোকাতুর ও অধীর হইও না। পরলোকেও আমি তোমাকে ভুলিতে পারিতেছি না। এখন পূর্বাপেক্ষাও আমি তোমার অধিকতর নিকটস্থ। যখন প্রবৃত্তি ও শক্তি হইবে, তখনই তোমাকে দেখা দিব। প্রিয়তমে, তুমি আমাকে দেখিয়া পাছে ভয় পাও, যখনই আসিব, পূর্বে একটি -ঘণ্টাধ্বনির ন্যায় শব্দ শুনিতে পাইবে, এবং তোমার কর্ণের নিকট বলিব, "মিন্না, আমি এসেছি।' ইহা বলিতে না বলিতেই ছায়ামূর্তি অদৃশ্য হইয়া গেল।

মিন্না ক্ষণকাল আত্মবিস্মৃত ও বিমূঢ় হইয়া রহিলেন। ইহার পর যখন একটুকু প্রকৃতিস্থ হইলেন, তখন তাঁহার মনে এই ভাবনার উদয় হইল— 'স্বামী এরূপ ভয়ঙ্কর বেশে অকস্মাৎ দেখা দিয়া কোথায় গেলেন। ইহা কি দেখিলাম ! তবে কি সত্য সত্যই প্রিয়তম স্বর্গগত হইয়াছেন। তবে কি সত্য সত্যই আজি সমরক্ষেত্রে অভাগিনীর সর্বনাশ হইয়াছে।' ইত্যাদি উৎকট ভাবনায় তিনি একান্ত আকুল হইয়া পড়িলেন। নয়নে ধারা বহিল। রণক্ষেত্রের সংবাদ জানিবার জন্য পাগলিনীর ন্যায় অধীর হইয়া উঠিলেন।

দুই চারিদিনের মধ্যেই সংবাদ আসিল। প্রকৃতই তাঁহার স্বামী ঐ

দিন রণক্ষেত্রে তনুত্যাগ করিয়াছেন। এই নিদারুণ শোকসংবাদে পতি-প্রেমবিহ্বলা মিন্নার বুক ভাঙিগয়া গেল। তিনি কখনও বা মূর্ছিত এবং কখনও বা অশ্রুজলে আপ্লুত হইতে লাগিলেন।

মিন্নার আপনার জন কেহ নাই। এ দুঃসময়ে কে তাঁহার সংবাদ লইবে? কে দুটি মিঠা কথায় তাঁহার পোড়া প্রাণে শান্তি দান করিবে? কিন্তু এক অদ্ভুত ও বিচিত্র ঘটনা, এই দুঃসহ শোকে একটু শান্তির উপায় বিধান করিল। এই সময় হইতে পতির ছায়ামূর্তি প্রতিনিয়তই তাঁহার সন্নিহিত হইতে লাগিল। মিন্না শোকে, দুঃখে যখন বড় বেশী আকুল হইতেন, তখনই টুনু করিয়া একটি মৃদু ঘণ্টাধ্বনির মত শব্দ হইত এবং তাঁহার কানের কাছে, তাঁহার চির-পরিচিত প্রিয়কণ্ঠে, 'মিন্না, এইত আমি এসেছি' এই কটি কথা মৃদু মৃদু উচ্চারিত হইত।

প্রথম প্রথম ঘণ্টাধ্বনির মত শব্দ শুনিয়া মিন্না শিহরিয়া উঠিতেন, এবং কেমন একটা আতঙ্কের ভাবে অবশ ও অবসন্ন হইয়া পড়িতেন। কিন্তু এ অবস্থা অনেক দিন রহিল না। দিন দিনই ভয় কমিয়া আসিল। তিনি কিছুদিন পরে পতির ছায়ামূর্তি দর্শনে ভীতির পরিবর্তে প্রীতি এবং উহার সহিত আলাপে আতঙ্কের পরিবর্তে আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। এমন কি অবশেষে কতক্ষণে ছায়ামূর্তির দর্শন পাইবেন, এই আশায় উৎসুক চিত্তে বসিয়া থাকিতেন এবং একটি বিবেক-ধর্ম-পরায়ণা বৃদ্ধা প্রতিবেশিনী ও বাড়ীর একটি পরিচারিকাকে আত্মজীবনের এই আশ্চর্য কাহিনী সবিশেষ জানাইতেন।

মিন্নার বৈধব্যব্রত ভঙ্গ হইল না। কিন্তু বৈধব্য-দুঃখ দূর হইয়া গেল। এই এক বিচিত্র ভাবে, চির জ্বালাদগ্ধ বৈধব্যও যেন তাঁহার পক্ষে চিত্ত প্রীতিকর হইয়া উঠিল। ছায়ামূর্তি বলিতেন, 'আমি এইরূপে প্রতিদিনই তোমাকে দেখা দিব, প্রতিনিয়তই পরিরক্ষকের মত তোমার কাছে কাছে থাকিব।' তিনিও বলিতেন— 'আমি আর ইহজীবনে পত্যন্তর গ্রহণ করিব না, এবং কালে যখন এই মৃন্ময় তনুর পিঞ্জর হইতে পরিমুক্ত হইব, তখন তোমার মত হইয়া তোমারই সঙ্গে মিশিয়া যাইব। ইহাই আমার জীবনের চরম সুখ ও শেষ আকাঙ্ক্ষা।'

মিন্নার মুখে এইরূপ প্রতিজ্ঞাবাক্য শুনিলেই ছায়ামূর্তির মুখখানি গম্ভীর ভাব ধারণ করিত এবং তিনি কহিতেন, 'মিন্না, মনে যাহাই থাকুক সাবধান, কোনরূপ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইও না। তুমি স্বাধীনা, প্রবৃত্তি

হয় আবার বিবাহ করিবে, প্রবৃত্তি না হয়, না করিবে। কিন্তু, বিবাহ করিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিও না।' কিন্তু মিন্না সে নিষেধ মানিতেন না। কেননা ঐ প্রকার প্রতিজ্ঞায় প্রেমময়ীর মনে বড়ই আত্মগৌরবের আনন্দ। তিনি পতিমূর্তির নিকট যেমন পুনঃপুনঃ প্রতিজ্ঞা করিতেন, আপনার বিশ্বস্ত প্রতিবেশিনীকেও সে প্রতিজ্ঞার কথা জানাইতে ভালবাসিতেন।

অনেকদিন চলিয়া গিয়াছে। মিন্না এখন বিধবার মলিন বেশ ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি এখন সময়ে সময়ে নাচ ও ভোজ ইত্যাদি উৎসবেও যোগদান করেন। কিন্তু এখনও তাঁহার পতিগত পবিত্র প্রাণে প্রকৃত কোন পরিবর্তন ঘটে নাই।

একদা রজনীযোগে এক ভোজের উৎসবে মিন্নার নিমন্ত্রণ হইল। ভোজের সংগে 'বল' বা নৃত্যের অনুষ্ঠান হইবে। মিন্না নৃত্যের সাজে সজ্জিত হইয়া ভোজস্থানে উপস্থিত হইলেন। উৎসবগৃহে বহুলোকের সমাগম হইয়াছে। নিমন্ত্রিতদিগের মধ্যে ফ্লোরেন্সের একটি যুবকের প্রতি মিন্নার নয়ন আকৃষ্ট হইল এমন নহে, মনেও একটু ভাবান্তর জন্মিল। বৈধব্যের পরে যে ভাব তিলেকের তরেও মিন্নার হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত হয় নাই আজি সহসা সেই ভাব জোর করিয়া তাঁহার চিত্ত অধিকার করিয়া লইল। যুবক ও যুবতী উভয়েই পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট। চোখে চোখে মনের বিনিময় হইতে লাগিল। মিন্না ভাবিলেন, জীবনে আর কখনও বুঝি বা সর্বাংশে এমন প্রিয়দর্শন, প্রিয়ভাষী ও সুরসিক যুবাপুরুষ তাঁহার নয়নপথের পথিক হন নাই। তিনি আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িলেন এবং যুবকের সানুরাগ অনুরোধে ভুলিয়া রোমাঞ্চিত কলেবরে তাঁহার সহিত নৃত্যে যোগদান করিতে চলিলেন। কিন্তু অমনই তাঁহার কানের কাছে তাঁহার বৈধব্যজীবনের পথ-প্রদর্শক সেই নিত্য শ্রুত ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। মিন্না ইহা শুনিলেন না। সন্নিহিত কোন কোন ব্যক্তি সহসা ঘণ্টাধ্বনি শুনিয়া ইতঃস্তত দৃষ্টিপাত করিলেন। মিন্না আর তখন আপনাতে আপনি নহেন, একেবারে ফ্লোরেণ্টাইন যুবকের নবভাবে নিমগ্ন। তাঁহার কর্ণে ঐ মৃদু ঘণ্টাধ্বনি স্থান পাইবে কেন?

ঘণ্টা আবার বাজিল। এবার আর সে মৃদুমধুর ধ্বনি নহে, মৃত্যুকালীন ঘণ্টাশব্দবৎ সুগভীর শোকধ্বনি। কি বিচিত্র! উৎসবগৃহের সকলেই উহা শুনিতে পাইলেন, শুনিয়া চমকিত হইলেন। 'মিন্না এই যে আমি'

এই কথাটিও ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে মিন্নার কর্ণকুহরে ধ্বনিত হইল। সন্নিহিত লোকেরাও ইহা স্পষ্ট শুনিতে পাইয়া, কে কোথা হইতে এই কথা কহিল জানিবার জন্য উৎসুক নেত্রে চারিদিকে তাকাইতে লাগিলেন। মিন্না চমকিয়া উঠিলেন এবং ভয়চকিত চক্ষে সম্মুখস্থিত আয়নার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। দেখিলেন উহাতে তাঁহার নিজ প্রতিবিম্বের উপরিভাগে স্বামীর প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হইয়াছে। যুবতী অমনই অস্ফুট স্বরে 'ঐ আমার স্বামী'— এই বলিয়া চীৎকার করিলেন এবং মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। শুশ্রূষার জন্য অনেকেই দ্রুতবেগে তাঁহার সন্নিহিত হইলেন। কিন্তু কে আর কাহার শুশ্রূষা করিবে? তাঁহারা দেখিতে পাইলেন মূর্ছা নহে—মৃত্যু।— মিন্না তাঁহার দেহে নাই। পক্ষিণী উড়িয়া গিয়াছে। শূন্য পিঞ্জর ধূলায় লুটাইতেছে। ফ্লোরেণ্টাইন যুবকের নয়নপ্রান্তে এক ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। উৎসবগৃহ স্তম্ভিত, বিস্মিত ও বিষণ্ণ। নাচ ও ভোজ বন্ধ হইয়া গেল। সকলেই এই অদ্ভুত ও বিস্ময়কর ঘটনা সম্বন্ধে নানারূপ আলোচনা করিতে করিতে আপন আপন গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। মিন্না যদি তদীয় স্বর্গগত পতির ছায়ামূর্তি সন্নিধানে তাদৃশ কঠোর বৈধব্যব্রতের প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ না হইতেন, বোধ হয় তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে ভাল হইত। তাঁহার এ মৃত্যু ছায়ামূর্তির ক্রোধে নহে, তাঁহার স্বকীয় আত্মার অন্তঃস্থিত লজ্জা, দুঃখ, অনুতাপ এবং অস্বাভাবিক আতঙ্কের আকস্মিক সংঘাতে। শুধু ভয়েই অনেক স্থলে অনেকের মৃত্যু হয়। এখানে ভয়ের সঙ্গে অনেক প্রকার ক্লেশজনক ভাবের মিশ্রণ হইয়াছিল। হা দুর্বলহৃদয়া মিন্না! তুমি তোমার এই আচম্বিত মৃত্যুতে চিন্তাবিমুখ ও চটুল চরিত্র মনুষ্য জাতিকে কি শিখাইয়া অকস্মাৎ কোথায় চলিয়া গেলে?

ষষ্ঠ অধ্যায়

উপক্রম

যে অতি মন্দ তাহাকেও এক সময়ে ভাল হইতে হইবে। যাহার দুরভিমান দম্ভে ও দয়ালেশবর্জিত ক্রোধগর্জনে আজি সন্নিহিত মনুষ্য মাত্রেরই হৃদয় পুনঃপুনঃ কাঁপিয়া উঠিতেছে— যাহার বিকট দৃষ্টি স্ত্রী পুত্র পরিজনের কোমল হৃদয়েও বিষাক্ত শলাকার ন্যায় দাহ জন্মাইতেছে, তাহাকে সম্মুখবর্তী অনন্তকালের কোন না কোন সময়ব্যবচ্ছেদে শাক্য-সিংহের ন্যায় দয়াধর্ম-পরায়ণ এবং শঙ্করাচার্যের ন্যায় তন্ময় ভক্ত সাধু সজ্জন হইতে হইবে। ইহাই অপার করুণানিধি বিশ্ববিধাতার অনুল্লঙ্ঘনীয় বিধি এবং যে সকল দেবপ্রকৃতি নরনারী সময়ে সময়ে মনুষ্যকে দর্শন দান করিয়া পারলৌকিক জীবন সম্পর্কে উপদেশ দিয়াছেন, ইহাই তাঁহাদিগের উপদেশের সার। কিন্তু এই বিস্ময়াবহ পরিবর্ত, এই প্রকৃত পুনর্জন্ম কাহারও আরব্ধ হয় ইহলোকে, কাহারও আরব্ধ হয় পরলোকে। এই পৃথিবীতে অনেকে মৃত্যু মুহূর্ত পর্যন্তও মনুষ্যের অপকার সম্পাদন অথবা আশেপাশে সকলেরই সর্বপ্রকার জ্বালাতন করিয়া কেমন এক অস্বাভাবিক সুখ অনভব করে; অনেকে আবার সময় থাকিতেই ভয়ে কিংবা ভক্তিতে সুমতির আশ্রয় লইয়া অল্প অল্প পরিবর্তিত হইতে থাকে। আজি আমরা পাঠককে এইরূপ অভাবনীয় পরিবর্তনের একটি আশ্চর্য কাহিনী উপহার দিলাম। যাঁহার কৃপায় এই বিচিত্র সৃষ্টিতে অস্পৃশ্য অঙ্গারও সুস্বাদু শর্করায় পরিণত হয়, দুষ্কৃত-নিষ্ঠুর দৃক্‌পাতশূন্য মন্দ-চরিত্রও অবশ্যই তাঁহার মঙ্গলময় স্নেহশাসনে একদিন না একদিন মধুর হইয়া মনুষ্যের মন জোগাইবে, একসময়ে অন্তরে বাহিরে সর্বপ্রকারে ভাল হইয়া ভগবানের জগন্মঙ্গল ব্রতে যোগদান করিবে।

আফ্রিক-কাহিনী

[প্রেম সমুদ্রে প্রাণনাশি বিষ]

ইংলণ্ডের এক কৃষিপল্লীতে মেস্তর হাণ্টের বাস। পল্লিটি রাজধানী হইতে মাত্র বার মাইল দূরবর্ত্তী। ইংলণ্ডের পল্লী এ দেশের পল্লীগ্রামের মত নীরব, নিস্পন্দ ও মৃতবৎ নিস্তেজ নহে। উহা চিরজীবন্ত ও কর্ম-কোলাহলে নিত্য উৎফুল্ল। পল্লীর দুই পার্শ্বে লোকের বসতি। মধ্য দিয়া পরিসর পথ। মাঠ ও শস্যক্ষেত্র পল্লীর বহির্ভাগে অবস্থিত। প্রায় প্রত্যেক পল্লীতেই ধর্মযাজক আছেন। চার্চ, হোটেল ও হাসপাতাল আছে। সংবাদপত্রের গ্রাহক ও পাঠক, সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন এবং সাধারণ মতের একটু প্রভাব ও প্রভুত্ব আছে। হাণ্ট স্বীয় পল্লীর অদূরবর্ত্তী কোন বড় ভূম্যধিকারীর প্রধান শিকার-রক্ষক। হাণ্ট বহুদিন সৈন্যদলে সিপাহীর কার্য করিয়া আসিয়াছে। বহুবার রণক্ষেত্রে অজস্র গোলা-গুলির মধ্যে নির্ভয়ে বিচরণ করিয়াছে। ভয় কাহাকে বলে স্বপ্নেও সে তাহা জানিত না। তাহার মত অসমসাহসী কঠোরকর্মা ও দুর্দান্ত প্রকৃতির লোক পল্লীতে আর একটিও ছিল কিনা সন্দেহ।

হাণ্টের শরীর সুদীর্ঘ, পেশল ও বজ্রের ন্যায় দৃঢ়। গ্রীবা হ্রস্ব ও স্থূল-বক্ষ বিস্তৃত ও পাষাণফলকের ন্যায় দুর্ভেদ্য। লোকের বিশ্বাস হাণ্টের বুকে ঠেকিয়া বন্দুকের গুলি ফিরিয়া যায়। তাহার চপেটাঘাতে ষাঁড়ের মস্তক বিদীর্ণ হয়। তাহার আরক্ত নেত্রের খরদৃষ্টিতে বাঘের চক্ষুও আনত হইয়া থাকে। হাণ্টের পাদভরে মাটি কাঁপিত ; কণ্ঠস্বরে পল্লী কাঁপিত ; কণ্ঠস্বরে পল্লী প্রতিধ্বনিত হইত। হাণ্টের নাম লইয়া জননী ক্রোড়স্থ দুরন্ত শিশুকে শান্ত করিতেন। হাণ্টের সাড়া পাইলে ক্ষিপ্ত বুলডগও লেজ গুটাইয়া কোণে লুক্কায়িত রহিত। রক্ষিত শিকারের উপর সময়ে সময়ে অশ্বারোহী দস্যুদল আসিয়া আক্রমণ করিত। দস্যুদল কর্তৃক শিকার আক্রান্ত হইলে হাণ্ট যেরূপ বীরত্ব ও সাহস সহকারে উহাদিগকে তাড়াইয়া দিত তাহা বস্তুতই ভয়াবহ ও বিস্ময়কর।

হাণ্টের পাষাণহৃদয়ে দয়াদাক্ষিণ্য শিষ্টতা ও মিষ্টতার লেশমাত্রও ছিল না। হাণ্ট ব্যাঘ্র ভল্লুকের ন্যায় ভীতির আস্পদ ও গণ্ডারের ন্যায় অপ্রতিহতগতি ও দুর্ধর্ষ ছিল। সে যে পথে যাইত বালকেরা সে পথে

চলিতে সাহস পাইত না। ক্ষীণকায় দুর্বলেরা আতঙ্কে সরিয়া যাইত। হাণ্টের গতিপথ হইতে গৌরবিণী স্বাধীনা রমণীরাও আপন আপন সম্ভ্রম লইয়া সশঙ্কে পলায়ন করিতেন।

হাণ্ট তাহার মনের যে ভাবটিকে ভালবাসা ও অনুরাগ বলিয়া বুঝিত সে ভাবেরও বিন্দুমাত্র স্থায়িত্ব ছিল না। তাহার তথাবিধ ভালবাসা আজি একদিকে গড়াইয়া পড়িত কালি আবার আর-একস্থানে যাইয়া আদর প্রদর্শন করিত। কিন্তু তথাপি কি অলক্ষ্য সূত্রে জানি না সে তাহার এই বিসদৃশ কাচের বিনিময়ে প্রকৃত কাঞ্চনলাভে অধিকারী হইয়াছিল। একটি সুকুমারমতি যুবতী এই ভয়াবহ ব্যাঘ্রকে বস্তুতই প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন। যুবতী তাহার পরিণীতা পত্নী।

সে যুবতী পত্নীর রূপের কথা বলিব না। যুবতীর সুকোমল দেহে, ততোধিক সুকুমার কোমলপ্রাণে যে সুষমা, যে মাধুরীটুকু ছিল নিষ্ঠুর পতির প্রাণশূন্য কর্কশ ব্যবহারে তাহা শুকাইয়া শুকাইয়া ক্রমেই নিঃশেষ হইয়া আসিতেছিল। পাদদলিত শুষ্ক কুসুমের অতীত গৌরবের বিষাদ কাহিনী কহিয়া আর ফল কি? হাণ্ট তাহার মধুর প্রকৃতি মুগ্ধস্বভাবা ও আজ্ঞাধীনা পত্নীকে দুই চক্ষের কোণে দেখিতে পারিত না। কোন প্রতিবেশিনী গ্রাম্যবিলাসিনী সম্প্রতি তাহার নয়নরঞ্জিনী ও অনুরাগ-ভাগিনী।

ক্রমে এই প্রসঙ্গে গ্রামে সাধারণের মধ্যে হাণ্টের নামে যারপরনাই কুৎসা ও নিন্দা রটিত হইল। হাণ্টের পত্নী ইহা শুনিলেন। কিন্তু প্রথম বিশ্বাস করিলেন না। পরে স্বামীর ব্যবহারে সমস্তই বুঝিতে পারিলেন। যন্ত্রণা ক্রমে অসহ্য হইয়া উঠিল। যুবতীর সরল পবিত্র প্রাণে নিদারুণ আঘাত লাগিল। তিনি লুক্কায়িত অনলে অহোরাত্র দগ্ধ হইয়া অকালে ভগ্নদেহে ও ভগ্নহৃদয়ে শয্যাশায়িনী হইলেন। এই রোগশয্যা হইতে আর তিনি উঠিলেন না।

পত্নীর মৃত্যু হইল। হাণ্ট অস্পৃষ্ট! তাহার পাষাণ প্রাণ বিন্দুমাত্র ব্যথিত হইল না। নীরস চক্ষে এক ফোঁটা জল ঝরিল না। সে অম্লানবদনে পত্নীকে সমাধির গহ্বরে বিসর্জন দিয়া প্রফুল্ল মুখে গৃহে ফিরিয়া আসিল। এখন আর কোন বাধা বিঘ্ন বা অন্তরায় রহিল না। গ্রাম্য বিলাসিনী এখন অবাধে আসিয়া হাণ্টের গৃহস্বামিনী হইয়া বসিলেন। পত্নীবিয়োগের পর ত্রিরাত্রি অতীত না হইতেই হাণ্ট উহার সহিত বিবাহ

বন্ধনে একসূত্রে গ্রথিত হইল। এই নিষ্ঠুর পাশব বিবাহের পরে গ্রামের লোক সকলেই তাহাকে আরও বেশী ঘৃণা করিতে লাগিল। হাণ্টের নিন্দাবাদে গ্রাম ভরিয়া গেল। কিন্তু হাণ্ট দৃক্‌পাতশূন্য। দ্বিতীয় পত্নী হাণ্টের প্রতি অনুরাগিণী ছিলেন, না ভয়ে অসুরের ভোগে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন তাহা অবশ্যই ঠিক করিয়া বলিবার উপায় নাই।

একমাস হইল হাণ্ট পুনরায় দার পরিগ্রহ করিয়াছে। যে নয়নানুরাগ বা ভোগলালসায় সুশীলা পত্নী চক্ষের বিষ হইয়াছিলেন সে ভালবাসায় অবশ্যই এখন ভাটার টান। কিন্তু স্রোত এখনও অন্যদিকে গড়াইবার অবসর প্রাপ্ত হয় নাই। সুতরাং পতিপত্নী এখনও এক ঘরেই বাস করিতেছে। একদা রাত্রিযোগে হাণ্ট নব-পরিণীতা পত্নীর সহিত এক শয্যায় শয়ন করিয়া আছে; তখনও তাহাদিগের নিদ্রাকর্ষণ হয় নাই। এমন সময় রুদ্ধ গবাক্ষের গায়ে কে ঠক ঠক করিয়া শব্দ করিল। শব্দ উভয়েই স্পষ্ট শুনিতে পাইল। তাহারা মনে করিল, কোন পথিক হয়ত পথ ভুলিয়া ঐ স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এই সিদ্ধান্ত করিয়া উভয়ে চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু আবার জানালায় পূর্ববৎ ঠক ঠক ঠক শব্দ হইল। তথাপি হাণ্ট উঠিল না। ব্যাপার কি, জানালার বাহিরে কে শব্দ করিতেছে, ইহা জানিবার নিমিত্ত হাণ্টের আদেশ ক্রমে পত্নী শয্যাত্যাগ করিয়া গবাক্ষের নিকটে গমন করিল এবং দ্রুতহস্তে জানালা খুলিয়া ফেলিল। জানালা খুলিয়া সে যাহা দেখিল তাহাতে আর সে প্রকৃতিস্থ রহিল না— 'ওমা!— ওকি?' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল।

'অ্যা। এঁকি!— এ আবার কোন ন্যাকাপনা' এই বলিয়া স্বামী গর্জিয়া উঠিল। যুবতী ভীতি বিস্ফারিত নেত্রে জানালার পানে তাকাইয়া করে কর কচলাইতে কচলাইতে অর্ধস্ফুট স্বরে কহিল, 'তোমার স্ত্রী!— তোমার স্ত্রী।— দেখ দেখ, ঐ জানালার দিকে চাহিয়া দেখ, ঐত সে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। দেখ, ঐত ঐখানে।'

মধুরভাষী স্বামী উত্তর করিল, 'দাঁড়াইয়া রহিয়াছে তোমার মাথা। নির্বোধ, নেকী, যাও যাও আবার ভাল করিয়া দেখ কে; আর না হয় জানালাটা একবারে বন্ধ করিয়া আইস।'

পত্নী উঠিল না। জানালার কাছে কিছুতেই গেল না। হাণ্টের ভৈরব গর্জনেও সে ভয় পাইয়া শয্যায় ফিরিয়া আসিল না। হাণ্ট একান্ত

দায়ে ঠেকিয়া অত্যন্ত বিরক্তির সহিত শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিল। 'এ পাপের ন্যাকামিতে একটু ঘুমাইতেও পারিব না' এই মর্মে কি বিড়বিড় করিতে করিতে নিতান্ত অনিচ্ছায় জানালার নিকটে উপস্থিত হইল।

হাণ্ট জানালার ভিতর দিয়া চাহিয়া যাহা দেখিতে পাইল, তাহাতে তাহার চক্ষুস্থির হইল, মাথা ঘুরিয়া গেল। দেখিল—গবাক্ষ হইতে মাত্র এক ফুট ব্যবধানে প্রকৃতই তাহার পরলোকগতা স্ত্রী দাঁড়াইয়া! জীবিত থাকিতে সে সর্বদা যে পরিচ্ছদ পরিত, পরিধানে সেই পরিচ্ছদ; এক দৃষ্টিতে তাঁহারই মুখপানে তাকাইয়া রহিয়াছে। সে পলকশূন্য দৃষ্টি এত তীব্র ও মর্মভেদী যে, হাণ্টের পাষাণ কঠিন নির্ভীক প্রাণও কাঁপিয়া উঠিল। আজি সে ও-দৃষ্টি সহ্য করিতে পারিল না। তাহার অদম্য সাহস ও দুর্জয় গর্ব যেন কোথায় উড়িয়া গেল। হাণ্ট সংজ্ঞাশূন্য ও বিমূঢ় অবস্থায় পশ্চাদ্দিকে সরিয়া আসিল। তাহার আপাদমস্তক সমস্ত শরীর থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল! সে আর দাঁড়াইতে পারিল না, অবসন্ন দেহে একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িল এবং বিকারগ্রস্ত রোগীর ন্যায় আকুলকণ্ঠে আপনা আপনি নানারূপে প্রলাপ কহিতে আরম্ভ করিল। 'আমার স্ত্রী, সত্যই আমার স্ত্রী! ঐ ত সে। আমি যে পাপ করিয়াছি, তজ্জন্য আমাকে শাস্তি দিতে আসিয়াছে। আমি তাহাকে যত যাতনা দিয়াছি, তাহারই প্রতিশোধ লইবার জন্য উপস্থিত হইয়াছে! ওকি চক্ষু! ওকি দৃষ্টি! সুশীলে, আমাকে ক্ষমা কর। পায়ে ধরি, অমন বাঘিনীর মত চোখ করিয়া আর আমার দিকে চাহিও না। ঐত, ঐত, আবার, আবার! হায়, আমি কি করিব? হায়, আমি এখন কোথায় পালাইব?'

হাণ্ট আর সে হাণ্ট নহে; একবারে বিকল ও উন্মাদ। হাণ্টের গৃহে এত রাত্রিতে গণ্ডগোল ও চীৎকার শুনিয়া প্রতিবেশীদিগের অনেকেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা প্রথমতঃ হাণ্ট ও হাণ্টের স্ত্রীর এই আকস্মিক ক্ষিপ্ততার কারণ কিছু বুঝিতে পারিলেন না। বিশেষ যত্ন ও শুশ্রূষা দ্বারা পতি ও পত্নীকে সুস্থির ও প্রকৃতিস্থ করিতে চেষ্টা করিলেন। হাণ্টের স্ত্রী বহু যত্ন ও শুশ্রূষায় কিছুক্ষণ পরে কিঞ্চিৎ সুস্থ হইল। প্রতিবেশীরা তাহার মুখে ছায়া-দর্শনের অদ্ভুত কাহিনী শুনিলেন। কিন্তু হাণ্ট কিছুতেই প্রবোধ পাইল না। তাহার চক্ষু দুটি বিস্ফারিত; চক্ষের তারা ঊর্ধ্বে উত্থিত; বদনে বিকট আর্তনাদ, অন্তরে ঘোর আতঙ্ক। কে যেন তাহাকে ধরিয়া লইতে উদ্যত হইয়াছে, কে যেন

তাহাকে দ্বিখণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিতে অসি উত্তোলন করিতেছে সহস্র বৃশ্চিক যেন এক সঙ্গে তাহার মর্মস্থানে দংশন করিতেছে; ক্ষিপ্ত অধীর ও বিমূঢ়চিত্ত হাণ্টের এই ভাব কিছুতেই প্রশমিত হইল না। শরীরের রোমাঞ্চ ঘুচিল না; কম্প থামিল না। সে একবার উঠিতেছে আবার বসিতেছে, আবার দৌড়াইয়া পলাইতে চাহিতেছে। 'ঐত আমার স্ত্রী, ঐত এল— ঐত এল' মুখে কেবল এই শব্দ।

ইহার পরে চারি পাঁচ মাসেও হাণ্ট ভালরূপ সুস্থ হইতে পারিল না। অবশেষে বহুদিন অন্তে যখন প্রকৃতিস্থ হইল তখন সে সম্পূর্ণ আর-এক মানুষ। তাহার সে দুর্দান্ত কঠোর স্বভাবের সর্বতোভাবে পরিবর্তন ঘটিল। মুখে অনুতাপের বিষাদ রেখা। সে আর তেমন পরুষভাষী উদ্ধত রহিল না, সকলের নিকটই যারপরনাই নম্র ও বিনীত এবং একান্ত শিষ্ট শান্ত; জীবন ভরিয়া যাহার সে অপকার করিয়াছে তাহার সেই ক্ষতিপূরণে প্রয়াসপর ও পাপের প্রায়শ্চিত্তে যত্নবান্। ইহার পর যখনই সে কাহারও নিকট ছায়া-দর্শনের ঐ কাহিনী বর্ণনা করিত তখনই তাহার হৃৎকম্প উপস্থিত হইত; সে স্বর্গগত সতী লক্ষ্মীর নাম করিয়া ধারায় চক্ষের জল ফেলিত; এবং পত্নীর সেই প্রগাঢ় ভালবাসা ও নিজের সেই অমানুষ নিষ্ঠুরতার বিষয় যুগপৎ স্মরণ করিয়া নয়নজলে মনের আগুন নিবাইতে বিবিধ প্রকারে চেষ্টা করিত।

পরলোকগতা পত্নী যে অমন ভাবে দেখা দিয়াছিলেন ইহা কি তাঁহার আপনার প্রাণনিহিত বিষাদ ক্ষোভে, আত্মবিড়ম্বনার প্রতিশোধ লইবার কামনায়, না হাণ্টের এই মঙ্গলজনক পরিবর্তন উদ্দেশে কোন দেবপুরুষের উপদেশে, কে তাহা বলিবে?

সপ্তম অধ্যায়

উপক্রম

ইহা বড়ই সৌভাগ্যের বিষয় যে বঙ্গীয় পাঠকবর্গ অধ্যাত্মতত্ত্বের মর্ম বুঝিবার জন্য ক্রমেই অধিকতর ঔৎসুক্য দেখাইতেছেন ; এবং ছায়া-দর্শনের কাহিনীগুলি পুনঃ পুনঃ পাঠ করিয়া পারলৌকিক জীবনের প্রকৃত অবস্থা পরিগ্রহ করিতে যত্ন পাইতেছেন। আমরা এবার তাঁহাদিগকে তিন দেশের তিন বিভিন্ন প্রকারের তিনটি কাহিনী উপহার দিলাম। যাঁহারা এই তিনটি প্রামাণিক কাহিনীর আমূল বৃত্তান্ত মনোযোগের সহিত আলোচনা করিবেন তাঁহারা নিশ্চয়ই কএকটি সার সত্য লাভ করিতে সমর্থ হইবেন।

১। মৃত্যুর নাম মহানিদ্রা অথবা মহানির্বাণ নহে ; মৃত্যুর নাম দেহত্যাগ। সর্পের দেহ একটা বহিরাবরণে আবৃত থাকে। উহার সাধুভাষিত নাম নির্মোক এবং প্রচলিত নাম খোলস। সর্প যেমন উহার সেই দৈহিক নির্মোক অথবা খোলসটিরে পরিত্যাগ করিয়াও ঠিক যেমন ছিল তেমনই থাকে, কোন অংশেও পরিবর্তিত হয় না ; মনুষ্যও সেইরূপ তাহার এই অস্থিমাংসময় স্থূলদেহ পরিত্যাগের পর সূক্ষ্মদেহ ধারণ করিয়া ঠিক যেমন ছিল তেমনই রহে, কোন অংশেও কোনরূপ পরিবর্তনের অধীন হইয়া আর-একজন হইয়া যায় না।

২। মৃত্যুর পর আকৃতির যেমন পরিবর্ত হয় না কাহারও প্রকৃতিতেও সেইরূপ সহসা কোন পরিবর্তন ঘটে না। যে মন্দ, মূঢ়স্বভাব এবং মনুষ্যের উৎপীড়ক, মনুষ্যের সুখ-শান্তিনাশক সে অগ্নিদগ্ধ স্বর্ণের ন্যায় আত্মদ্রোহ-জনিত অনুতাপের পরিশোধক অগ্নিতে পোড়া পোড়া হইয়া ক্রমশঃ ভাল হয়, ক্রমশঃ পবিত্র প্রশান্ত প্রেম, ভক্তিপূর্ণ ও পরার্থসেবী দেবপুরুষ হইয়া উন্নতি লাভ করে। কিন্তু কাহারও এই প্রকার পরিবর্ত এক দিনে ঘটে না ; ক্রমে ঘটে। যখন প্রকৃতিতে এই প্রকার প্রার্থিত পরিবর্ত ঘটে তখন আকৃতিও যারপরনাই সুন্দর ও জ্যোৎস্নার ন্যায় সুখশীতল হইয়া সকলের আনন্দ জন্মায়। তাহা না হওয়া পর্যন্ত যে এখানে যেমন ছিল পরলোকেও তেমন থাকে এবং এখানে যাহার প্রতি যেরূপ অনুরক্ত কিংবা বিরক্ত ছিল সেখানেও তাহার প্রতি সেইরূপ অনুরক্ত কিংবা বিরক্ত রহে।

৩। ইহলোক ও পরলোক অথবা পৃথিবীধাম ও অধ্যাত্ম জগৎ উভয়ই ধর্মরাজ্যের অন্তর্গত, ধর্ম প্রতিষ্ঠাতা বিশ্ববিধাতার প্রেমমংগলময় আজ্ঞানুগত। মনুষ্য এখানে ধর্মকে কতকটা এড়াইয়া চলিতে পারে। কিন্তু সেখানে তাহা একেবারেই সম্ভবপর নহে। কেননা সেখানে সকলেই সকলের পার্থিব জীবন-সংক্রান্ত সমস্ত কথা প্রত্যক্ষবৎ জানিতে পায় এবং জানিয়া যে যেমন আদরের উপযুক্ত তাহাকে সেই প্রকার আদরে অভ্যর্থনা করে। তবে এই এক বিশেষ কথা। সেখানে কেহই কাহারও অপকার করে না। সকলেই সকলের উপকার করিবার জন্য আকুল রহে।

আজিকার প্রথম কাহিনীটিতে যাহার কথা, সে পরপারে যাইয়াও প্রাণে শান্তিলাভ করিতে পারিতেছে না। তাহার হৃদয় ঋণ-যন্ত্রণায় নিপীড়িত। ঋণ সামান্য, তথাপি উহা ঋণ। দ্বিতীয় কাহিনীর আত্মা অপত্য স্নেহের প্রবল আকর্ষণে পৃথিবীতে আকৃষ্ট। অনেকেই এইরূপ আকৃষ্ট হয়; কিন্তু সকলে আসিতে পারে না। কেহ কেহ যাতায়াতের শক্তি লাভ করিলেও পুনরায় পৃথিবীতে আসিয়া দেখা দিতে ইচ্ছা করে না। তৃতীয় কাহিনীর আদ্যোপান্ত সমস্ত কথাই দুঃসহ দুঃখের কথা। যাহার দুঃখময় জীবনের আখ্যায়িকা প্রকাশিত ও লিখিত হইয়াছে, সে পরপারে যাইয়াও আপনার প্রাণাধিকা আশ্রিত বালিকার বিপদ ও দুঃখে আত্মবিস্মৃত। পাঠক এই তিনটি কাহিনীতেই শিক্ষা ও পরীক্ষার বহু কথা পাইবেন।

আত্মিক-কাহিনী

[আত্মার শান্তি]

স্কটল্যাণ্ডের রাজধানী এডিণবরা হইতে তেতাল্লিশ মাইল দূরে, টে-নদীর দক্ষিণ তটে পুরাতন পার্থ নগরে সেনানিবাসের সন্নিকটে দুটি দুঃখিনী বিধবার বাস। একটির নাম আনি সিম্‌সন (Anne Simpson), * আর-একটির নাম মালয় (Maloy)। আনি ও মালয় এক গৃহে বাস করে না, কিন্তু তাহারা পরস্পর অতি সন্নিহিত প্রতিবেশিনী। উভয়েই

* Anne এই নামটিরে বিশুদ্ধ ইংরেজীতে এন্ বলাই বোধ হয় সঙ্গত। কিন্তু আমরা আনি বিশান্ত নামের অনুকরণে বাঙ্গলা পদ্ধতিতে আনি সিম্‌সন লিখিলাম।

প্রৌঢ় বয়স্কা। আনি সিমসনের কেহ নাই; মালয়েরও ইহজগতে আপনার জন কেহ ছিল না। পরস্পর নিঃসম্পর্কিত হইলেও আনি ও মালয়ে বড়ই সৌহার্দ। আপন আপন দৈনিক জীবিকা অর্জনে উভয়েই সমস্ত দিন পরিশ্রম করিত, এবং অবসর সময়ে উভয়ে একত্র হইয়া আপন আপন দুঃখের কথা কহিয়া কহিয়া শ্রান্তি দূর করিত।

কালক্রমে মালয় পীড়িত হইল। পীড়া সাংঘাতিক। আনির শুশ্রূষা ও অশ্রুসিক্ত সম্ভাষা তাহাকে রাখিতে পারিল না। মালয় তনুত্যাগ করিল; নিরাশ্রয়া কাঙ্গালিনীর খবর কে লইবে?— ভিক্ষাজীবিনী দুঃখিনীর মৃত্যুতে কাহার প্রাণ ব্যথিত হইবে? মালয় নীরবে চলিয়া গেল। আনির এক বিন্দু অশ্রু ও একটি নীরব নিশ্বাসে তাহার অন্তিম সৎকার হইল, এবং নীরবে শবের সমাধি সমাপ্তি পাইল। আনির অন্য কেহ নাই; দুঃখিনীর দুঃখ সঙ্গিনী ছিল একমাত্র মালয়। সেও আজি পরলোকের অন্ধকারে অন্তর্হিত। কুটিরবাসিনী আনি এখন সম্পূর্ণ একাকিনী।

আনি সিমসন এক্ষণ সমস্ত দিন গ্রাসাচ্ছাদনের অন্বেষণে নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়ায়; রাত্রিতে আপন কুটীরে বিশ্রাম করে। এই নৈশবিশ্রামেও বিঘ্ন উপস্থিত হইল। মালয়ের মৃত্যুর কিছুদিন পরে এক রাত্রিতে সহসা আনির ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। ঘরে মিটি মিটি আলো জ্বলিতেছিল। দেখিতে পাইল তাহার শয্যার পার্শ্বে মালয় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সেই মুখ সেই চক্ষু পরিধানে সেই মলিন বসন কিন্তু অধিকতর কাতর অধিকতর বিষণ্ণ। আনি দেখিয়া চমকিয়া উঠিল। ভাবিল এ কি দেখিতেছি, ধাঁধা বুঝি। দুই হাতে চক্ষু রগড়াইয়া আবার ভাল করিয়া চাহিল। দেখিল সেই মূর্তি তেমনই ভাবে দণ্ডায়মান। শরীরে রোমাঞ্চ হইল, আনি ভয়ে চক্ষু বুজিল।

ছায়ামূর্তি কহিল 'আনি, কাহাকে ভয় করিতেছ? চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখ আমি তোমারই সেই প্রতিবেশিনী দুঃখিনী মালয়। জানত. পৃথিবীতে আমার কেহই নাই, কিছুই নাই। ভগিনী, তোমার নিকট আমার একটি ভিক্ষা।'

সেই মূর্তি আর মূর্তির মুখে এই উক্তি স্পষ্ট শুনিতে পাইয়া ভয়ে ও বিস্ময়ে একেবারে আড়ষ্ট হইয়া পড়িল। চক্ষু মেলিতে সাহস হইল না। বহুকষ্টে কম্পিত কণ্ঠে আনি কহিল, 'সত্যই কি তুমি সেই মালয়?

তবে কি তুমি এখনও জীবিত আছ ?'

ছায়ামূর্তি কহিল, 'তোমাদের হিসাবে আমার মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু আমি এখনও যেমন ছিলাম তেমনই আছি। আছি বড় কষ্টে! বোন, তুমি আমার একটু উপকার করিবে কি? আমি কিছু ঋণ রাখিয়া আসিয়াছি। ঋণ বেশী নহে, তের আনা মাত্র। এই ঋণই আমার সকল কষ্ট ও অশান্তির কারণস্বরূপ হইয়াছে। এই ঋণ থাকা হেতু আমি এখানে তিলেকের তরেও শান্তি পাইতেছি না। আনি, তুমি আমার জন্য একটু পরিশ্রম কর, একটি ধর্মযাজককে খুঁজিয়া লইয়া তাঁহার নিকট আমার ঋণের কথা বল। ধর্মযাজক দুঃখিনী বলিয়া দয়া করিবেন। তিনি অবশ্যই আমার ঋণ শোধ করিয়া দিবেন।'

আনি ইহার পরে সাহসে ভর করিয়া চক্ষু মেলিল। চাহিয়া দেখিল ছায়ামূর্তি আর সেখানে নাই। আনির ভয় ও বিস্ময় দূর হইল না। সে কি দেখিল, কি শুনিল?— ইহা কি স্বপ্ন না বিভীষিকা। কিছুই সে বুঝিতে পারিল না। আনি অবশিষ্ট রাত্রি জাগিয়া অতিবাহিত করিল।

এইদিন হইতে প্রতি রাত্রিতেই আনি সিমসন যেই শয্যায় গা দিত অমনিই মালয়ের ছায়ামূর্তি আসিয়া তাহার নিকটে উপস্থিত হইত এবং ঐ ঋণের কথা কোন ধর্মযাজকের নিকট বলিতে অনুরোধ করিত। আনির এখন রাত্রিতে নিদ্রা নাই ছায়ামূর্তির উৎপীড়নে; দিবসে শান্তি নাই আপন দৈনিক কার্যের উপরে ধর্মযাজকের অনুসন্ধানার্থ পর্যটনে। আনির দারিদ্র্যনিপীড়িত দুঃখের জীবন অধিকতর দুর্বহ হইয়া উঠিল।

এই সময়ে ক্যাথলিক ধর্মযাজক রেভারেণ্ড চার্লস্ ম্যাক্কে (Rev Charles Mckay) পার্থ্‌শায়র মিশনের প্রভুত্ব প্রাপ্ত হইয়া পার্থ্ নগরে উপস্থিত হইলেন। আনি সিমসন এই সংবাদ পাইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল এবং যথারীতি অভিবাদন করিয়া সসম্ভ্রমে দূরে দণ্ডায়মান রহিল।

রেভারেণ্ড চার্লস্ ম্যাক্কে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কি চাও বাছা?'

আনি কহিল, 'মহাশয়, আজি সাত-আট দিন অবধি আমি প্রতি রাত্রিতে একটি ছায়ামূর্তির আবির্ভাবে যারপরনাই কষ্ট পাইতেছি। প্রতিকার কামনায় আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। আপনার আশ্রয় না পাইলে, আমার আর উপায় নাই।'

ধর্মযাজক কহিলেন— 'তুমি কি ক্যাথলিক?'

আনি কহিল, 'না, মহাশয়, আমি প্রেস্‌বিটিরিয়ান।'

ধর্মযাজক বলিলেন, 'তবে তুমি আমার নিকট আসিলে কেন মা? আমি ত ক্যাথলিক ধর্মগুরু।'

আনি কহিল, 'যে রমণী আমাকে প্রতি রাত্রিতে দেখা দিতেছে, সে আমাকে যে-কোন ধর্মযাজকের দেখা পাই, তাঁহারই কাছে তাহার কথা বলিতে অনুরোধ করিতেছে। এক সপ্তাহ হইল আমি ধর্মযাজকের অনুসন্ধানে নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি।'

ধর্মযাজক বলিলেন, 'সে তোমাকে ধর্মযাজকের নিকট যাইতে অনুরোধ করিতেছে কেন?'

আনি কহিল, 'সে বলে, সে নাকি কিঞ্চিৎ ঋণ রাখিয়া গিয়াছে; এবং ধর্মযাজক সেই ঋণ শোধ করিবেন।'

ধর্মযাজক বলিলেন, 'ঋণের পরিমাণ কি?'

আনি কহিল, 'তের আনা মাত্র।'

ধর্মযাজক বলিলেন, 'এই তের আনা সে কাহার নিকট ধারে?'

আনি কহিল, 'আমি তাহা জানি না। সে বলে নাই।'

ধর্মযাজক বলিলেন, 'তুমি স্বপ্ন দেখ নাই ত?'

আনি কহিল, 'না বাবা, কখনও না। ধর্ম সাক্ষী, এ কখনও স্বপ্ন হইতে পারে না। সে প্রতি রাত্রিতে আমাকে দেখা দিয়া বারংবার এই ধরনের কথা বলিতেছে। আমি স্বপ্ন দেখিব কি, ক্ষণকালও ঘুমাইতে পারিতেছি না।'

ধর্মযাজক বলিলেন, 'ঐ রমণী কি তোমার পরিচিত ছিল?'

আনি কহিল 'সে আমার অতিনিকট প্রতিবেশিনী ছিল। সেনা-নিবাসের নিকটে আমরা দুই জন দুই কুটীরে স্বতন্ত্রভাবে বাস করিতাম। তাহার সঙ্গে আমার প্রতিদিন দেখাশুনা হইত; একটুকু প্রণয়ও ছিল। তাহার নাম মালয়।'

ধর্মযাজক অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পাইলেন, মালয় রজকীর কাজ করিত ও ঐ সেনাদলের সঙ্গে সঙ্গে থাকিত। মালয় কাহার নিকট ঋণী ইহা বাহির করিতে তাঁহাকে আরও একটুকু শ্রম স্বীকার করিতে হইল। যে মুদীর দোকান হইতে মালয় আহার্য ক্রয় করিয়া লইত, অবশেষে তিনি সেই মুদীর নিকট উপস্থিত হইলেন। মুদী কহিল মালয়ের নিকটে তাহার কিছু প্রাপ্য আছে বটে; কিন্তু কত পাওনা তাহা তাহার স্মরণ নাই।

মুদী তাহার খাতা খুলিয়া দেখিল এবং হিসাব করিয়া বলিল মালয়ের দেনা মাত্র তের আনা।

ধর্মযাজক শুনিয়া বিস্মিত হইলেন এবং অমনিই ঐ তের আনা পয়সা দিয়া মালয়কে ঋণমুক্ত করিয়া আসিলেন। মুদী মালয়ের মৃত্যুসংবাদ অবগত ছিল না। ইহার পরে ধর্মযাজক মহাশয় আনি সিমসনকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, তিনি যেদিন ঐ তের আনা ঋণ শোধ করিয়া দিয়াছেন সেইদিন হইতে আনি আর সে ছায়ামূর্তির সাক্ষাৎ পাইতেছে না।

রেভারেণ্ড চার্লস্ ম্যাক্কে স্রুজবেরীর কাউণ্টের ধর্মগুরু ও সুহৃদ্। ছায়া-দর্শন সংক্রান্ত এই বিচিত্র কাহিনীর সত্যতা সম্পর্কে তিনি এবং স্রুজবেরীর কাউণ্টপত্নী (Countess of Shrewsbury) আর কাউণ্ট অব স্রুজ্ বেরীর অন্যতম বন্ধু *Anatomy of Melancholy* অর্থাৎ বিষাদ বিশ্লেষ-তত্ত্ব নামক গ্রন্থ প্রণেতা বিখ্যাত পণ্ডিত ডক্টর বিম্‌স্ মানব-জগতের নিকট দায়ী। ডক্টর বিম্‌স্ স্বকীয় গ্রন্থে স্পষ্ট নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন যে এরূপ বিষয়ে ইহা অপেক্ষা অধিকতর প্রামাণিক ঘটনা আর তাঁহার জ্ঞানগোচর হয় নাই। এখানে জিজ্ঞাসা হইতে পারে আরও তো সহস্র লোক ঋণগ্রস্ত অবস্থায় সংসার হইতে চলিয়া যায়। তাহারা ফিরিয়া আইসে না কেন? আইসে না প্রবৃত্তি শক্তি ও সুযোগের অভাবে অথবা সেখানেই মহাজনের কৃপায় ক্ষমা পায় বলিয়া। ইহা ছাড়া আরও কত অজ্ঞাত কারণ থাকিতে পারে কে তাহার তত্ত্ব নির্দেশ করিবে?

[অপত্য-স্নেহ]

বিদেশে স্বামীর বিয়োগ ঘটিয়াছে। বিয়োগ-বিধুরা বিধবার প্রাণে মুর্মুর দাহ, নয়নে অশ্রুপ্রবাহ। পাঁচ বৎসরের একটি মাত্র অবোধ মেয়ে এখন তাঁহার সংসারের সম্বল। শিশু বালিকা কখনও ছাঁদিয়া গলা ধরিয়া মায়ের কোলে চাপিয়া বসিতেছে, কখনও মায়ের মলিন মুখপানে তাকাইয়া তাকাইয়া কচি করে মায়ের নয়ন জল পুছাইয়া দিতেছে আর ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিতেছে, 'তুই এখন কেবলই কাঁদিস্ কেন মা? আবার তেমনই করিয়া তুই হাসিবি কবে মা?' বালিকা যখন এইরূপ প্রশ্ন করে তখনই বিধাবার হাড় পাঁজর ভাঙ্গিয়া অশ্রুধারা বহিতে থাকে; কিন্তু

তিনি শিশুর প্রাণের দিকে চাহিয়া কষ্টে আত্মসংবরণ করেন। বালিকা শুনিয়াছে তাহার পিতা স্বর্গে গিয়াছেন। স্বর্গ কোথায়, স্বর্গে গমনের অর্থ কি, সে তাহা বুঝিতে পারে নাই। সে ইহাও জানে না অথবা বুঝে নাই যে তাহার মা বিধবা হইয়াছেন আর সে পিতৃহীনা হইয়াছে।

বিধবা একদিন কোন আত্মীয়ার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছেন। মেয়েটি তাঁহার সঙ্গে। আত্মীয়ার অনুরোধে তিনি তাঁহার গৃহেই রাত্রি যাপন করিতে বাধ্য হইলেন। বালিকাটিকে বুকে করিয়া বিধবা ঘুমাইয়া রহিলেন। সহসা বালিকার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। বালিকা চক্ষু মেলিয়া দেখিতে পাইল শয্যার পার্শ্বে তাহার পিতা দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন।

বাপের আদর সোহাগিনী মেয়ে অমনই 'বাবা' 'বাবা' বলিয়া উল্লসিত হইয়া উঠিল। কহিল, 'বাবা, তুমি কখন আসিয়াছ আমার জন্য স্বর্গ হইতে কি আনিয়াছ? আমি যে পুতুলের কথা বলিয়াছিলাম তাহা কই?' ইহার পরে বালিকা নিদ্রাগতা জননীকে জাগাইবার নিমিত্ত জোরে ধাক্কা দিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল, 'মা, মা, উঠ উঠ, চাহিয়া দেখ বাবা আসিয়াছে।' কিন্তু বিধবার নিদ্রা ভঙ্গ হইল না। খানিক পরে বালিকা দেখিতে পাইল পিতা শয্যাপার্শ্ব হইতে ধীরে ধীরে সরিয়া নিকটবর্তী অন্য একটি কোঠার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বালিকা কিছুক্ষণ ঐ দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে আবার ঘুমাইয়া পড়িল।

যথাসময়ে রাত্রি প্রভাত হইল। বিধবা শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। বালিকাও উঠিল। বালিকা শয্যা হইতে উঠিয়াই ত্রস্ত ব্যস্ত ভাবে মায়ের হাত ধরিয়া পিতাকে রাত্রিকালে যে কোঠায় প্রবেশ করিতে দেখিয়াছিল সেই কোঠার দিকে টানিয়া লইয়া চলিল। কহিল, 'মা, বাবা আসিয়াছেন। তুই ঘুমাইয়া ছিলি, বাবা আসিয়া আমাদিগের শয্যার পার্শ্বে দাঁড়াইলেন। আমি কত ডাকিলাম, কত চেঁচাইলাম, তবু মা তোর ঘুম ভাঙ্গিল না। বাবা তোর মুখের পানে অনেকক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিলেন। আমি পুতুল চাহিলাম কিছু বলিলেন না। শেষে তুই জাগিলি না দেখিয়া ঐ কোঠায় চলিয়া গেলেন। চল মা চল, ঐ কোঠায় যাই। ঐখানে গেলেই বাবাকে দেখিতে পাইবি।'

বিধবা বালিকার বর্ণনা শুনিয়া এবং উহার জেদ ও আগ্রহ দেখিয়া, স্পষ্টই বুঝিতে পাইলেন যে, বালিকা প্রকৃতই রাত্রিকালে উহার স্বর্গগত পিতার ছায়ামূর্তি দেখিতে পাইয়াছে। লোকান্তরিত পতি তাঁহাকে

দেখা দিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার নিতান্তই দুরদৃষ্ট। তাই তাঁহার ঘুম ভাঙে নাই। মুগ্ধস্বভাবা শিশু বালিকার ভাব দেখিয়া তাঁহার চক্ষে জল আসিল। তিনি অশ্রুপ্লুত নেত্রে ঊর্ধ্বমুখী হইয়া গদগদ কণ্ঠে কহিলেন, 'প্রিয়তম, আমি নিতান্ত হতভাগিনী, তাই তোমার দেখা পাইলাম না। তুমি অবোধ শিশুকে দেখা দিয়া ইহাই বুঝাইয়া গেলে যে, স্বর্গগত হইয়াও তুমি আমাদিগকে একেবারে ভুলিতে পার নাই।'

বালিকা কাতর চক্ষে মায়ের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'মা, তুই আকাশের দিকে চাহিয়া কাহার সঙ্গে কথা কহিলি? বাবা কি তবে আইসেন নাই? মা, বাবা কোথায়?' মা আকুল প্রাণে ঊর্ধ্বে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া কহিলেন, 'তিনি ঐ স্বর্গে।' বালিকা কহিল, 'বাবা স্বর্গ হইতে আবার কবে ফিরিয়া আসিবেন?' বিধবা কহিলেন, 'হায় তিনি আর ফিরিয়া আসিবেন কি?' এই বলিয়া বিধবা বালিকাকে বুকে টানিয়া লইলেন, এবং অবসন্ন দেহে ও অধীর প্রাণে বসিয়া পড়িলেন।

পূর্বেই বলিয়াছি, পিতার মৃত্যু হইয়াছিল দেশান্তরে। বালিকা মৃত্যু দেখে নাই। বালিকা সেদিন মায়ের সঙ্গে অন্যের গৃহে বেড়াইতে গিয়াছিল। পিতার কথা একবারও চিন্তা করে নাই। এইরূপ চিন্তাশূন্য অবস্থায়ও সে তাহার পিতার দেখা পাইল ইহাই ঘটনার বৈচিত্র্য। ইহাতে কোনরূপেও কল্পনার সংস্পর্শ নাই এবং বর্ণনায়ও কোন প্রকার অতিরঞ্জনের সম্ভাবনা নাই। এই জন্যই ইহা ছায়া-দর্শনের একটি বিশেষ কাহিনী। পণ্ডিত সমাজে সুপণ্ডিত বলিয়া পরিচিত মিস্ ফেলিসিস্ স্কিন ক্যাসেলস্ ম্যাগাজিন নামক সাহিত্য পত্রে এই ঘটনা সবিস্তারে বিবৃত করিয়াছেন।

[আশ্রিত-বাৎসল্য]

শ্যাম সাগরের তটে, সুসভ্য জগতের বহুদূরে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শৈলমালার উপরে প্রকৃত শোভাশালিনী ওদেসা নগরী। ওদেসা (Odessa) রুশ সাম্রাজ্যের চতুর্থ নগরী বলিয়া বিখ্যাত। উহার লোকসংখ্যা এইক্ষণ তিন লক্ষের কম নহে। দরিদ্রের নিবাস সমুদ্রের নিকটে নিম্নভূমিতে; এবং সমৃদ্ধদিগের নিবাস সাধারণতঃ সমুদ্র হইতে একটু দূরে উচ্চভূমিতে। এখানে বিস্তৃত কাঠের কারবার আছে। ওদেসায় কোন কাঠের গোলায়

একটি বৃদ্ধ সমস্তদিন কাড়িকাঠের উপর বসিয়া ভিক্ষা করিত। বৃদ্ধের নাম মাইকেল। মাইকেল অন্ধ। মাইকেল একটি কাঠের পাত্র সম্মুখে রাখিয়া দিত। ঐ পথ দিয়া যাইবার সময় যাঁহার প্রবৃত্তি হইত তিনি ঐ কাঠের পাত্রে বৃদ্ধের জন্য কিছু রাখিয়া যাইতেন। এই প্রকার ভিক্ষালব্ধ বস্তুই বৃদ্ধের দৈনিক উপজীব্য।

মাইকেলের কেহ নাই। কে অন্ধের চক্ষু হইয়া তাহার করধৃত নড়ি ধরিয়া সুদূরস্থিত সমৃদ্ধদিগের বাড়ী বাড়ী ভিক্ষার্থে তাহাকে লইয়া যাইবে ? তাই এক স্থানে উপবিষ্ট থাকিয়া মাইকেল যাহা পাইত তদ্দ্বারাই অতিকষ্টে ও অতি দুঃখে তাহার জীবনযাত্রা নির্বাহ করিত। সকলেরই একটা পরিচয় আছে। কাঠের গোলার অন্ধও সর্বসাধারণের নিকট ক্রমে পরিচিত হইয়া উঠিল। অন্ধ মাইকেল যৌবন সময়ে বড় সাহসী যোদ্ধা ছিল। সে যুদ্ধে অনেকবার আঘাত পাইয়াছিল। লোকে বলিত একবার গুলির আঘাতে তাহার দুটি চক্ষুই নষ্ট হইয়া গিয়াছে, এবং সেই ঘটনা হইতেই সে এই দুরবস্থায় পড়িয়া আছে। লোকের মুখে-মুখে বৃদ্ধ মাইকেল সম্বন্ধে এইপ্রকার মন্তব্য ঘুরিয়া বেড়াইত, কিন্তু বৃদ্ধ কখনও এইরূপ জনরব রচিত উপন্যাসের সম্পর্কে একটি কথাও কহিত না। সে নীরবে বসিয়া শুনিত ; শুনিয়াও নীরব রহিত।

একদা রাত্রিকালে অন্ধের কুটীরদ্বারে অতি ক্ষীণ কণ্ঠের কাতর রোদনশব্দ শ্রুত হইল। অন্ধ দ্বারে আসিয়া হস্তস্পর্শে বুঝিতে পারিল, একটি বালিকার অনাবৃত ও কঙ্কালসার দেহ ভূপতিত রহিয়াছে। রুশিয়ার শীতে নদী জমিয়া যায় ও স্ফটিক নির্মিত বিশাল পরিসর রাজপথের মত শোভা পায় ; শিরায় শোণিতের গতি নিরুদ্ধ হইয়া আইসে। দুঃসহ শৈত্যের মারাত্মক শীতল নিঃশ্বাসে মানুষের গায় ফোস্কা পড়ে। এইরূপ শীতেও বালিকার গায়ে বস্ত্র নাই। শীতের অসহনীয় ক্লেশে বালিকার সমস্ত শরীর ঠক ঠক করিয়া কাঁপিতেছে। জিহ্বায় কথা সরিতেছে না। উদরে অন্ন নাই ; বালিকার উত্থানশক্তি রহিত এবং চরম মুহূর্ত নিকটবর্তী। চক্ষু মেলিয়া চায় না। কোনরূপ শব্দ করিয়াও মনের ভাব বুঝাইতে পারে না ! বুকের ধুকধুকিটুকুও যেন থামিয়া আসিতেছে। বৃদ্ধের অন্ধনেত্রে ধারায় অশ্রু ঝরিল। ইহা অশ্রু নহে, মন্দাকিনীর অমৃত ধারা। ‘তুমি কে গো বাছা, এই অবস্থায় এই বৃদ্ধ ও অক্ষম অন্ধের দুয়ারে আসিয়া ধুলায় লুটাইতেছ ?’ এই বলিয়া বৃদ্ধ কোলে করিয়া বালিকাকে

ঘরে লইয়া গেল।

বৃদ্ধের যত্নে ও শুশ্রূষায় এবং কুটীরস্থ বহ্নির উত্তাপে বালিকা ক্রমে একটুকু প্রকৃতিস্থ হইল। অতঃপর বৃদ্ধ জানিতে পারিল যে, বালিকার নাম (Powleska) পোলেস্কা। বয়স মাত্র দশ বৎসর। অভাগিনীর পিতামাতা, ভাই-বন্ধু, নাই বলিতে ইহজগতে কেহই নাই। নিরাশ্রয়া ও বিপন্না বালিকা আজি মুমূর্ষু অবস্থায়, নিরাশ্রয় ও বিপন্ন অন্ধ বৃদ্ধের ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া প্রাণে বাঁচিল।

অন্ধ, বালিকাটিকে আপন পুত্রীর ন্যায় কুটীরে আশ্রয় দিয়া রাখিল। পিতৃস্নেহের কাঙ্গালিনী দুঃখিনী বালিকাও বাবা বাবা বলিয়া বৃদ্ধের গলা জড়াইয়া ধরিয়া, আপনার অফুটন্ত শিশু প্রাণ শীতল করিল। অন্ধ বালিকাকে এবং বালিকা অন্ধকে পাইয়া কৃতার্থ। উভয়েই এখন পরম সুখী। অন্ধ এখন আর কাঠের গোলায় কড়িকাঠে বসিয়া সদয় পথিকের দয়ার প্রতীক্ষায় হাত পাতিয়া থাকে না। বালিকাও এখন আর রাত্রির অন্ধকারে নিরাশ্রয়ে ও অনাহারে শীতে কাঁপিয়া পথে পড়িয়া মরিয়া থাকিবার ভয় রাখে না। বালিকা অন্ধের নয়ন ও নড়ি; অন্ধ একাধারে বালিকার পিতা মাতা ও প্রাণের আশ্রয়। অন্ধ এখন পোলেস্কার সাহায্যে দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া ভিক্ষা করিতে সমর্থ। অন্ধের দিন এখন বেশ সুখেই কাটিয়া যাইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে পাঁচটি বৎসর পার হইয়া গেল। বালিকা এখন পঞ্চদশ বর্ষীয়া।

কিন্তু অদৃষ্ট বিশ্বরহস্যের অজ্ঞাত নিয়মানুসারে, আবার তাহাদের প্রতি দুর্দৈব বিমুখ হইল। একদা প্রাতে অন্ধ ও বালিকা এক বাড়ীতে ভিক্ষা করিতে গিয়াছিল। সেই বাড়ীতে চুরি হইল। পুলিশ গৃহস্বামীর কথা অনুসারে সন্দেহ করিয়া পোলেস্কাকে ধরিল ও তাহার ভিক্ষার ঝুলি হইতে অভিযোগের উল্লিখিত অপহৃত বস্তু বাহির করিয়া ফেলিল। চুরির প্রত্যক্ষ প্রমাণে পুলিশ পোলেস্কাকে অন্ধের আশ্রয় হইতে তৎক্ষণাৎ কাড়িয়া লইয়া গেল। অন্ধ আবার যে একাকী সেই একাকী হইয়া, আঁধার চক্ষে আরও ভয়াবহ অন্ধকার দেখিতে লাগিল।

এই দিন হইতে অকস্মাৎ অন্ধও অদৃশ্য। কেহই তাহাকে দেখিতে পাইল না। বৃদ্ধ এইরূপে গা ঢাকা দিলে চুরির সন্দেহ যাইয়া তাহার উপরেও গড়াইয়া পড়িল। বৃদ্ধ কোথায় আছে, সম্ভবতঃ বালিকা ইহা জানে, এই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া বালিকাকে ম্যাজিষ্ট্রেটের সমীপে

আনয়ন করা হইল। ম্যাজিস্ট্রেট জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মাইকেল কোথায় আছে তুমি বলিতে পার কি?' বালিকা বলিল, 'সে নাই।' এই বলিয়া বালিকা দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ফুকরিয়া কাঁদিতে লাগিল।

বালিকা তিন দিন অবধি হাজতে আবদ্ধ। বাহিরের কোন খবর তাহার নিকট পহুঁচে নাই। অথচ সে দৃঢ়তার সহিত বলিতেছে যে, মাইকেলের মৃত্যু হইয়াছে। শুধু মুখেই ইহা বলিতেছে এমন নহে, বলিতে বলিতে প্রকৃতই পিতৃহীনা বালিকার ন্যায় আকুল প্রাণে কাঁদিতেছে। এ বস্তুতঃ বড় বিস্ময়াবহ।

ম্যাজিস্ট্রেট আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মাইকেল মরিয়া গিয়াছে, একথা তোমায় কে বলিল?'

বালিকা বলিল, 'কেহ বলে নাই।'

ম্যাজিস্ট্রেট জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তবে তুমি ইহা জানিলে কিরূপে?'

বালিকা বলিল, 'আমি দেখিয়াছি, তাঁহাকে মারিয়া ফেলিয়াছে।'

ম্যাজিস্ট্রেট বলিলেন, 'তুমি ত কখনও কারাগারের বাহিরে যাও নাই তবে দেখিলে কিরূপে?'

বালিকা বলিল, 'তথাপি প্রকৃতই আমি ইহা দেখিয়াছি।'

ম্যাজিস্ট্রেট বলিলেন, 'ইহা কিরূপে সম্ভবপর? কথাটি ভাল করিয়া বুঝাইয়া বল দেখি।'

বালিকা বলিল, 'আমি তাহা পারিব না। আমি এইমাত্র বলিতে পারি যে, আমি তাহাকে মারিয়া ফেলিতে দেখিয়াছি।'

ম্যাজিস্ট্রেট জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কোন সময়ে, কিরূপে তাহাকে মারিয়া ফেলিল?'

বালিকা বলিল, 'আমাকে যে সময়ে ধরিয়া আনে সেই সময়েই।'

ম্যাজিস্ট্রেট আবার বলিলেন, 'তা কেমন করিয়া হইবে? তুমি যখন ধৃত হও, তখন ত সে জীবিত।'

বালিকা বলিল, 'হাঁ তা ছিলেন। আমি ধৃত হইবার একঘণ্টা পরে, তাঁহাকে হত্যা করিয়াছে। তাহারা তাঁহাকে ছুরিকার আঘাতে মারিয়াছে।

ম্যাজিস্ট্রেট ক্রমেই অধিকতর বিস্মিত। তিনি কহিলেন, 'তুমি তখন কোথায় ছিলে?'

বালিকা কহিল, 'তা জানি না, কিন্তু আমি ইহা দেখিয়াছি।'

বালিকা যেরূপ দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত কথা বলিতেছে, তাহাতে তাহার

কথায় অবিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইতেছে না। অথচ কথাগুলি এমনই অসম্ভব ও অযৌক্তিক যে, শ্রোতারা উহাতে বিশ্বাস করিতেও পারিতেছেন না। তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিলেন, বালিকা হয় উন্মাদিনী হইয়াছে, আর না হয়তো উন্মাদের ভান করিতেছে। অতঃপর তাঁহারা মাইকেলের কথা ছাড়িয়া দিয়া চুরি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন।

ম্যাজিস্ট্রেট কহিলেন, 'থাক্ সেকথা। তুমি কি চুরি করিয়াছ ?'

বালিকা উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, 'না—না—না, আমি চুরির কিছুই জানি না।'

ম্যাজিস্ট্রেট কহিলেন, 'তবে তোমার ঝুলিতে অপহৃত বস্তু আসিল কিরূপে ?'

বালিকা কহিল, 'আমি তা জানি না। আমি মাইকেলের হত্যা ভিন্ন আর কিছুই দেখি নাই।'

ম্যাজিস্ট্রেট বলিলেন, 'মাইকেল মারা পড়িয়াছে এরূপ অনুমান করিবার কোনই কারণ দেখা যায় না। সে মরিলে, তাহার মৃতদেহ অবশ্যই পাওয়া যাইত।'

বালিকা কহিল, 'কেন, পয়ঃপ্রণালীর মধ্যেই তো তাহার মৃতদেহ আছে।

ম্যাজিস্ট্রেট কহিলেন, 'কে তাহাকে হত্যা করিয়াছে, তুমি বলিতে পার ?'

বালিকা কহিল, 'হ্যাঁ, পারি। হত্যা করিয়াছে একটি স্ত্রীলোক। পুলিশ আমাকে মাইকেলের নিকট হইতে লইয়া আসিবার পরে তিনি একাকী ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতেছিলেন। একটি স্ত্রীলোকও একখানি তীক্ষ্ণ ছুরিকা হাতে লইয়া তাঁহার পিছে পিছে চলিয়াছিল। মাইকেল পায়ের শব্দ পাইয়া যেই ফিরিলেন, অমনি স্ত্রীলোকটি একখানি ধূসর বর্ণের বস্ত্র তাঁহার মাথার উপর ফেলিয়া দিল, মুখ ঢাকিয়া লইল, এবং বারংবার ছুরিকাদ্বারা আঘাত করিল। ক্রমে আটটা আঘাতের পর মাইকেল পড়িয়া গেলেন। ধূসরবর্ণের বস্ত্রখানি রক্তে ভিজিয়াছিল। দ্রুত টানিয়া স্ত্রীলোক উহা তুলিয়া লইল না; যে ভাবে ছিল, তাই সেই ভাবেই রহিল। সে মৃতদেহটাকে নিয়া নিকটবর্তী পয়ঃপ্রণালীতে ফেলিয়া দিয়া, চলিয়া গেল।'

ম্যাজিস্ট্রেট দেখিলেন, এই উক্তির সত্যতা পরীক্ষা করা সহজ। তিনি

তৎক্ষণাৎ পয়ঃপ্রণালী (aquidct)* খুঁজিয়া দেখিবার নিমিত্ত লোক পাঠাইলেন। বড়ই বিস্ময়ের বিষয় যে, বালিকা যেরূপ বলিয়াছিল, ঠিক সেই অবস্থায়, ধূসরবর্ণ বস্ত্রে মণ্ডিতমস্তক মৃতদেহ পয়ঃপ্রণালী হইতে উত্তোলিত হইল। সে দেহ মাইকেলের।

মাইকেলের মৃতদেহ পাওয়ার পরে, ম্যাজিস্ট্রেট আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সত্য করিয়া বল দেখি বাছা, তুমি কিরূপে এসব জানিতে পাইলে।' সে কেবল এই উত্তর করিল, 'আমি তাহা বলিতে পারি না। আমি চক্ষে যাহা দেখিতে পাইয়াছি তাহাই বলিয়াছি।'

ম্যাজিস্ট্রেট কহিলেন, 'আচ্ছা, যে হত্যা করিয়াছে তাহার নাম বলিতে পার? তাহাকে তুমি চেন?'

বালিকা কহিল, 'নামটা ঠিক বলিতে পারিব না। যে স্ত্রীলোকটি তাঁহার চক্ষু নষ্ট করিয়া দিয়াছিল, সেই তাঁহাকে হত্যা করিয়াছে। অদ্য রাত্রিতে তিনি আমাকে এ বিষয়ে সকল কথা খুলিয়া বলিবেন কহিয়াছেন, যদি বলেন, কাল আপনাদিগকে সমস্ত জানাইব।'

ম্যাজিস্ট্রেট কহিলেন, 'তিনি কে?'

বালিকা কহিল, 'কেন, সেই মাইকেল, নিশ্চয়ই সেই মাইকেল।'

ম্যাজিস্ট্রেট বালিকাকে হাজতে লইয়া যাইতে আজ্ঞা দিলেন। বালিকা চলিয়া গেল। তিনি বালিকা কোনপ্রকারে টের না পায়, এরূপভাবে সমস্ত রাত্রি সে কি করে, না করে ভাল করিয়া দেখিবার নিমিত্ত চতুর লোক নিযুক্ত করিলেন। প্রহরীরাও কৌতূহলাবিষ্ট ও সংশয়াকুল, তাহারাও প্রকৃত সত্য জানিবার জন্য যারপরনাই যত্নবান্। তাহারা দেখিল, বালিকা শয়ন করিল না। কেমন একপ্রকার আধ অবসাদ, আধ নিদ্রার ভাবে প্রায় সমস্ত রাত্রি বসিয়া কাটাইল। শরীর সাধারণতঃ স্পন্দনরহিত হইয়াও মাঝে-মাঝে স্নায়বিক আলোড়নে আলোড়িত এবং বালিকা যেন সম্মুখের দিকে তাকাইয়া, কাহারও সহিত অস্ফুট স্বরে কথোপকথনে ব্যাপৃত! পরদিন এই রিপোর্টসহ, বালিকা ম্যাজিস্ট্রেট সমীপে আনীত হইল। বালিকা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আসিয়াই বলিল, 'আমি হত্যাকারিনীকে

* রুশ রাজ্যে নিস্টার (Dniester) নামে একটি নদী আছে। সে নদী ওদেসা হইতে ২৭ মাইল দূরে। নিস্টার হইতে Aquiduct অর্থাৎ পয়ঃপ্রণালী যোগে জল আইসে এবং সেই জলই ওদেসায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

চিনিয়াছি, এবং তাহার পরিচয় পাইয়াছি। এখন তাহার নাম বলিতে পারি।'

ম্যাজিস্ট্রেট কহিলেন, 'ভাল, আমি তোমাকে যা জিজ্ঞাসা করি, তারই উত্তর দাও। মাইকেলের চক্ষু কিরূপে নষ্ট হইয়াছিল তাহা সে জীবিত থাকিতে তোমাকে বলিয়াছিল কি?'

বালিকা কহিল, 'না। কিন্তু যেদিন আমি ধৃত হই, সেইদিন প্রাতে তিনি আমাকে ইহা বলিবেন বলিয়াছিলেন; এবং ইহাই তাঁহার মৃত্যুর কারণ।'

ম্যাজিস্ট্রেট জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ইহা তাহার মৃত্যুর কারণ হইল কিরূপে?'

বালিকা কহিল, 'গত রাত্রিতে মাইকেল আমার কাছে আসিয়াছিলেন। তিনি ঐ দিন যাহা যাহা ঘটিয়াছিল সমস্ত আমাকে দেখাইয়া গিয়াছেন। মাইকেল যেখানে বসিয়া তাঁহার চক্ষু নষ্ট হওয়ার আগাগোড়া সমস্ত কাহিনী আমাকে বলিবেন বলিয়া ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন ঠিক সেখানে তাঁহার ও আমার পশ্চাৎ ভাগে একটি লোক লুকাইয়া থাকিয়া সমস্ত শুনিয়াছিল। লোকটি ইহা শুনিয়াই—।'

ম্যাজিস্ট্রেট বালিকাকে তাহার বাক্য সমাপ্ত করিতে না দিয়াই একটু দ্রুত জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি ঐ লোকটির নাম বলিতে পার?'

বালিকা কহিল 'তাহার নাম (Luck) লাক্। লাক্ মাইকেলের এই কথা শুনিয়াই একটা পরিসর পথের দিকে চলিয়া যাইতে লাগিল। ঐ পথটি হারবার (Harbour) অর্থাৎ জাহাজঘাটার দিকে গিয়াছে। কিছু দূর যাইয়া সে ডাহিনের দিকের তৃতীয় বাড়িতে প্রবেশ করিল।'

ম্যাজিস্ট্রেট কহিলেন 'তুমি তো ষ্ট্রীটের নাম জান?' বালিকা কহিল, 'না, আমি ষ্ট্রীটের নাম জানি না। কিন্তু সেই ষ্ট্রীটের সেই বাড়ীর লোকের সহিত একটি স্ত্রীলোকের যে সকল কথা হইয়াছে এবং তাহার পর যাহা যাহা ঘটিয়াছে তাহার সমস্তই আমি এইক্ষণ মাইকেলের নিকট প্রত্যক্ষবৎ জানিতে পাইয়াছি এবং বিবরিয়া বলিতে পারি।'

ম্যাজিস্ট্রেট ও কোর্টের সকলেই তখন সবিশেষ জানিবার জন্য উৎসুক। ম্যাজিস্ট্রেট কহিলেন 'বল, বল, তুমি যাহা কিছু জানিয়াছ সমস্তই খুলিয়া বল।' তখন বালিকা অশ্রুপূর্ণ নয়নে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল।

'পূর্বে কহিয়াছি লাক্ আমাদিগের কথা শুনিয়া চলিয়া গেল এবং জাহাজঘাটের নিকটবর্তী ষ্ট্রীটে একটা বাড়িতে প্রবেশ করিল। সে ঐ

বাড়ীর একটা ঘরে ঢুকিয়া দেখিল একটি স্ত্রীলোক তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছে। স্ত্রীলোকটির নাম ক্যাথেরিন। ক্যাথেরিন কহিল, 'কেমন লাক্ উহার পেটের কথা পাইয়াছ ?' লাক্ কহিল, 'হাঁ পাইয়াছি এবং পাইয়া প্রকৃতই একটু ভীত হইয়াছি।' ক্যাথেরিন কহিল 'তবে আর বিলম্ব করিতে নাই ; যেরূপে পার উহাকে আজই শেষ কর। নতুবা সকল কথা বাহির হইয়া পড়িবে।' লাক্ কহিল, 'না, না, তা আমি পারিব না, কোন মতেই না। মাইকেল আমার কি অপকার করিয়াছে ? পনর বৎসর অতীত হইল এই বেচারা তোমার দুয়ারে পড়িয়া ঘুমাইতেছিল। সেই সময় আমি তোমার প্ররোচনায় উহার চক্ষু দুইটি পোড়াইয়া দিয়া যারপরনাই পাতকের কার্য করিয়াছি। এখন আবার হত্যা ! ইহা নিশ্চয়ই আমার দ্বারা হইবে না। আমার দ্বারা নহে।'

সেই নিরাশ্রয়া বালিকা কহিয়া যাইতেছে আর কোর্টের সমস্ত লোক উহার প্রত্যেক কথার প্রত্যেক অক্ষরটি পর্যন্ত শুনিবার জন্য গলা বাড়াইয়া কান পাতিয়া শুনিতেছে। কোর্টে অসংখ্য লোক, কিন্তু সকলে চিত্রার্পিতবৎ নিস্পন্দ ও নীরব। ম্যাজিস্ট্রেট কহিলেন, 'এইরূপ কথোপ-কথনের পর কি হইল ?'

বালিকা কহিল 'এরূপ কথাবার্তা হইবার খানিক পরেই আমরা ঐ ক্যাথেরিনের বাড়িতে ভিক্ষা করিতে গেলাম। ক্যাথেরিন একটা প্লেট আনিয়া আমার ঝুলিতে ভরিয়া রাখিল এবং তাহার প্লেট চুরি গিয়াছে বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিল। ক্যাথেরিন তারপর নিজেই একটা তীক্ষ্ণ ছুরি লইয়া পয়ঃপ্রণালীর কাছে যাইয়া লুকাইয়া রহিল। অবশেষে আমি পুলিশ কর্তৃক ধৃত হইবার পরে ক্যাথেরিন ছুরির আঘাতে মাই-কেলকে মারিয়া ফেলিল।'

ম্যাজিস্ট্রেট কহিলেন, 'তুমি এত তত্ত্ব জান, তবে বাছা তোমার ঝুলিতে প্লেটখানা রাখিলে কেন ? আর এ বিষয়ে কোন সংবাদই বা পূর্বে প্রচার করিলে না কি জন্য ?'

বালিকা কহিল, 'আপনার ত মহাশয় সবই ভুল হইতেছে। আমি সে সময়ে ইহার কিছুই জানিতাম না। মাইকেল কল্য রাত্রিতে আমাকে এই সমস্ত যেন দেখাইয়া দিয়া ভাল করিয়া বুঝাইয়া গিয়াছেন।'

ম্যাজিস্ট্রেট কহিলেন, 'আচ্ছা সে কথা পরে হইবে। কিন্তু ক্যাথেরিন এ দুষ্কর্ম করিল কেন ? মাইকেল তাহার কে ?'

বালিকা মাথা হেঁট করিয়া কহিল, 'ক্যাথেরিন মাইকেলের স্ত্রী। সে মাইকেলকে পরিত্যাগ করিয়া আর-এক পুরুষের আশ্রয়গ্রহণে অভিলাষিণী হয় এবং ওদেসায় পলাইয়া আসিয়া লাকের সহিত গৃহবাস করে। মাইকেলও তাহার অনুসন্ধানে ওদেসায় চলিয়া আইসেন। ক্যাথেরিন মাইকেলকে দেখিতে পাইয়া লুক্কায়িত ভাবে নিজের বাড়ীতে প্রবেশ করে। মাইকেল তাহাকে দেখিতে পান এবং ক্যাথেরিন তাঁহাকে দেখে নাই এই মনে করিয়া তাহার গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণের নিমিত্ত তাহার দুয়ারে লুকাইয়া থাকেন। কিন্তু হঠাৎ তাঁর ঘুম আইসে। তাঁহাকে নিদ্রায় অচৈতন্য অবস্থায় পাইয়া লাকু তাঁহার চক্ষু দুটি দগ্ধশলাকার দ্বারা পোড়াইয়া দেয় এবং তাঁহাকে দূরবর্তীস্থানে রাখিয়া আইসে।'

ম্যাজিস্ট্রেট কহিলেন, 'মাইকেল কি সত্য সত্য এই সমস্ত তোমাকে বলিয়াছে ?'

বালিকা কহিল, 'হাঁ তিনিই বলিয়াছেন। তিনি কারাগৃহে আগেও আমাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। কল্য রাত্রিতেও আমাকে দেখা দিয়াছিলেন। দেখিলাম তিনি বড় কাতর। মুখ পিঙ্গল বর্ণ, সমস্ত শরীর রক্তে মাখা। তিনি আমাকে হাতে ধরিয়া তুলিয়া তাঁহার শরীরের সমস্ত আঘাত চিহ্ন আঙুল দিয়া দেখাইয়াছেন ; এবং তাঁহার সমস্ত দুঃখের কথা বুঝাইয়া কহিয়াছেন।'

ইহার পর লাকু আর ক্যাথেরিন ধৃত হইল। ম্যাজিস্ট্রেটের মন একবারে নিঃসংশয় নহে। কিন্তু তাঁহার এইক্ষণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্তি জন্মিল। অনুসন্ধানে প্রকাশ পাইল খারসান নামক স্থানে প্রকৃতই ক্যাথেরিনের সহিত মাইকেলের বিবাহ হইয়াছিল এবং ক্যাথেরিন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া কোন একদিকে পলাইয়া গিয়াছিল।

ক্যাথেরিন আর তাহার প্রাণের সাথী অথবা পাপের সাথী প্রথমে অপরাধ স্বীকার করিতে চাহিল না। কিন্তু পোলেস্কা যখন তাহাদিগের চক্ষের দিকে চাহিয়া চাক্ষুষদর্শনের মত দৃঢ়তার সহিত একে একে সমস্ত ঘটনার আনুপূর্বিক সকল কথা কহিয়া কাঁদিতে লাগিল তখন কিবা লাকু, কিবা ক্যাথেরিন, কাহারও মুখে আর কথা সরিল না। উভয়েই তখন আত্মদুষ্কৃতি স্বীকার করিতে বাধ্য হইল ; এবং বিচারক ও দর্শক সকলের প্রাণেই একটা অভাবনীয় বিস্ময় জন্মিল। ওদেসার বিচার-গৃহে তখন লোকে লোকারণ্য। সমস্ত লোকই মাইকেলের অতীত জীবন এবং আত্মিক

পুরুষের সাক্ষ্য প্রসঙ্গে নানা কথা কহিয়া ভয়ে ও ভক্তিতে ভগবানের নাম লইল। যাহারা ধার্মিক তাহারা ঊর্ধ্বনেত্র হইয়া অঙ্গুলি নির্দেশ সহকারে একে অন্যকে উপরের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে কহিল। সকলেই বুঝিল যে কিবা অদ্য কিবা কল্য জগদীশ্বরের এই অনন্ত ধর্মরাজ্যে পরিণামে ধর্মেরই জয়।

অষ্টম অধ্যায়

উপক্রম

মহাকবি মিল্‌টন কহিয়াছেন—

Millions of spiritual beings
walk the earth
Unseen, while we wake
and when we sleep.

অর্থাৎ

অসংখ্য আত্মিক সদা অলক্ষিত রূপে
বিচরে অবনীধামে, যখন আমরা
জাগরিত রহি, কিংবা রহি নিদ্রাগত।

মহাকবির এই মহাবাক্য এত কাল বাল্মীকি ও ব্যাসের সর্বজনবিদিত সাক্ষ্যের ন্যায় কল্পনার কথা মাত্র বলিয়া উপেক্ষিত ছিল। এইক্ষণ তত্ত্ব জিজ্ঞাসুদিগের মধ্যে শত সহস্র ব্যক্তি ইহা বিজ্ঞানের কঠোর পরীক্ষায় বিশেষ রূপে জানিতে পাইয়াছেন যে যাঁহারা দেহত্যাগ করিয়া দ্রষ্টব্যে চলিয়া গিয়াছেন তাঁহারা মরিয়া যান নাই অথবা আকাশে মিলিয়া যান নাই। তাঁহাদিগের সহিত সকলেরই আবার সর্বজনসমক্ষে সাক্ষাৎকার ঘটিবে; এবং কেহ তাঁহাদিগের আশীর্বাদে কৃতার্থ কেহ বা তাঁহাদিগের অভিসম্পাতে ক্লিষ্ট হইয়া আত্মজীবনের অতীত কাহিনী স্মরণ করিতে বাধ্য হইবে। তাঁহারা এইক্ষণ আত্মিক তনু ধারণ করিয়া নিজ নিজ কর্মফল নিয়মিত সুখদুঃখ ভোগ করিতেছেন; এবং তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে, আত্মকৃত অথবা অন্যদীয় কর্মের আকর্ষণে, কখনও বা উচ্চতর ভাবের অনুশাসনে পৃথিবীতে আসিয়া মনুষ্যের সংবাদ লইতেছেন। বস্তুতঃ তাহারা জড়জগতে যে প্রকার জীবিত ছিলেন অধ্যাত্মজগতে যাইয়াও ঠিক সেই আকৃতি সেই প্রকৃতি সেই আকাঙ্ক্ষা ও সেই অভিজ্ঞতা লইয়া সেই প্রকারই জীবিত আছেন; এবং সেখানে শরীর ও মনে উচ্চতর শক্তির বিকাশ হয় বলিয়া জীবহৃদয়ের উপর কার্য করিবার জন্য অধিকতর সুবিধা পাইতেছেন।

মা, আপনার দুধের শিশুকে পরিত্যাগ করিয়া ঊর্ধ্বধামে যাইতে বাধ্য হইয়াছেন। তিনি সে শিশুর সুকোমল স্নেহময় আকর্ষণ এড়াইতে পারিতেছেন না। তাঁহার প্রাণে তাহা দেয় না এবং দেবধামের অধ্যক্ষেরাও তাহা ইচ্ছা করেন না। তিনি তাই প্রতিনিয়ত পৃথিবীতে আসিয়া আপনার প্রাণধনকে অলক্ষিতভাবে সান্ত্বনা দান করেন; এবং কখনও বা তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া আপনার উপস্থিতির পরিচয় দেন। মায়ের সাংসারিক জীবনের একমাত্র সম্বল উপযুক্ত পুত্র অকস্মাৎ উৎকট রোগে অভিভূত হইয়া অকালে পৃথিবীর বন্ধন ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছেন। তিনিও তাঁহার শোকাতুরা মাতাকে ক্ষণকালের তরে ভুলিতেছেন না। তিনি এই হেতু দয়াময়ের শক্তিসঞ্চালিত দেবপুরুষদিগের দয়ার বিধানে মধ্যে মধ্যেই পৃথিবীতে আসিয়া থাকেন এবং মায়ের উপকারের জন্য পরের হৃদয়ের উপর কার্য করিতে যত্নপর হন।

এইরূপে দৃষ্ট হইবে যে যাঁহারা পরলোকের অধিবাসী হইয়াছেন তাঁহারা পৃথিবীর সহিত যে যত বেশী জড়িত, পৃথিবীতে যাতায়াত করিবার জন্যও তাঁহার হৃদয় তত বেশী লালায়িত। কিন্তু এ সকল আকর্ষণ ছাড়া আর একপ্রকার আকর্ষণ আছে। তাহা অতি ভয়ানক ও ক্লেশকর। কেহ কোনস্থানে অতি গোপনে পরের প্রাণে আঘাত করিয়া আপনার স্বার্থ উদ্ধার করিয়াছে। সেই ক্ষণস্থায়ী স্বার্থ এইক্ষণ কালের অতল সমুদ্রে ডুবিয়া গিয়া থাকিলেও তাহার পাপের স্মৃতি এবং স্মৃতির আকর্ষণ তাহাকে পরিত্যাগ করিতেছে না। সে যেখানে অন্ধকারে অন্যের বুকে ছুরি মারিয়াছিল তাহার আত্মা বহুকাল পর্যন্ত সেখানেই নিগড়নিবদ্ধের ন্যায় অবস্থিত রহিতেছে; এবং সেখানে যেন নির্জন কারাভবনে কর্ম-জনিত অনুতাপের আগুনে দগ্ধ হইয়া ধীরে ধীরে প্রায়শ্চিত্ত সাধন করিতেছে। কেহ বা আপনি যে গর্হিত পাতকে নির্লিপ্ত হইয়াও প্রতি-হিংসার প্রবল আকর্ষণে তাদৃশ পাপস্থলে উপস্থিত হইতেছেন এবং সেখানে মাঝে মাঝে মনুষ্যকে ছায়ামূর্তিতে দর্শন দান করিয়া প্রাণের অতৃপ্ত ক্রোধ ও অন্তর্দাহি জ্বালা নির্বাণ করিতে প্রয়াস পাইতেছেন।

এই শেষোক্ত প্রকার ছায়ামূর্তি সম্বন্ধে তাত্ত্বিকদিগের মধ্যে একটু মতভেদ আছে। আমাদিগের পাঠকবর্গ অবশ্যই থিয়োসোফিস্ট (Theosophist) অর্থাৎ দিব্যতাত্ত্বিক সম্প্রদায়ের নাম শুনিয়াছেন। থিয়োসো-ফিস্টেরা জড়বাদী নহেন। তাঁহারাও অধ্যাত্মবাদীর ন্যায় জড়দেহমুক্ত

জীবাত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করেন ; এবং মনুষ্য মৃত্যুর পর অধ্যাত্ম জগতে অবস্থান করিয়া স্বকৃত কর্মের দণ্ড-পুরস্কার ভোগ করে, একথা পরীক্ষালব্ধ সত্য বলিয়া প্রচার করিয়া থাকেন। কিন্তু মনুষ্য এখানে সেখানে ছায়ামূর্তির মত যাহা দেখিতে পায় তাহার প্রকৃত সারবত্তা ও বাস্তবতা সম্বন্ধে তাঁহাদিগের বিশেষ সন্দেহ আছে।

উল্লিখিত সম্প্রদায়ের আধুনিক উপদেষ্ট্রী বাগ্মীকুলভূষণা আনি বিসান্ত (Annie Besant) বলেন যে মনুষ্য পৃথিবীতে যে সকল ছায়া-মূর্তি (apparition) দেখিয়া চমকিয়া উঠে তাহা প্রধানতঃ Revelations in astral light অর্থাৎ আত্মিক মূর্তির আকাশিক প্রতিবিম্ব।* ইহার এই নিগূঢ় অর্থ যে নিহত ব্যক্তি স্বয়ং তাহার হত্যাস্থলে বদ্ধ রহে না। কিন্তু তাহার আত্মা অধ্যাত্মজগতের কোন বিশেষ স্থানে থাকিয়া নিরন্তর যে সেই শোকাবহ হত্যার ঘটনা চিন্তা করে তাহাতেই তদীয় চিন্তাময় মূর্তি সময়ে সময়ে চক্ষুর সম্মুখীন হইয়া মনুষ্যের ভয় কিংবা বিস্ময় জন্মায়। থিয়োসোফিস্ট সম্প্রদায়ের মত অনুসারে তাদৃশ মূর্তির নাম thought body অর্থাৎ চিন্তাত্মিকা তনু। সে মূর্তি কিংবা সে তনুর চক্ষু আছে কিন্তু চক্ষে দৃষ্টি নাই ; কর্ণ আছে, কর্ণেও কোন প্রকার শ্রুতি শক্তি নাই।

এইরূপ নির্জীব মূর্তির কথা আরও অনেকে বলিয়াছেন। ড্রেসডেন নগরনিবাসী বিখ্যাত পণ্ডিত প্রফেসর ডমার (Professor Daumer) বলেন যে, মনুষ্যের আত্মা যখন দেহের বন্ধন হইতে মুক্ত হয়, তখন সে দূর স্থানে থাকিয়াও নানা প্রকার মনঃকল্পিত মূর্তি দেখাইতে পারে। তাঁহার মতে এই শ্রেণীর প্রদর্শিত মূর্তির নাম আইডোলন (Eidolon) অর্থাৎ আভাসিকা।†

অধ্যাত্মবাদী অর্থাৎ Spiritualist নামে অভিহিত দার্শনিকেরা এবং

* 'This kind of (unconscious) apparition was nothing more than what Theosophy described as a picture or revelation in the astral light. The modus operandi was this. There was an intense thought in the mind of some person. That thought was a real energy, a real force quite as real as electricity.' Lecture at Milton Hall, Hawley-Crescent, Kentish Town.

† 'These apparitions are neither bodies nor souls.'

ভারতীয় ঋষিরাও এবংবিধ অন্তঃসারশূন্য আভাসিত মূর্তির অস্তিত্ব অস্বীকার করেন না ; এবং নিহত ব্যক্তি নিয়তই তাহার হত্যার স্থলে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে এমনও তাঁহারা বলেন না। কিন্তু যেখানে মূর্তি মুখ বাঁকাইয়া ও সজীব চক্ষে তাকাইয়া কথা কহে, অথবা কথা না কহিয়াও হাত বাড়াইয়া স্থানবিশেষের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে ; কিংবা নিয়মিত প্রণালীতে নির্দিষ্ট সময়ে নানা ব্যক্তিকে দেখা দিয়া প্রতিহিংসার পরিতর্পণ ও প্রাণের জ্বালা নির্বাপণ করিতে চেষ্টা পায়, সেখানে আর শুধু প্রতিবিম্ব কল্পনার স্থল থাকে কোথায় ? আমরা আজি পাঠকের নিকট যে মূর্তির কাহিনী লইয়া উপস্থিত হইতেছি উহা নীরব হইলেও নিষ্পন্দ কিংবা নিষ্ক্রিয় নহে। উহা নির্জীব না সজীব পাঠক নিজে তাহার বিচার করিবেন।

এই প্রবন্ধে প্রতিহিংসার বাসনাকেও একটা প্রবল পার্থিব আকর্ষণ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু অধ্যাত্মবাদীদিগের মতে প্রতিহিংসা অতি বড় গর্হিত মহাপাতক। যাহারা পরের রোষে কিংবা পরের দোষে প্রাণে নষ্ট হইয়া সংসারের সকল সুখে জলাঞ্জলি দেয় এবং পরিশেষে প্রতিহিংসার আশ্রয় লইয়া পৃথিবীতে ছায়ামূর্তির ন্যায় বিচরণ করে তাহারা প্রকৃতই হতভাগ্য জীব। তাহাদিগের কর্মের গতি মানবজগতে এক এক সময় কি প্রকার লোভ ভয়ঙ্কর পরিণতি প্রাপ্ত হয় আজিকার কাহিনীটি তাহারই একটি প্রামাণিক ইতিবৃত্ত। কিন্তু প্রতিহিংসা দূষ্য ও গর্হিত হইলেও তাহা হইতে শত সহস্রগুণ অধিকতর দূষ্য ও অধিকতর গর্হিত প্রতিহিংসার প্রবর্তক প্রাথমিক পাপ। যাহারা সুখসুপ্ত ব্যক্তির সর্বনাশ করিয়া তাহার প্রাণে প্রতিহিংসার প্রবল বহ্নি জ্বালিয়া দেয় তাহাদিগের মত দুষ্কৃত হতভাগ্যের ছায়া-দর্শনও মনুষ্যের বিপজ্জনক।

আত্মিক-কাহিনী

[ঈর্ষার আগুন ও আশার শেষ]

ইংলণ্ডের উত্তর প্রদেশে ডারবিশায়র। চেষ্টারফিল্ড ডারবিশায়রের একটি সমৃদ্ধ নগর। চেষ্টারফিল্ড হইতে ছয় মাইল দূরে 'হার্ডউইক হল' (Hardwick Hall)—অর্থাৎ হার্ডউইক বংশীয় ভূস্বামীদিগের বাস-

ভবন। 'হার্ডউইক হল' অতি পুরাতন ও প্রসিদ্ধ প্রাসাদ। ১৫৮৪ খৃষ্ট অব্দে ডিবনশায়রের ডিউক কর্তৃক আমোদময় এলিজাবেথীয় যুগের উৎকৃষ্ট আদর্শ অনুসারে এই অট্টালিকা গঠিত হয়। হার্ডউইক হলের অধিস্বামী ইংলণ্ডের অন্যতম প্রধান ব্যারনেট সুতরাং পুরুষানুক্রমিক সার্ উপাধি-বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত লোক। উহার চতুঃপার্শ্বস্থিত বিস্তৃত ভূভাগ তাঁহারই সম্পত্তি।

হার্ডউইক হলের চারিদিকে কিয়দ্দূরে পর্যন্ত ঘন সন্নিবিষ্ট বিশাল বন। বহুবিস্তৃত ও তরঙ্গায়িত শ্যামল বনভূমির মধ্যস্থলে সুনীল সাগরবক্ষে স্বর্ণকান্তি মৈনাকের ন্যায় উন্নতশীর্ষ উপাদেয় কারুকার্য খচিত সুবৃহৎ হার্ডউইক হল। যুগযুগান্তদর্শী দেবদারু ও অন্যবিধ অতি পুরাতন প্রকাণ্ড তরুরাজি জড় প্রকৃতির কঠোর সংগ্রামে জয়লাভ করিয়া হার্ডউইক হলের প্রাচীনত্ব বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়াছিল। হার্ডউইক হল এক সময়ে উত্তর ইংলণ্ডে প্রকৃতই একটি দর্শনীয় সামগ্রী এবং শোভা ও সম্পদের উজ্জ্বল চিহ্নস্বরূপ দণ্ডায়মান ছিল।

ইংলণ্ড যখন আত্মদ্রোহে বিধ্বস্ত ও বিড়ম্বিত, যখন ক্রমওয়েল ইংলণ্ডে জনসাধারণের অদ্বিতীয় নায়করূপে সর্বত্র সম্পূজিত; সেই সময়ে সেই লোকভয়ঙ্কর হলহলার দিনে কাননবেষ্টিত হার্ডউইক হলের নিভৃত কক্ষে ইংলণ্ডীয় ইতিহাসের এক স্মরণীয় অঙ্ক অভিনীত হয়। ইংলণ্ডের বিপ্লব-বিপন্ন হতভাগ্য নৃপতি প্রথম চার্লস (Charles the First) সিংহাসনের আশ্রয় হারাইয়া কিছুদিন হার্ডউইক হলের আশ্রয়ে আত্মরক্ষা করেন। হার্ডউইকের তদানীন্তন অধিস্বামী আপনার ক্লেশার্জিত অর্থরাশি, হৃদয়ের শোণিত এবং হৃদয়ের প্রগাঢ় স্নেহপুষ্ট ও স্নেহ সংবর্ধিত প্রিয়তম জ্যেষ্ঠ পুত্রের জীবনটি পর্যন্ত উৎসর্গ করিয়া সমরক্ষেত্রে চার্লসের সাহায্য করিয়াছিলেন।

এই ব্যাপারে হার্ডউইক হলের অধিপতি অত্যধিক ঋণগ্রস্ত হন। এমন কি, গৃহসামগ্রী বিক্রয় করিয়া এবং স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়াও তিনি প্রয়োজনীয় অর্থের সংকুলন করিতে সমর্থ হন নাই। কাল-মাহাত্ম্যে রাজভক্ত ভূস্বামীর এইরূপ প্রাণস্পর্শিনী অকৃত্রিম রাজভক্তিও রাজদণ্ডার্হ গুরুতর অপরাধে পরিণতি পাইল। রাজপক্ষ-সমর্থনে অস্ত্রধারণহেতু ক্রমওয়েলের পার্লিয়ামেণ্ট সভার বিচারে তিনি প্রভূত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত ও একবারে সর্বস্বান্ত হইয়া পড়িলেন। অবশেষে হার্ডউইকের এইরূপ

সমৃদ্ধ ভূস্বামী, অভাবের নিপীড়নে অবসন্ন হইয়া, উদরান্নের জন্যও অন্যদীয় আশ্রয় প্রার্থনা করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু তথাপি তাঁহার সঙ্কল্পভঙ্গ হইল না। তিনি তাঁহার প্রাণপ্রিয় পুণ্যব্রত হইতে একপদও স্খলিত হইলেন না। এই ঘটনাচক্রের শেষ অঙ্কে ইংলণ্ড যখন রাজরক্তে কলঙ্কিত হইল, তখনও দারিদ্র্য নিপীড়িত হার্ডউইক নির্বাসিত ও নিরাশ্রিত রাজকুমার দ্বিতীয় চার্লসের দিকে তাকাইয়া, বজ্রের ন্যায় অটল রহিলেন।

মানুষের আপদ বিপদ চিরস্থায়ী নহে। ইংলণ্ডে আবার রাজভক্তির নূতন জোয়ার বহিল, রাজশক্তির নূতন পতাকা উড়িল ; সুখ-শান্তির সুদিন ফিরিয়া আসিল। কঠোরকর্মা ক্রমওয়েলের সেই বীর বিক্রমের কথা অতীত স্মৃতির কুক্ষিস্থ হওয়ার কিছুকাল পরেই, দ্বিতীয় চার্লস্ পুনরায় ইংলণ্ডের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে হার্ডউইকের ভাগ্যপটেও পরিবর্তন ঘটিল। হার্ডউইকের শোভা ও সম্পদ সামর্থ্যে, অচিরেই আবার চেস্টারফিল্ডের ঐ অঞ্চল সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

ইহাই হার্ডউইক হলের অতি পুরাতন ও সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত। যাঁহারা ইংলণ্ডের ইতিহাস লইয়া আলোচনা করিতে ভালবাসেন, তাঁহারা সহজেই এইক্ষণ স্থানটার সবিশেষ পরিচয় পাইবেন। উল্লিখিত ঐতিহাসিক যুগের বহুকাল পরে, অর্থাৎ অধুনাতন ইতিহাসের যে সময়ে আমাদিগের এই ছায়া-দর্শন কাহিনীর সূচনামাত্র সংঘটিত হয়, সে সময়ে হার্ডউইকের সমস্ত বিপদ কাটিয়া গিয়াছে। হার্ডউইক হল তখন পূর্ণগৌরবে গৌরবান্বিত। তখন একটি হৃষ্টদেহ বলিষ্ঠ যুবক হার্ডউইক হলের লর্ড বা অধিস্বামী। যুবকের নাম সার্ রাল্ফ হার্ডউইক (Sir Ralph Hardwick)। সার্ রাল্ফ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তীর্ণ ছাত্র। ইয়োরোপ ও আমেরিকায় রাজরাজেশ্বর ও ধনকুবেরগণও বিদ্যাশিক্ষা না করিলে ভদ্রলোকের মধ্যে বসিবার স্থান পান না। তাই রাল্ফ রীতিমতো শিক্ষিত এবং তাঁহার অমল স্বভাবে সম্পদ-সম্ভ্রমের সহিত জ্ঞানগৌরবও আশাতীতরূপে সম্মিলিত। কিন্তু এত গুণ সত্ত্বেও সার্ রাল্ফ হার্ডউইক সমৃদ্ধ সম্প্রদায়ের দুই একটি চিরপরিচিত দোষের সংস্পর্শ হইতে সর্বাংশে মুক্তিলাভ করিতে পারেন নাই। তিনি একদিকে যেমন বংশগত গুণাবলীর উপযুক্ত উত্তরাধিকারী, অন্যদিকে আবার বংশানুক্রমিক দোষ সমূহেরও তেমনই আধার স্বরূপ ছিলেন।

ভোজনে তাঁহার প্রতিনিয়তই অতি দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হইত।

তাঁহার প্রখর জঠরানল কোনদিনও অল্প আহুতিতে তৃপ্তিলাভ করিত না। পানেও তাহার ভীষ্মের পিপাসা, ভৃঙ্গারের প্রমত্ত ধারায়ও উহা নির্বাপিত হইতে চাহিত না। সার্ রাল্ফ পিতা পিতামহের ন্যায় মৃগয়ামত্ত, অসমসাহস, অব্যর্থসন্ধান, অথচ দৃক্পাতশূন্য। তিনি অশ্ব-বিলাসেও এক প্রকার উম্মাদগ্রস্ত। তাঁহার অশ্বগৃহ অসংখ্য বাজিরাজিতে সর্বদা সুসজ্জিত থাকিত। নিউমার্কেট ও ইপসমের ঘোড়দৌড়ে সার্ রাল্ফের জয় পরাজয়েই দর্শকের চক্ষু সমধিক আকৃষ্ট হইত। হার্ডউইকের বিশাল অরণ্যানীরক্ষিত শিকারসমূহ এবং তাঁহার দ্রংষ্টাকরাল ব্যাঘ্রবিক্রম ও নির্ভীক শিকারী কুক্কুরের দল সর্বত্র প্রসিদ্ধ ছিল। পক্ষান্তরে, অভ্যাগত অতিথির জন্য হার্ডউইক হল সকলই সময়েই অবারিতদ্বার। অতিথিবৎসল সার্ রাল্ফ মুক্তহস্তে ও মুক্তপ্রাণে অতিথিসৎকার করিতেন এবং অতিথিদের মধ্যে যাহারা অতি দীন-দুঃখী, তিনি তাহাদিগকেও অন্তরের সহিত সম্মান করিতে ভালবাসিতেন। দোষ ও গুণের এইরূপ সংমিশ্রণে, প্রতাপ প্রতিপত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত ও সম্পদ সমৃদ্ধিতে অতুলনীয় হার্ডউইক হল নানাবিধ অভ্যাগতের নিত্য সমাগমে উৎসব বাটিকার ন্যায় অষ্টপ্রহর উৎসবময় থাকিত এবং সার্ রাল্ফ হার্ডউইকের নাম ও যশ দেশের সর্বত্রই কীর্তিত হইত।

সার্ রাল্ফ দার পরিগ্রহ করিয়াছেন। তিনি যখন বিবাহ করেন, তখন তাঁহার বয়ঃক্রম প্রায় ত্রিংশৎ বৎসর। তদীয় পুত্রবৎসলা জননী তখনও জীবিতা আছেন। রাল্ফের নবোঢ়া রমণী যেমন রূপসী, তেমনই নানা গুণে গুণবতী। হার্ডউইকের হর্ম্যশোভা নবীনা গৃহস্বামিনীর চারিত্র-সৌন্দর্যে দ্বিগুণ সংবর্ধিত হইয়া উঠিল। জননী সুন্দরী ও সর্বাংশে সুশীলা পুত্রবধূ দর্শনে কৃতার্থ হইলেন। ঈদৃশ পত্নী লাভে, ভাগ্যবান সার্ রাল্ফ আপনাকে সৌভাগ্যশালী মনে করিলেন।

যথাসময়ে সার্ রাল্ফের একটি পুত্রসন্তান জন্মিল। চিরন্তন রীতি অনুসারে এই পুত্রই হার্ডউইকের ভাবী প্রভু। সমগ্র হার্ডউইক স্টেট উচ্ছ্বসিত প্রাণে নবজাত প্রভুতনয়ের সংবর্ধনা করিল। পিতৃকুল ও মাতৃকুলের পরিচয়ে শিশুর নাম রাখা হইল রালফ এস্সিটন হার্ডউইক (Ralph Assheton Hardwick)। সার্ রাল্ফ পুত্রলাভে সুখী। হার্ডউইক হল আমোদে উৎফুল্ল। আমোদ ও আনন্দে তিনটি বৎসর কাটিয়া গেল! লেডী রাল্ফ পুনরায় সন্তানবতী হইলেন। এবার একটি

কন্যা জন্মিল। কিন্তু স্বামীসোহাগিনীর সুকুমার দেহ কঠোর প্রসব-যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিল না, হার্ডউইকের গৃহলক্ষ্মী, হায়, বুঝি চিরকালের তরে অকালে ইহলোক হইতে অন্তর্ধান করিলেন। দুগ্ধপোষ্য শিশু এস্‌সিটন এক প্রকার অনাথ ও হার্ডউইক হল অন্ধকার হইল। অকস্মাৎ সার্ রাল্‌ফের বুকে শত বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়িল। মাতৃহীন শিশুর এখন পিতাই একমাত্র স্নেহের আশ্রয় ও জীবনের অবলম্ব। সার্ রাল্‌ফ এক হাতে অশ্রু সংবরণ করিলেন, আর এক হাতে মাতৃহীন শিশুকে বুকে আবরিয়া লইলেন।

অনেকদিন হইল বৃদ্ধ পিতা স্বর্গগত হইয়াছেন। জননী জীবিতা ছিলেন। তিনিও যেন স্নেহময়ী পুত্রবধূর সঙ্গে সঙ্গে পরলোকবাসিনী হইলেন। শোকাতুর সার্ রাল্‌ফ বস্তুতই চক্ষে অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার সে রমণীয় প্রাসাদ এখন শূন্য শ্মশান; প্রাণ, মন ও হৃদয় সমস্তই যেন শূন্যময়। বিস্তৃত ভূসম্পত্তি, সুবিস্তৃত গৃহ, প্রাঙ্গণ ও প্রাবরণ-বনভূমি, অনুগত সেবক, আজ্ঞাবাহী পরিচারক ও আশ্রিত পরিজন কিছুরই অভাব নাই। লোক আসিতেছে, লোক আদৃত হইয়া চলিয়া যাইতেছে। অভ্যাগত ও অতিথির সৎকার ও অভ্যর্থনায় হার্ডউইক হল অহোরাত্র উৎসবগৃহের ন্যায় সজ্জিত ও মুখরিত হইতেছে। কিন্তু সার্ রাল্‌ফ তথাপি আপনাতে আপনি একাকী ও অসহায়, এবং তাঁহার পক্ষে সমস্তই যেন নীরব নিস্পন্দ ও নির্জীব। ক্রমে এই অবস্থা অসহনীয় হইয়া উঠিল। তিনি আত্মীয় স্বজনের অনুরোধে পুনরায় দার পরিগ্রহে কৃত সংকল্প হইলেন। বিবাহার্থিনীদিগের মধ্যে তাঁহার আকাঙ্ক্ষার অনুরূপা রমণী কোথায়? তিনি যে দেবস্বভাবা অবলাকে অকালে সমাধির গ্রাসে বিসর্জন দিয়াছেন, তাঁহার অদৃষ্টে আবার তাদৃশ জন ঘটিবে কি?

সার্ জারভেজ মুর (Sir Gervase Moore) হার্ডউইক হলের সন্নিহিত প্রতিবেশী। সার্ জারভেজ মুর সদ্বংশজাত ভদ্রলোক, সম্ভ্রান্ত নাইট্, অথচ নিঃস্ব। তাঁহার অবস্থা যে এক সময়ে খুবই সচ্ছল ছিল 'নাইট' উপাধিই উহার পরিচয়। তাঁহার গৃহটিও একদিন ধনীর বিলাস প্রাসাদের ন্যায় উজ্জ্বল মূর্তিতে দণ্ডায়মান রহিয়া, হার্ডউইক হলের অতিথিদিগেরও নয়ন আকর্ষণে সমর্থ ছিল। কিন্তু এক্ষণ উহা ছাড়া-বাড়ীর মত অযত্নরক্ষিত ভগ্নদশাগ্রস্ত ও যেন বিষাদমলিন।

সার জারভেজ মুর অপরিণামদর্শী ও অমিত্যব্যয়ী। তিনি একটু অধিক বয়সে এক রমণীর সহিত বিবাহসূত্রে সম্বন্ধ হন। পত্নী যৌতুক-স্বরূপ বিস্তর সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মুরেরও পৈতৃক সম্পত্তি প্রচুর ছিল। কিন্তু তথাপি তাঁহারা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই দারিদ্র্যদশাগ্রস্ত হইয়া নানা প্রকারে বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। মুর নিজে অপব্যয়ী, পত্নী ততোধিক উচ্ছৃঙ্খল। পত্নী, যেন পতির সহিত স্পর্ধা করিয়াই ব্যয়ের নিত্যনূতন প্রকার উদ্ভাবন করিতেন; এবং যে সূত্রে যাহা কিছু সঞ্চিত হইত, তাহাই সুখ লালসার প্রবল ঝটিকায় উড়াইয়া দিতেন। এইরূপে উম্মত্ত অপব্যয়ে কুবেরের ভাণ্ডারও ক্ষয় পায়, ক্ষুদ্রবল মুরের সম্পত্তি আর কত বড় কথা। পতীপত্নীর অনুচিত ব্যবহারে অচিরেই তাঁহাদিগের গৌরবের পসার দুর্গতির গ্রাসে গড়াইয়া পড়িল, মুর পরিবার দুর্দশাগ্রস্ত গ্রাম্যলোক বলিয়া পরিচিত হইলেন।

লেডী মুর এক সময়ে রূপবতী ছিলেন। অনেকদিন হইল জীবনের সে বসন্ত অতীত হইয়া গিয়াছে। স্বার্থই এইক্ষণ তাঁহার একমাত্র উপাস্য দেবতা, কাপট্য তাঁহার অলঙ্কার। তিনি চিরদিনই ক্রুদ্ধস্বভাবা ক্রূরমতি কর্কশপ্রকৃতি; মদগর্বিতা এবং কঠোরবচনা, অর্থে তাঁহার অপরিসীম লোভ, অথচ অর্থের সদ্ব্যবহারে তিনি সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। কোন্ সখের জিনিসটি, কোন্ বিলাসসামগ্রীটুকু, কিরূপে কত অর্থ ব্যয়ে কোথা হইতে সংগ্রহ করা যাইতে পারে, ইহাই তিনি জানিতেন ইহাই বুঝিতেন এবং শুধু ইহাই তিনি বিরলে বসিয়া ভাবিতেন।

মুরের গৃহে একটিমাত্র কন্যা। কন্যার নাম ইথেল মুর (Ethel Moore)। ইথেল যুবতী ও অনূঢ়া। ইথেলের স্ফুরন্ত রূপরাশিই ইদানীং দুঃখতমসাবৃত মুর গৃহের আলোকস্বরূপ। ইথেল মুরের মোহময় রূপের এই এক বিশেষ লক্ষণ যে, উহা আগে দর্শকের চক্ষু তারপর অবস্থাবিশেষে দর্শকের মন ও প্রাণ পর্যন্ত টানিয়া লয়। সে রূপে জ্যোৎস্নার শীতল মাধুরী, জ্যোৎস্নাশীতল নৈশকুসুমের হৃদয়হারিণী আকর্ষণী নাই। উহাতে চক্ষু জুড়ায় না, ঝলসিয়া যায়। কিন্তু সময় বিশেষে ঐ রূপই আবার স্নেহময় সরলতার মূর্তি ধারণ করিয়া যুবতীর মুখশ্রীতে কেমন একটু বিচিত্র রঙ ফলায়।

এই সময়ে যুবতী ইথেল মুর একদিন অকস্মাৎ বনবিহার-সুখভ্রান্ত বিপত্নীক সার রাল্ফের নয়ন-পথবর্তিনী হইল। মোহন চতুরা মুর-তনয়া

যেন প্রথম দৃষ্টিতেই রালফের মনোগত ভাব বুঝিতে পাইয়া, আপনার প্রখর রূপের তীব্র ছটার উপর প্রশান্ত মাধুরীর সেই সাময়িক রঙ ফলাইয়া লইল। রালফ যুবতীর কমনীয়কান্তি তৃষিতনেত্রে নিরীক্ষণ করিলেন; এবং দর্শনমাত্রই রূপসীর চরণপ্রান্তে হৃদয় মন ও প্রাণ বাঁধা দিয়া মন্ত্রমুগ্ধের মত কি ভাবিতে ভাবিতে গৃহে ফিরিয়া গেলেন।

সার্ জারভেজ মুর ও লেডী মুর যাহা কখনও ভাবেন নাই, স্বপ্নেও কখনও কল্পনা করেন নাই, আজি তাঁহাদিগের শুভাদৃষ্টে তাহাই ঘটিল। দুঃখানিপীড়িত মুরের দীন নিকেতনে হার্ডউইকের ন্যায় সম্ভ্রান্ত ও সমৃদ্ধ ব্যক্তি আকৃষ্ট হইলেন ইহা সামান্য সৌভাগ্যের কথা নহে। মুর দম্পতীর প্রাণে আনন্দ আর ধরে না। উচ্চ বংশসম্ভূত ও অমিত ধনস্বামীর উপরে কন্যার এই আকস্মিক আধিপত্য সার্ জারভেজ মুরের নিকট আশাতীত সম্পদ বলিয়া বোধ হইল। তিনি এই সম্বন্ধ সূচনায় আপনাকে বিশেষ গৌরবান্বিত মনে করিলেন; এবং লেডী মুরও রালফের প্রজ্বলিত প্রণয় বহ্নিতে অতি সাবধানে ইন্ধন যোগাইতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য নিরানন্দ হার্ডউইক হল অচিরেই আবার উৎসবময় হইল। সার্ রালফ্ হার্ডউইক কএকটি দিন যাইতে না যাইতেই ইথেল মুরের পাণিগ্রহণ করিলেন। তাঁহার শূন্য গৃহ পূর্ণ হইল। হার্ডউইক হল ফিরিয়া গৃহকর্ত্রী লাভ করিল। কিন্তু মাতৃহীন শিশু এস্‌টিসটন ফিরিয়া মা পাইল কি?

রূপাভিমানিনী ইথেল এক্ষণ লেডী রালফ্ হার্ডউইক রূপে রাজরানীর প্রতাপে হার্ডউইক হলের গৃহস্বামিনী হইয়া বসিলেন। পরিচারক ও পরিজনেরা সকলেই তাঁহার আজ্ঞাধীন। তাঁহার সুদীর্ঘ ও সুপুষ্ট দেহ, সগর্ব দৃষ্টি ও সাড়ম্বর ব্যবহারে সকলেই বিস্মিত ও স্তম্ভিত। তিনি অচিরেই হার্ডউইক হলে প্রদর্শনের একটি উপাদেয় বস্তু অথবা ধনিগৃহের একটি জীবন্ত গৃহসামগ্রীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তাঁহার উদ্ধত ব্যবহারে সার্ রালফের অভিজাত্য অভিমান প্রথমতঃ কিছুকাল কোন কোন সময়ে কিঞ্চিৎ তৃপ্তিলাভ করিত বটে; কিন্তু তাঁহার নিষ্ঠুর দৃষ্টি, নীরস সম্ভাষণ এবং প্রীতিস্পর্শবর্জিত শূন্যগর্ভ আড়ম্বর সার্ রালফেরও শেষে ভাল লাগিত না। রালফের হৃদয়ও ক্রমে শুষ্ক হইয়া উঠিল। প্রণয়ের প্রাণে নিদারুণ আঘাত লাগিল। সার্ রালফ সংসার সুখে উদাসীন; অনুৎসাহ ও অকাল বার্ধক্যে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। তিনি কাঞ্চনজ্ঞানে কাচ ক্রয় করিয়াছেন এবং পুষ্পমালা ভ্রমে কাঠের কণ্ঠী গলায় পরিয়াছেন

ইহা বিবাহের দুদিন পরেই বিলক্ষণ রূপে বুঝিতে পারিয়া প্রাণে নিরাশা ও সমস্ত বিষয়ে উদ্যমবিহীন হইলেন।

লেডী জারভেজ মুরের ন্যায় মাতার গর্ভে ইথেল মুরের মত কন্যার উৎপত্তিই স্বাভাবিক। প্রীতি পবিত্রতা প্রফুল্লতা ও স্নিগ্ধ মৃদুতা প্রভৃতি কমনীয় গুণরাজি সর্বত্র সুলভ না হইলেও এই গুলিই নারীজাতির প্রকৃত সম্পদ ও স্পৃহনীয় আভরণ। কিন্তু মুর-মহিলার ন্যায় জননীর গর্ভে জন্মিয়া এবং তাদৃশ মাতার যত্নে ও তত্ত্বাবধানে শিক্ষালাভ করিয়া তনয়ার এ অংশে ভাগ্যবতী না হওয়া বিস্ময়ের কথা নহে। কন্যা অল্পকালেই স্বার্থপরতা, ক্রূরতা ও দম্ভমাৎসর্য প্রভৃতি মাতৃসম্পদে পূর্ণ অধিকার লাভ করিতে লাগিলেন। কন্যার উর্বর প্রাণে মাতৃপ্রদত্ত উপদেশের এক কণিকাও ব্যর্থ বা নিষ্ফল হয় নাই। ছল চাতুরী কাপট্য ও মনোগতভাব গোপনে কন্যা এতদূর কৃতিত্ব ও নৈপুণ্য লাভ করিলেন যে মাও সময় সময় মেয়ের কাছে হার মানিতে বাধ্য হইলেন। ঈদৃশ সর্পস্বভাবা রমণীর সংসর্গ সরলপ্রাণ ও উদারহৃদয় সার্ রাল্‌ফের হৃদয়ে সুখকর হইবে কেন ?

স্বর্গগতা লেডী হার্ডউইকের পুত্র রালফ এস্‌সিটন এক্ষণ চারি বৎসরের শিশু। ধনি সন্তানেরা এক অংশে বড়ই দুর্ভাগ্য। তাহাদের শিক্ষার পথে সর্বত্রই বহু কণ্টক ও বিবিধ অন্তরায়। অত বড় স্টেটের ভাবী মালিক শিশু হইলেও সোহাগের পুতুল, খোকা হইলেও প্রভু। কিন্তু সার্ রাল্‌ফ এ অংশে বিশেষ সতর্ক ছিলেন বলিয়া বালকের প্রকৃতিতে শৈশববিকারের কোনরূপ মন্দ ফল ফলিতে পারে নাই। অমন প্রতিকূল অবস্থা ও মারাত্মক উপসর্গ সত্বেও শিশু অল্প বয়সে অকালপক্ক প্রভু সাজিবার সুযোগ প্রাপ্ত হয় নাই। বয়োবৃদ্ধি সহকারে এস্‌সিটনের প্রকৃতিতে বিবিধ স্পৃহণীয় গুণের অংকুরউদ্ঘাটন হইতে লাগিল।

এস্‌সিটনের যখন চারি বৎসর মাত্র বয়স তখন নবীনা লেডী হার্ডউইক একটি স্বরূপ পুত্র সন্তান প্রসব করিলেন। সার্ রালফ নবকুমার লাভে প্রীত হইলেন। তিনি ভাবিলেন পত্নীর পাষাণ প্রাণ হয় ত এখন সন্তান বাৎসল্যের মধুর সংস্পর্শে আপনিই স্নেহের উৎসে পরিণত হইবে; এবং তিনিও সেইস্থানে তাঁহার জ্বালাদগ্ধ জীবনের জন্য একটুকু সুখশীতল আশ্রয় পাইয়া কৃতার্থ হইবেন। কিন্তু রালফের এ আশাও নৈরাশ্যের আঁধারে ডুবিল। পত্নী যেমন ছিলেন তেমনই রহিলেন। পাষাণ গলিল না। শুষ্ক কাষ্ঠে ফুল ফুটিল না।

সার্ রালফ হার্ডউইক অতঃপর পত্নীর প্রেমে সম্পূর্ণ হতাশ হইয়া পুত্রদ্বয়ের সুশিক্ষার প্রতি বিশেষরূপে মনোনিবেশ করিলেন। তিনি দেখিলেন তাঁহার দুটি পুত্রই প্রিয়দর্শন ও কান্তিমান্। কিন্তু জ্যেষ্ঠের মুখ মাধুর্যে হার্ডউইক বংশের চিহ্ন যেরূপ সুস্পষ্ট অঙ্কিত দ্বিতীয় পুত্রে তাহা নাই। জ্যেষ্ঠ সর্বাবয়বে হার্ডউইক। কনিষ্ঠ অর্ধ হার্ডউইক অর্ধ মুর। কনিষ্ঠের মুখশ্রীতে মাতৃমূর্তিরই সম্পূর্ণ প্রতিবিম্ব এবং উহার চক্ষের চাহনি ও অধরের হাসিতেও মুরবংশেরই সাদৃশ্য দেখিয়া সার্ রালফ মনে ক্লিষ্ট রহিলেন। হার্ডউইক হলের লোকেরাও তত প্রীতি লাভ করিতে পারিল না। যাহা হউক তথাপি সার্ রালফ পুত্রদ্বয়ে আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিলেন ; এবং ভাই দুটির মধ্যে যাহাতে কোন অংশে কোন রূপে তারতম্য বা পার্থক্য না ঘটে তদনুরূপ ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

বৈমাত্র ভ্রাতৃদ্বয় একসঙ্গে বর্ধিত হইতে লাগিল। উভয়ের একত্র অবস্থান একত্র ভোজন একজাতীয় ও একই রকমের ঘোটকে বিহার ভ্রমণ এবং একই শিক্ষকের উপদেশে শিক্ষা ও শাসন ব্যবস্থাপিত হইল। বসন ভূষণ শয়ন বিচরণ আদর ও আবদার কোন বিষয়ে উভয়ের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য রহিল না।

উভয়ের মধ্যে দ্রষ্টব্যে কোন বিভিন্নতা না থাকিলেও পরিবারস্থ সকলেরই চিত্তে মূলে এক বিষয়ে অতি গুরুতর পার্থক্য। সে পার্থক্য এই যে একজন বিস্তৃত হার্ডউইক সম্পত্তির অদ্বিতীয় ভাবী উত্তরাধিকারী ; আর একজন স্টেটের সহিত সম্পূর্ণ সম্পর্কশূন্য। একজন কিছুদিন পরে রাজার মতো সমৃদ্ধিসম্পন্ন ভূস্বামী হইবেন ; আর একজন ব্যাগ ও ব্যাগেজ বগলে লইয়া পৃথিবীর কোথাও খাটিয়া খাইবেন। এই পার্থক্য সার্ রালফ কোন দিনও ভাবেন নাই অন্যেরা জানিয়াও ইহা লক্ষ্য করে নাই। ইহা প্রথম বুঝিলেন কনিষ্ঠ ভ্রাতার মাতামহী লেডী মুর। শেষে বুঝিতে পাইলেন মাতা মুরতনয়া অর্থাৎ লেডী হার্ডউইক। লেডী মুর একদিন তনয়াকে এমনভাবে এই পার্থক্য বুঝাইয়া দিলেন যে তাঁহার মুখের প্রত্যেকটি শব্দ লেডী হার্ডউইকের হাড়ে হাড়ে যেন গাঁথা হইয়া রহিল। মায়ে ঝিয়ে নিভৃতে অনেকক্ষণ কানাকানি ও অনেক কথা হইল। কি কথা হইল কি যুক্তি বা মন্তব্য অবধারিত হইয়া রহিল কেহ তাহা জানিল না। লোকে এইমাত্র দেখিলও বুঝিল সার্ রালফের নবীনা পত্নী যখন মায়ের মন্ত্রণাস্থল হইতে বাহির হইয়া আসিলেন তখন তাঁহার মুখচ্ছবি যারপরনাই

গম্ভীর অথচ মলিন, চক্ষের দৃষ্টি এমন তীব্র ও ভয়ঙ্কর যে, দেখিলেই চিত্ত চমকিত হইয়া উঠে।

এদিকে রালফ এস্‌সিটন ক্রমে বয়সে বাড়িতে লাগিল, বিমাতাও তাহার প্রতি ক্রমে একটু বেশী বিদ্বেষ ও ঘৃণার চক্ষে দৃষ্টিপাত করিতে আরম্ভ করিলেন। অনলের সৃষ্টি হইল কিন্তু জ্বলিল না ; উহা উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষায় হৃদয়ের নিভৃতকক্ষে প্রধূমিত অবস্থায় রহিয়া গেল। কালক্রমে কুমারদ্বয় কিশোরকাল অতিক্রম করিল। মা তখনও যেন সময়ের প্রতীক্ষায় ধীর স্থির ও প্রশান্তমূর্তি।

কিছুদিন পরে লেডী জারভেজ মুর লোকান্তর বাসিনী হইলেন। সার্ রালফের বৃদ্ধ শ্বশুর সার্ জারভেজ মুরও পারিবারিক সমাধিক্ষেত্রে মহানিদ্রায় শয়ন করিলেন। অন্য এক জারভেজ মুর গৃহের মালিক হইয়া বসিলেন। লেডী রালফ এই সময়ের মধ্যে আরও কএকটি সন্তানের মা হইয়া বর্ষীয়সী মহিলার সম্মান পাইতে লাগিলেন। ভাল ও মন্দ এত ঘটনা ঘটিল এত পরিবর্তন হইল ; কিন্তু তাঁহার প্রাণের আগুন নিবিল কি ? লুক্কায়িত কালসর্পের সে বিষদণ্ড খসিয়া পড়িল কি ?

সার্ রাল্‌ফের সহিত তাঁহার পত্নীর মৌখিক কোনরূপ অসদ্ভাব ছিল না। দুইয়ের প্রণয় ছিল কিনা তাহা বাহিরে কেহ বুঝিত না। পত্নী গম্ভীর মূর্তিতে মুখ ভার করিয়া পতির সম্মুখীন হইতেন ; পতিও সেই গাম্ভীর্য রক্ষা করিয়াই গৃহস্থলীর কার্য ব্যবস্থা করিতেন। সার্ রাল্‌ফের স্নেহ মমতা ভালবাসা ও অনুরাগ সমস্তই ক্রমে পরিবর্ধমান জ্যেষ্ঠ পুত্রে কেন্দ্রীভূত হইয়া পড়িল।

বয়োবৃদ্ধি সহকারে জ্যেষ্ঠ এস্‌সিটন নানাবিধ উচ্চ গুণের আধার হইল। সে আকারে যেমন প্রিয়দর্শন স্বভাবেও তেমনই সর্বজনের প্রিয়কারী ; পিতার অনুগত ও আজ্ঞাধীন। বিমাতার বিষোদ্গারে সময়ে সময়ে জ্বালাতন হইয়াও এস্‌সিটন দ্রষ্টব্য ব্যবহারে বিকারশূন্য। বৈমাত্র ভ্রাতা ফিলিপ জারভেজ হার্ডউইক (Philip Gervage Hardwick) তাহার সহোদরপ্রতিম ও প্রাণাধিক প্রিয়। সে কখনও ভৃত্য ও পরিজনের প্রতি কঠোর ব্যবহার করে না। সকলেই তাহাকে ভালবাসে, সেও সকলকেই প্রীতির চক্ষে নিরীক্ষণ করে। বস্তুতঃ রালফ এস্‌সিটন বিশ্রুতনামা হাডউইক বংশের উপযুক্ত বংশধর রূপে ইদানীং সর্বত্রই সম্মানিত। বৃদ্ধ সার্ রাল্‌ফ এতকাল সাংসারিক সুখে নিরাশ রহিয়া থাকিলেও সম্প্রতি

উপযুক্ত পুত্রের অমায়িক আচরণে আশায় উৎফুল্ল। পুত্রের বয়স বিংশতি বৎসরের সমীপবর্তী। আর দুটি বৎসর কাটিয়া গেলেই পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত ও সম্পত্তির অধিকারী হইবার যোগ্য হইবে। ভগবান উহার মঙ্গল করিলে তিনি নিশ্চয়ই পুত্রকে পৈতৃক সম্পত্তিতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া চক্ষু বুজিতে পারিবেন।

কিন্তু হায়! তাঁহার এ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইল না। সার্ রাল্‌ফ বয়োগণনায় তেমন বৃদ্ধ না হইয়া থাকিলেও রোগজনিত অকালবার্ধক্যে শরীরে নিতান্ত জীর্ণ শীর্ণ। ইহার উপরে ঘটনাক্রমে শিকার ক্ষেত্রে একটা আঘাত প্রাপ্ত হইয়া তিনি একবারে শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন। এই যে শয্যাশায়ী হইলেন আর উঠিলেন না। তিনি অন্তিম সময়ে প্রিয়তম পুত্রকে নয়ন ভরিয়া দেখিতে দেখিতে ইহলোক হইতে অন্তর্ধান করিলেন। কনিষ্ঠকে স্নেহরুদ্ধ কণ্ঠে এইমাত্র বলিয়া গেলেন, 'বাছা, তুমি সর্বাংশে তোমার জ্যেষ্ঠের অনুরূপ ও আজ্ঞাবহ হইও।'

সার্ রাল্‌ফ হার্ডউইক স্বর্গগত। দুই এক মাস পরেই যুবক এস্‌সিটন, সার্ রালফ্ এস্‌সিটন রূপে হার্ডউইক সম্পত্তির অধিকারী হইবে। সার্ রাল্‌ফ হার্ডউইক পুত্রের শৈশব সময়েই তাহার ভাবী পত্নী নির্বাচন করিয়াছিলেন। এস্‌সিটনের বয়ঃপ্রাপ্তি ও পরিণয় উৎসব একই সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে। ইহা সার্ রালফেরই শেষ আজ্ঞা। পরিজনেরা শোকাভিভূত হইলেও স্বর্গগত প্রভুর আজ্ঞাবহ। তিনি স্বয়ং এস্‌সিটনের বিবাহের জন্য সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন। কে তাঁহার ইচ্ছার প্রতিকূলতা করিবে? তাই সকলে আসন্ন উৎসবের আশায় ও উৎসাহে আমোদবিহ্বল না হইয়াও উৎসুক। উৎসবের আয়োজন উদ্যোগ চলিতেছে। পূর্বনির্বাচিত পাত্রী মিস্ ফিলিশিয়া উইনগ্রোভ (Miss Felicia Wingrove) তাঁহার পিতা ও খুল্লতাতের সমভিব্যাহারে আজি কএক দিন হইল অভ্যাগত রূপে হার্ডউইক হলে উপস্থিত হইয়াছেন।

মিস্ ফিলিশিয়া সুন্দরী যুবতী। তাঁহার কমনীয় কান্তি প্রস্ফুট গোলাপের ন্যায় মনোহারিণী। তাঁহার নবোদ্গত প্রীতির নির্মল উৎস-স্বরূপ নয়ন যুগলের সরল দৃষ্টি, ছাঁচে কাটা নিটোল ললাট এবং নয়নহারি অধর প্রান্তে সলজ্জ হাসির অর্ধবিকশিত মাধুরী যে দেখিল সেই প্রীত ও মোহিত হইল। সুন্দরী ফিলিশিয়ার মৃদুমধুর বিনীত ব্যবহার এবং অকৃত্রিম সৌজন্য ও শিষ্টাচার দর্শনে হার্ডউইক হলের সকলেই তাঁহাকে

উহার উপযুক্ত গৃহস্বামিনী জ্ঞানে সাদরে ও সসম্ভ্রমে নমস্কার করিল। ফিলিশিয়ার পিতা স্বর্গগত সার্ রাল্‌ফের অতি পুরাতন সুহৃদ। মিস্ ফিলিশিয়া যে সময়ে একটি সুগঠিত রজত পুত্তলিকার ন্যায় ধাত্রীর তত্ত্বাবধানে শৈশব দোলায় দোলায়িত সেই সময়েই সার্ রাল্‌ফ তাঁহার সহিত স্বীয় পুত্র রাল্‌ফ এস্‌সিটনের বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করেন। মিস্ ফিলিশিয়া এই হিসাবে এক প্রকার বাগ্‌দত্তা। ফিলিশিয়া পিতৃপক্ষ হইতেও বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী।

গ্রীষ্মকাল। অপরাহ্ণ। মৃদু মন্দ বায়ু প্রবাহিত হইতেছে। সায়াহ্ন কিরণ হার্ডউইক হলের সুবিস্তৃত কুসুম উদ্যানে তরল সোনার ন্যায় ঝলমল করিতেছে। হার্ডউইক হলের দ্বিতল-গৃহের এক সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে বাতায়ন পার্শ্বে একটি প্রৌঢ়া রমণী উপবিষ্টা। রমণীর বয়স প্রায় চল্লিশ হইয়াছে। প্রগল্‌ভ রূপের প্রখর প্রভা এখনও নিস্তেজ নহে। রমণীর প্রদীপ্ত নয়নে তীক্ষ্ন দৃষ্টি। উহা ডাহিনে বামে বৃক্ষবহুল উদ্যানের বিশাল বিস্তারে বিচরণ করিতেছে না। রমণী একটি যুবক ও যুবতীর গতিবিধি, স্নেহশূন্য নীরস নেত্রে লুব্ধা মার্জারীর মত লুক্কায়িত ভাবে পর্যবেক্ষণ করিতেছেন। যুবক ও যুবতী বিশ্রব্ধ আলাপে আত্মবিস্মৃতবৎ পুষ্পোদ্যানের এক নির্জন বর্ত্মে ধীরে ধীরে হাঁটিয়া বেড়াইতেছে। তাহারা ক্রমে বাতায়নের নিম্নদেশে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। রমণী ভাল করিয়া তাহাদিগকে দেখিলেন তাহাদের কথা শুনিলেন। নিদাঘ সমীর তাহাদের কলকণ্ঠের মৃদুধ্বনি রমণীর উৎসুক কর্ণে বহিয়া লইয়া গেল। এই রমণী আর কেহ নহেন, সার্ রাল্‌ফের বিধবা পত্নী লেডী হার্ডউইক, মুর তনয়া ইথেল। যুবক তাঁহারই গর্ভজাত পুত্র রাল্‌ফ এস্‌সিটনের বৈমাত্র ভ্রাতা ফিলিপ। যুবতী রাল্‌ফ এস্‌সিটনের বাগ্‌দত্তা ভাবী পত্নী ফিলিশিয়া উইনগ্রোভ।

লেডী রাল্‌ফ মুখভঙ্গিসহকারে আপনা আপনি কহিতে লাগিলেন, 'মন্ত্রণা বিফল হইবে না। ঔষধে প্রায় ধরিয়াছে। এই ত এরা দুটি। আমার কর্মারম্ভের উপযুক্ত সময় উপস্থিত। যা হউক আমার পথ আমি ঠিক করিয়া রাখিয়াছি। হতভাগ্য ফিলিপের প্রাণে যদি প্রকৃতই উচ্চ আকাঙ্ক্ষা কিংবা উচ্চ আশা থাকে এবং তাহাতে যদি প্রতিহিংসা প্রবৃত্তির বিন্দুমাত্রও সন্ধুক্ষণ করান যায় তাহা হইলে আব যায় কোথায়?' বলিতে বলিতে লেডী হার্ডউইক ব্যঙ্গ বিকৃত স্বরে ক্ষণকাল হাসিলেন।

পার্শ্ববর্তী প্রকোষ্ঠে কার যেন পদশব্দ? ফিলিপের নয় কি? লেডী হার্ডউইক ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলেন, হাঁ ফিলিপই বটে। অমনি মৃগয়াবেশে সজ্জিত একটি বলিষ্ঠ যুবা তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। লেডী হার্ডউইক কহিলেন, 'ফিলিপ।' মুহূর্ত পরে একটু উচ্ছ্বসিত অথচ শ্লেষযুক্ত কণ্ঠে পুনরপি কহিলেন, 'ফিলিপ জারভেজ হার্ডউইক।'

ফিলিপ কহিল, 'মা, এই যে আমি।' লেডী হার্ডউইক কহিলেন, 'তুমি যদি ফিলিপ জারভেজ হার্ডউইক তাহা হইলে ঐ দিক পানে চাহিয়া দেখ ত।' এই বলিয়া বাগানের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিলেন।

ফিলিপ মাতার আজ্ঞা পালন করিল। সে বাতায়নের নিকটে গেল; বাতায়ন পথে চাহিয়া দেখিল; এবং সহসা শোণিত সঞ্চারে আরক্তগণ্ড হইয়া অবনত মুখে মায়ের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

মা কহিলেন, 'ঐ যুবতীকে তুমি অবশ্যই জান।'

ফিলিপ কহিল, 'হা জানি। অনভ্র দিবার আলোক অপেক্ষাও উজ্জ্বলতর প্রভা, দেবপ্রভাময়ী ঊষা অপেক্ষাও অধিকতর মনোহারিণী ঐ যুবতীকে কেনা জানে মা? মা, আমি পাগলের মতো হইয়াছি; আমি উহাকে ভালবাসি। কিন্তু সে কথা উহার নিকট মুখ ফুটিয়া কহিতে সাহস পাই না। আমি এইমাত্র উহার নিকট অস্ফুট কৌশলে যে প্রকার দয়া ভিক্ষা করিলাম, তৎসম্পর্কে ইহার মুখে অনুকূল উত্তর না পাইলে আমি স্থির থাকিতে পারিব না; নিশ্চয়ই পাগল হইব, না হয়ত মা প্রাণে মরিব।'

লেডী রালফ কহিলেন, 'তুমি কি শুন নাই বাছা ও অচিরেই তোমার বৈমাত্র ভ্রাতার পত্নী হইবে। যুবতী তাহার জন্য ত রীতিমত বাগ্‌দত্তা হইয়া রহিয়াছে। তুমি অভাগিনীর ভিখারী পুত্র। তোমার আর আশা কি? তুমি মনের মত উত্তর পাইবে কিনা সে বিষয়ে গভীর সন্দেহ।'

ফিলিপ কহিল, 'কেন, আমি কি ইহার প্রতিরোধে অসমর্থ? প্রতিরোধ করিতে—'

মাতা হঠাৎ বাধা দিয়া একটু হাসিয়া কহিলেন, 'কি, তুমি কি তবে বলপ্রয়োগ করিতে চাহ?'

ফিলিপ বলিল, 'আবশ্যক হইলে তাহাও করিব। আমি শপথ করিয়া কহিতেছি, তোমার নিকট যখন যাহা শুনিয়াছি তাহার এক বর্ণও আমি ভুলি নাই।'

মাতা বলিলেন, 'তুমি তাহাকে ভাল করিয়া চিনিতে ও বুঝিতে

পারিয়াছ কি ?'

ফিলিপ কহিল, 'কাহাকে ? আমার বৈমাত্র ভ্রাতাকে নয় ? তাহাকে বুঝিতে আর চিনিতে কি এখনও বাকি আছে ?'

মাতা একটু ক্লিষ্ট কণ্ঠে উত্তর করিলেন, 'না না, তুমি তাহাকে এখনও ভাল করিয়া চিনিতে পার নাই। তুমি যাহা ভাবিতেছ শুধু তাহাই নহে। সে তাহা অপেক্ষাও অনেক বড়।'

ফিলিপ যেন কথাটার তাৎপর্য পরিগ্রহ করিতে না পারিয়াই কহিল, 'বড়। বড় কোন অংশে ?'

লেডী হার্ডউইক বলিলেন, 'তবে কি তুমি সমস্তই ভুলিয়া গিয়াছ ?'

ফিলিপ বলিল, 'সমস্ত কি মা, আমি কোন কথা ভুলিয়া গিয়াছি ?

লেডী হার্ডউইক কহিলেন, 'রাজপ্রাসাদের ন্যায় এই বিরাট অট্টালিকা, বিস্তৃত ভূম্যধিকার, বিপুল সম্পত্তি, ভিতরে ও বাহিরে দুই চক্ষে যাহা কিছু দেখিতেছ, ঐ উদ্যান, ঐ বনভূমি, মাঠ হ্রদ ও নদী এই সমস্তেরই অদ্বিতীয় অধিপতি সে ! হা মূর্খ, একথা কি তোমার মনে আছে ?'

যুবকের দন্তে দন্তঘর্ষণ ও নিমেষকাল নয়নযুগলে অগ্নিস্ফুলিংগনির্গম হইল। কণ্ঠে ক্রুদ্ধ অজগর গর্জনের ন্যায় নিঃশ্বাস বহিল। যুবক বিকৃত স্বরে কহিল, 'হাঁ মনে আছে মা, সব মনে আছে ; এখনই সমস্ত লেঠা মিটাইয়া ফেলিতেছি দেখ। পেওলো (Paolo), পেওলো কোথায় মা ?'

লেডী হার্ডউইক কহিলেন, 'সে অরসিনোর (Orsino) সঙ্গে আছে। গর্ত খনিত হইয়াছে। উহাদিগকে যাহা যাহা করিতে বলা হইয়াছিল উহারা সমস্তই করিয়াছে। সমস্ত জোগাড় যন্ত্র ঠিক করিয়া উহারা চলিয়া গিয়াছে।'

ফিলিপ সবিস্ময়ে কহিল, 'চলিয়া গিয়াছে ! কোথায় ?'

লেডী হার্ডউইক বিকৃত মুখভঙ্গিসহকারে হাসিয়া কহিলেন, 'এখানে অনেকেই উহাদিগকে চিনিত। যেখানে গেলে উহাদিগকে কেহই আর কখনও দেখিতে কিংবা চিনিতে পাইবে না, উহারা সেই স্থানে চলিয়া গিয়াছে।'

ইহার পরে যুবক ফিলিপ কি করিল, কোথায় কি হইল, আর কেহই তাহা জানিতে পাইল না। একটি পুরাতন পরিচারিকা মাত্র গুপ্তভাবে মাতা পুত্রের এই ভয়ঙ্কর কথোপকথন শুনিতে পাইয়াছিল। যে সময়ে

শুনিয়াছিল সে সময়ে পরিচারিকাও সমস্ত কথার প্রকৃত তাৎপর্য পরিগ্রহ করিতে না পারিয়া কথাটা আর একটি পরিচারিকার কাছে কানে কানে বলিল। সেও এ হিজিবিজি কথার কিছুই না বুঝিয়া তখনকার জন্য নীরব থাকাই উচিত মনে করিল।

সূর্য অস্তগত হইল। ক্রমে হার্ডউইক হল সর্বদুঃখহারিণী যামিনীর নৈশ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। কিন্তু ঐ রাত্রিতেই রাল্‌ফ এস্‌সিটন হার্ডউইক অকস্মাৎ অদৃশ্য হইলেন। স্বর্গগত সার্ রাল্‌ফের প্রাণাধিক ও আদরের ধন হাডউইকের ভাবী অবলম্ব প্রিয়দর্শন ও প্রিয়ংবদ এস্‌সি-টনকে ইহার পরে আর কেহই দেখিতে পাইল না।

এস্‌সিটন কাহাকেও কিছু না বলিয়া কিছুই না কহিয়া এভাবে কোথায় চলিয়া গেলেন, কি উদ্দেশ্যে এমন করিয়া কোথায় যাইয়া লুকাইলেন বুঝিতে না পারিয়া হার্ডউইক প্রদেশের সমস্ত ব্যক্তিই বিস্মিত উৎকণ্ঠিত ও একান্ত শোকাভিভূত হইয়া পড়িল। পেওলো ও অর্সিনো নামক ইটালীয় ভৃত্যদ্বয়কেও ঐ দিন হইতে কেহ আব দেখিতে পাইল না। ইহার কিছুদিন পূর্বে লেডী হার্ডউইক ইটালীতে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। ইটালী হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় ঐ দুই ভৃত্য তাঁহার সঙ্গে আনীত হইয়াছিল। লোকে স্বভাবতই সন্দেহ করিল রাল্‌ফ এস্‌সিটনের আকস্মিক তিরোধানের সহিত ইটালীয় ভৃত্যদ্বয়ের ঐ প্রকার তিরোধানের বিশেষ সম্পর্ক আছে।

দেশ ভরিয়া ঘোরতর আন্দোলন চলিল। সুদক্ষ ডিটেক্টিভের দল চারিদিকে অনুসন্ধানে বহির্গত হইল।

তাহারা বন গ্রাম ও নগর তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিল। রাজপুরুষেরা এবং বিমাতা ও বৈমাত্র ভ্রাতা প্রচুর পুরস্কারের ঘোষণা দিলেন। তথাপি রাল্‌ফ এস্‌সিটন ও ইটালীয় ভৃত্যদ্বয়ের কোথাও কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।

ক্রমে আন্দোলনের জল্পনা কল্পনা ও অনুসন্ধানের কল-কল কলরব নীরব হইল। হার্ডউইক হলের উৎকণ্ঠা ও শোকের উচ্ছ্বাসও ভাবী অধিস্বামীর আদরে ও উপাচারে একটুকু প্রশমিত হইয়া আসিল। এস্‌সিটনের বৈমাত্র ভ্রাতা সার্ জারভেজ ফিলিপ হাডউইক হলের উত্তরাধিকারী রূপে দণ্ডায়মান হইলেন। কৃষক জোতদার স্টেটের অন্যবিধ প্রজা এবং চতুঃপার্শ্ববর্তী গ্রাম্য লোকেরা প্রচুর মদ্যমাংসে তৃপ্তি লাভ করিয়া

সার্ জারভেজ ফিলিপের দীর্ঘায়ু কামনা করিতে লাগিল। ইহাও স্থিরীকৃত হইয়া রহিল যে সার্ জারভেজ ফিলিপ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেই হতভাগ্য জ্যেষ্ঠের বাগ্দত্তা প্রণয়িনী কুমারী ফিলিশিয়া উইনগ্রোভের পাণিগ্রহণ করিবেন; এবং যে দিন পৈতৃক আসনে প্রভুরূপে বসিবেন সেই দিনই রূপসী ফিলিশিয়াকে পরিণয় সূত্রিত ফুলের মালার মত গলায় দোলাইয়া জীবনে কৃতার্থ হইবেন।

দুঃখের পর সুখ। শোকের পর উৎসব। ভাবী উৎসবের সাড়ম্বর আয়োজনে আবার হার্ডউইক হল ঝম্ ঝম্ করিতে লাগিল। কিন্তু আমোদগৃহের অদূরে পশুপক্ষীর বিলাপধ্বনি জনিত আশঙ্কিত বিষাদের ন্যায় ইহারই মধ্যে হার্ডউইক হলে কেমন একটা অচিন্তিত বিষাদের ছায়া পড়িল। হার্ডউইক হলের ভৃত্য ও পরিচারকগণ প্রতিদিন নিশা সমাগমে যারপরনাই ভীত ও ব্যস্ত হয়; এবং এখানে সেখানে চুপি চুপি অতিবড় বিষণ্ণ ও বিপন্নের ন্যায় কিসের যেন কানাকানি করে। ইহার কারণ কি? তাহাদিগের মধ্যে অনেকে কর্মত্যাগে প্রস্তুত তথাপি মধ্যরাত্রে হার্ডউইক হলের কোন কোন স্থানে বিশেষতঃ একটা নির্দিষ্ট গেলারীর নিকটে কিছুতেই যাইতে সম্মত হয় না। পরিজনদিগের এই প্রকার উদ্বিগ্নচিত্ততার মূলে মনঃকল্পনা ছাড়া প্রকৃতও কিছু আছে কি?

মূলে কিছু না থাকিলে শুধুই মনগড়া কথা মনুষ্যজীবনের সুখ-শান্তির স্রোতে স্বপ্নেরও অগোচর ও অতি ভয়ঙ্কর পরিবর্তন ঘটাইতে পারে না। কথা গোপনে রহিল না। যাহা ঢাকিয়া রাখিবার জন্য এত যত্ন হইয়াছিল তাহা যেন ঢাকে ঢোলে বাজিয়া উঠিল। ক্রমে সকলেই জানিতে পাইল, হার্ডউইক হল কিছুকাল হইতে ছায়ামূর্তির নৈশ বিচরণে একটু বেশী উৎপীড়িত হইতেছে; ওখানে মনুষ্যের বসতি কঠিন। কেহ কেহ অবশ্য অবিশ্বাস করিয়া কথাটা উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিল। যাহারা না দেখিয়াও বিশ্বাস করিল, কিংবা চক্ষে প্রত্যক্ষ দেখিল, তাহারা যারপরনাই ভীত ও সঙ্কুচিত হইল। ছায়ামূর্তির দর্শন ও উৎপীড়ন প্রাসাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে। হল ও হলের বহিঃস্থিত উদ্যান ও বনভূমি উভয়ত্রই অতি ভয়াবহ ও অদ্ভুত দৃশ্য লোকের চক্ষে পড়িতে লাগিল। বাড়ীর ভিতরে নিশীথ-সময়ে লম্বিত পরিচ্ছদ ও শ্মশ্রুবিমণ্ডিত বিকটদৃশ্য দুটি ছায়ামূর্তি প্রতি রাত্রিতে ঘুরিয়া বেড়াইত। উহারা কাহাকেও কিছু বলিত না বটে; কিন্তু অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় জলন্ত চক্ষে যাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিত

সেই আকস্মিক ভয় ও বিস্ময়ে আড়ষ্ট স্তম্ভিত অথবা একবারে মূর্ছাপন্ন হইয়া পড়িয়া যাইত। বাড়ীর বাহিরে যাহা দৃষ্ট হইত নিম্নবর্ণিত মৃগয়া ব্যাপারের সাড়ম্বর অনুষ্ঠানেই তাহা পরিস্ফুট হইবে।

একদা হার্ডউইক হলের যুবক উত্তরাধিকারী সার ফিলিপ হার্ডউইক মৃগয়ায় বহির্গত হইলেন। সঙ্গে শত শত সহচর ও পারিষদ। ফিলিপ বেগবান্ উচ্চ ঘোটকে আরোহণ করিয়াছেন। তাঁহার ভাবি অর্ধাঙ্গ-ভাগিনী সুন্দরী ফিলিশিয়া তদীয় দক্ষিণ পার্শ্বে অন্য ঘোটকের উপরে। পশ্চাতেও অশ্বারোহণে বহু ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা। অশ্বের হ্রেষারব শিকারী কুক্কুরের শঙ্কাজনক হুহুঙ্কার এবং পাদচারী শিকারীদিগের শিঙ্গ ধ্বনিতে বনস্থলী বিলোড়িত। চারিদিকে হাসির হিল্লোল, আমোদের উচ্ছ্বাস, বিদ্রূপের তরঙ্গ ও বীরত্বের বাহ্বাস্ফোটন।

সর্বপ্রথম একটি মৃগশাবক শিকারীদিগের সম্মুখে পতিত হইল। প্রাণভয়ে ভীত ও ব্যতিব্যস্ত হরিণশিশু বিদ্যুদ্বেগে ছুটিয়া চলিল। ফিলিপ হার্ডউইক হসিতচ্ছবি ফিলিশিয়ার সহিত মৃগের পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। তৎপশ্চাৎ অশ্বারোহীর দল। তাহারও ঘোড়া হাঁকাইয়া দিল। সকলেই তরঙ্গায়িত বনভূমির ভিতর দিয়া এতদূর অগ্রে সরিয়া পড়িলেন যে হার্ডউইক হলের চূড়াটিও তখন অদৃশ্য হইয়া আসিল। যাইতে যাইতে কি একটা সুখ-সোহাগের কথা কহিবার নিমিত্ত ফিলিপ যেই তাহার সুন্দরী সঙ্গিনীর পানে ফিরিয়া চাহিলেন অমনি দেখিতে পাইলেন যে তাঁহারই পার্শ্বদেশে তাঁহারই মত বায়ুবেগে অপর কে একটি অশ্বারোহী চলিয়া যাইতেছে। ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলেন—এ অশ্বারোহী ও অশ্ব অন্য অশ্বারোহী বা অশ্বের মত নহে। এ অশ্বারোহী ও অশ্বের গতি আছে শব্দ নাই। অবয়ব আছে সে অবয়বে জড়পরমাণুর ঘনসন্নিবেশ নাই। অশ্বারোহী ও অশ্ব উভয়ই যেন বাষ্পময় ছায়ামূর্তি। সহসা ফিলিপের শরীর রোমাঞ্চিত হইল। ফিলিপের বেগবান্ অশ্বও স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। ছায়ামূর্তির মুখে কোনরূপ বাক্য স্ফূর্তি হইল না। কিন্তু উহাও অশ্বপৃষ্ঠে নিশ্চল ভাবে রহিয়া গভীর ঘৃণা ও তিরস্কারব্যঞ্জক তীব্র দৃষ্টিতে ফিলিপের সঙ্গিনী যুবতীর দিকে তাকাইতে লাগিল। যুবতী দেখিলেন দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন এবং ছায়ামূর্তির মুখ দেখিয়াই প্রকৃত পরিচয় পাইলেন। তাঁহার প্রাণ শুকাইয়া গেল, মুখশ্রীতে মুহূর্তের মধ্যেই কেমন একটা পরিবর্তন ঘটিল।

ইহার পরে ছায়ামূর্তি উহার সেই জলন্ত অনলনেত্র ফিলিপের দিকে ফিরাইল এবং ভ্রূকুটি-কুটিল বিকট মুখভঙ্গি সহকারে অংগুলি নির্দেশ করিয়া অদূরে একটি স্থান দেখাইয়া দিল। ঐ স্থানের লতা গুল্ম প্রভৃতি উৎপাটিত, ঝোপ ও ঝোর ছিন্ন ভিন্ন। ছায়ামূর্তি যেন অংগুলিসঙ্কেতে ইহাই কহিল, 'চাহিয়া দেখ্ ঐ সেই স্থান।' ফিলিপের কম্পিত প্রাণও যেন ঐ ভয়াবহ ইঙ্গিতে ইহাই বুঝিয়া লইল, 'হাঁ ঐ ত সেই স্থান।'

ফিলিপ আকুল কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। ভয়চকিত ঘোটকও অধিকতর ভয়ে অধীর ও উচ্ছৃংখল হইয়া লাফাইতে লাগিল। অশ্বারোহীদের মধ্যে আরও অনেকে ছায়ামূর্তির এই বিস্ময়জনক দৃশ্য দেখিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন। চারিদিকে কেমন একটা আতঙ্কের ধ্বনি উঠিল। ফিলিপ আর আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না। তিনি মূর্ছিত অবস্থায় পড়িয়া গেলেন। তাঁহার রক্তাক্ত তনু ভূতলে লুণ্ঠিত হইল। কতিপয় অশ্বারোহী ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া পরিচারকদিগকে চীৎকারের কণ্ঠে আহ্বান করিলেন। পরিচারকেরা ফিলিপকে কাঁধে করিয়া গৃহাভিমুখে বহিয়া লইয়া চলিল। ফিলিশিয়া মাটীতে পড়িলেন না বটে; কিন্তু তাঁহারও বদনে বিবর্ণ পাণ্ডুরেখা, বুকে ধড়ফড় এবং সমস্ত শরীরে ভয়ঙ্কর কম্প। জনৈক অশ্বরোহী অশ্বের বল্গা ধরিয়া তাঁহাকে টানিয়া লইয়া চলিলেন। পাছে তিনি পড়িয়া যান এই আশঙ্কায় ঘোটকের দুই পার্শ্বে দুইজন পরিচারক তাঁহাকে ধরিয়া চলিল। এইভাবে ফিলিশিয়া তাঁহার বিশ্রাম ভবনে নীত হইলেন। ক্ষণকালের মধ্যেই শিকারের সেই উৎকট হলহলা ও আমোদ উচ্ছ্বাস বিষাদে ডুবিয়া গেল।

যাঁহারা পশ্চাতে রহিলেন কুক্কুরগুলির গতিবিধি তাঁহাদিগের নিকট বড়ই বিচিত্র বিস্ময়কর ও আতঙ্কজনক বোধ হইল। কুক্কুরগুলি ছায়ামূর্তির প্রদর্শিত সেই নির্দিষ্ট স্থানে বারংবার ঘুরিয়া ঘুরিয়া যাইতে লাগিল; আর ঐ স্থানের মাটী আঁচড়িয়া আঁচড়িয়া শুঁকিতে শুঁকিতে কখনও ক্রোধে ও ভয়ে গর্জ্জন কখনও বা বিলাপের স্বরে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। তীক্ষ্ণ ঘ্রাণেন্দ্রিয়যুক্ত প্রাণিগুলির এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখিয়া, ঐ স্থানের মাটীও একটু শিথিল ভাবাপন্ন লক্ষ্য করিয়া অনেকেই ঐ স্থানে ফিরিয়া আসিলেন। গাঁতি ও কোদালি সংগৃহীত হইল। তাঁহারা কুক্কুরপ্রদর্শিত স্থান খনন করিলেন। খনন করিয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহাদিগেরও চক্ষু স্থির হইল, মাথা ঘুরিয়া গেল। দেখিলেন যুবক

রালফ্ এস্‌সিটনের মৃতদেহ ঐ স্থানে নিহিত রহিয়াছে। দেহের নানাস্থানে গভীর অস্ত্রক্ষত, অংগপ্রত্যংগ ভগ্ন কর্দমাক্ত ও শোণিতসিক্ত। অমায়িক এস্‌সিটন ঐ স্থানে এমন নিষ্ঠুরভাবে নিহত হইয়াছেন এই ভয়ঙ্কর শোকাবহ সত্য এক্ষণ সর্বাংশেই পরিস্ফুট হইয়া পড়িল।

মৃগয়িকের দল হার্ডউইক হলে ফিরিয়া আসিবার পূর্বেই এই ভীষণ সংবাদ চারিদিকে প্রচারিত হইল। সংবাদ হার্ডউইক হলে পঁহুছিল। মুর-তনয়া লেডী হার্ডউইক শ্রুতিমাত্রই বজ্রাহতের ন্যায় চমকিত হইলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার অবস্থা একান্ত শোচনীয় ও ভীতিজনক হইয়া উঠিল। তিনি বিকট রবে চীৎকার করিয়া ক্ষিপ্তার ন্যায় ছুটিয়া বাহির হইলেন। সর্বাগ্রে বারেন্দার দিকে দৌড়াইলেন এবং সেখানে সিঁড়ির নিকটবর্তী গেলারীতে দাঁড়াইয়া অজস্র অর্থশূন্য প্রলাপ উক্তি করিতে লাগিলেন। এই প্রলাপ উক্তি যাহারা মনোযোগ করিয়া শুনিল তাহারা সমস্তই জানিতে পাইল। রালফ এস্‌সিটন কেন কাহার প্ররোচনায় কাহা কর্তৃক কিভাবে নিহত হইয়াছেন প্রলাপেই তাহা প্রকাশিত হইল। উন্মাদ-গ্রস্ত বিধবা রমণী যাহাকে সম্মুখে পাইলেন তাঁহার কাছেই আত্মকৃত সমস্ত অনুষ্ঠান বিবরিয়া কহিতে লাগিলেন। কখনও বা মাটীতে গড়াগড়ি দিয়া একটা প্রস্তর ফলকের কাছে মাথা নোয়াইয়া তাঁহার সেই ইটালীয় ভৃত্যদ্বয়কে নাম ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন। ইহাতে লোকের মনে আবার নূতন সন্দেহের উদ্রেক হইল। ঐ প্রস্তর ফলক অপসারিত হইলে দৃষ্ট হইল যে উহার নিম্নদেশে একটা ন্যক্কারজনক কবর। সেই কবরে ইটালীয় ভৃত্যদ্বয়ের গলিত শব বিষ প্রয়োগে সবুজ বর্ণ হইয়া রহিয়াছে। লেডী হার্ডউইকের প্রলাপরোদনে উহাদিগের হত্যাকাহিনীও প্রকাশ হইয়া পড়িল।

এই হইতে হার্ডউইক হলের সুখ-সমৃদ্ধি ও গৌরব চিরদিনের তরে অস্তমিত হইল। ভয়ে দুঃখে ঘৃণায় ও ভাবনায় সকলেই ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। হার্ডউইক হলের শোচনীয় কাহিনী অধ্যাত্মধর্মের ইতিহাসে একটি আশ্চর্য অধ্যায় রূপে গ্রথিত হইয়া রহিল।

নবম অধ্যায়

উপক্রম

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আমেরিকায় একটি বড় কবি Lyric of the Golden Age অর্থাৎ স্বর্ণযুগের সুখ-সঙ্গীত নামে একখানি অপূর্ব কাব্য রচনা করিয়া সমগ্র সুসভ্য জগতে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। কবির নাম টমাস্ লেক্ হারিস্ (Thomas L. Haris)। তাঁহার দুই একটি কথা সত্যপ্রিয় পাঠক মাত্রেরই সতত স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। তিনি এক স্থলে বলিয়াছেন—'Facts are the basis of Philosophy; Philosophy the harmony of facts seen in their right relation.'

হারিসের কথা কবিতায় গাঁথা হইয়া থাকিলেও, উহার অর্থ বড় গভীর। এই পঙ্ক্তিত্রয়ের তাৎপর্য্যার্থ এই—বৃত্তান্তই জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রকৃত ভিত্তি, এবং জ্ঞানবিজ্ঞান পরস্পর-সম্বন্ধ বৃত্তান্তের সারোদ্ধার সত্য। বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে সকলেই এই তত্ত্বসূত্রের সমর্থন করিয়াছেন, এবং এই চিরপরিজ্ঞাত সাধারণ সূত্র অবলম্বন করিয়া বৃত্তান্তের সহিত বৃত্তান্ত মিলাইতে যত্ন পাইয়াছেন। বিজ্ঞানাচার্য সার্ উইলিয়ম টম্সন (Sir William Thomson) বৃটিশ এ্যাসোশিয়েসন (British Association) নামক বৈজ্ঞানিক সভার ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দীয় অধিবেশনে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে—

'Science is bound by the everlasting law of honour to face fearlessly every problem which can fairly be presented to it.'

সার্ উইলিয়ম টম্সন্ স্কটলণ্ডের বিশ্রুতনামা বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত। তিনি যেরূপ উচ্চশ্রেণীর লোক, তাঁহার উক্তিও সেইরূপ উচ্চভাবযুক্ত। তাঁহার কথার এই মর্ম যে—এ জগতে সর্বদা ও সর্বত্র যে সকল ঘটনা সংঘটিত হয়, তাঁহার বৃত্তান্ত সঙ্কলন এবং সেই বৃত্তান্তসমূহের অর্থপ্রকটন বিজ্ঞানশাস্ত্রের অপরিহার্য ধর্ম। বিজ্ঞান যদি বৃত্তান্তের সম্মুখীন হইতে ভয় পায়, অথবা বৃত্তান্তকে এড়াইয়া যায়, তাহা হইলে উহা বিজ্ঞান নহে।

আমরা পাঠককে অধ্যাত্মতত্ত্বের কতকগুলি প্রামাণিক বৃত্তান্ত ক্রমান্বয়ে উপহার দিয়া আসিতেছি। আজি এই অধ্যায়েও দুইটি পরীক্ষিত বৃত্তান্ত উপহার দিলাম। এই সকল বৃত্তান্তের সহিত বৃত্তান্ত মিলাইয়া, তাহার সারার্থ উদ্ধার করা পাঠকের আত্মকর্তব্য। পাঠকদিগের মধ্যে কেহ কেহ এরূপ জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন যে, যে প্রকার ঘটনাচয়ের বৃত্তান্তসমূহ ছায়া-দর্শনে বিবৃত হইতেছে, ভারতবর্ষেও তাদৃক্ ঘটনা অহরহ সংঘটিত হইয়া থাকে। সে সকল ঘটনা বান্ধবে প্রকাশিত হইতেছে না কেন ? ইহার প্রত্যুত্তরে বহু কথাই বলিবার আছে। আমরা এইক্ষণ দুইটি মাত্র কথা বলিব।

প্রথম কথা বৃত্তান্তের সত্যতা। ছায়া-দর্শনের সত্য পৃথিবীর কোন বিশেষ দেশে নিবদ্ধ নহে। পরলোকগত সূক্ষ্ম-শরীরীরা ইয়ুরোপ ও আমেরিকায় যেমন সময়ে সময়ে নিয়ম-বিশেষের অধীনতায় মনুষ্যকে দর্শন দান করেন ; আমাদিগের এ দেশেও তাঁহারা অবস্থাবিশেষে মনুষ্যের নিকট প্রকাশিত হইয়া থাকেন। কিন্তু ইয়ুরোপ ও আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে এরূপ আকস্মিক-দর্শনের তত্ত্ব পরীক্ষা, সত্য নির্ণয় ও বৃত্তান্ত সংগ্রহের জন্য প্রতি বৎসর বহুলক্ষ মুদ্রা ব্যয়িত হইয়া থাকে— বহুসংখ্যক বিচক্ষণ পণ্ডিত অন্য প্রকারের নানা কর্মে উপেক্ষা করিয়াও শুধু এই তত্ত্ব লইয়া নিরন্তর পরিশ্রম করেন ; এবং একজনে যাহা সংগ্রহ করেন, দশ জনে তাহার আলোচনা করিয়া দৃষ্টি অথবা শ্রুতির ভ্রম পরিহার করিতে যত্নপর হন। আমাদিগের এ দেশে ইহার কিছুই হয় না। এ দেশের বিজ্ঞ লোকেরা আত্মার পারলৌকিক অস্তিত্ব ও পুরোবর্তী অনন্তজীবনের তত্ত্ব সংগ্রহের জন্য প্রায় জীবনের একটি বৎসরও ব্যয় করিতে প্রস্তুত হন না। ইহার এই ফল যে সকল ঘটনা এ দেশে সংঘটিত হয়, তাহা লইয়া পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ ও আলোচনার অভাব, তাহার কিছুই লিপিবদ্ধ হয় না ; এবং বিশিষ্ট প্রমাণের অপ্রচুরতায় সে সকল কথার উপর নিঃসংশয় নির্ভর করা যায় না।

এ দেশেও বিদ্যুৎ আছে, অন্য দেশেও বিদ্যুৎ আছে। আমরা বিদ্যুদ্দর্শনে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া তাকাইয়া থাকি, অথবা কবিতা লিখি ; অন্যেরা বিদ্যুতের শক্তি লইয়া ক্রীড়া করেন, এবং বিদ্যুতের সমস্ত বৈভবকে ভগবানের বিশেষ দান জ্ঞানে মানুষের নিত্য ব্যবহারে আনয়ন করিতে যত্ন পাইয়া থাকেন। যে কথা জল অগ্নি ও বিদ্যুৎ সম্বন্ধে, ঠিক সেই কথাই অধ্যাত্মবিজ্ঞানের বিবিধ বৃত্তান্ত সম্বন্ধে।

দ্বিতীয় কথা বৃত্তান্তসংগ্রহে বিঘ্ন। লোকান্তরিত আত্মার দর্শন সম্পর্কে এদেশের অধিকাংশ লোকই ভয়ে আকুল, এবং ভয়ের দরুন তত্ত্ব পরীক্ষায় অসমর্থ। এই প্রবন্ধ রচনার সময়ে একটি সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক আমাদিগকে বলিলেন যে, একদিন তাঁহার গ্রামস্থ বাসভবনে তদীয় স্বর্গগত পিতৃদেব ছায়ামূর্তিতে দর্শন দান করিয়াছিলেন। মূর্তি আসনে উপবিষ্ট, জপে নিবিষ্ট ও স্তিমিতনেত্র। যিনি দেখিতে পাইলেন, তিনি ক্ষণকাল তাকাইয়া রহিলেন; তারপর, একটা চীৎকার দিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। যেখানে জপ-তপ-পরায়ণ সজ্জনের মূর্তি-দর্শনেও মনুষ্যের মূর্ছা হয়, সেখানে সদ্গতিপ্রাপ্ত আত্মিকেরা প্রকৃতই 'পার্যমানে' দর্শন দান করেন না, এবং যদি কখনও দৈবাৎ দৃষ্টিপথের পথিক হন, তথাপি যে দেখে, সে ভয়ের অধীরতা হেতু বৃত্তান্তের অঙ্গে কিছুই সংকলন করিতে পারে না। এ দেশে, অনেকে, অনেক স্থলে, আত্মিক-মূর্তির তত্ত্বপরীক্ষায়, বাধা-বিঘ্ন সম্বন্ধে এইরূপ অবস্থা সত্ত্বেও বিবিধ পরিস্ফুট প্রকাশ পর্যবেক্ষণ দ্বারা পারলৌকিক জীবনের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়াছেন। জগদীশ্বরের কৃপা হইলে আমরা সে সকল কাহিনী যথাকালে প্রকাশ করিব।

আজি যে দুটি কাহিনী নিম্নে উপহৃত হইতেছে, তাহার প্রথমটির সত্যতার জন্য রিভিউ অব্ রিভিউ (Review of Review) নামক বিখ্যাত পত্রিকার সম্পাদক স্টেড্ সাহেব মনুষ্যসমাজের নিকট দায়ী। দ্বিতীয় কাহিনীটির জন্য বৈজ্ঞানিক-বরেণ্য* ডক্টর গ্রেগরি এবং আরও বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন।

প্রকৃত প্রস্তাবে এই উভয় কাহিনীই সত্যমূলক: এবং পাঠক যদি একটির সহিত আর একটিরে মিলাইয়া পড়েন, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন যে উভয়ই আত্মিকদিগের শক্তিসংক্রান্ত পার্থক্যের পরিচায়ক। প্রথম কাহিনীর দুটি মূর্তিই কথা কহিতে চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদিগের মুখের কথা মুখেই রহিয়াছে, মুখ ফুটিয়া স্পষ্ট বাহির হয় নাই। দ্বিতীয় কাহিনীর আত্মিকপুরুষ, পৃথিবীর মানুষের মত কথা কহিয়াছেন, এবং সে কথা যাঁহারা কানে শুনিয়াছেন তাঁহারা কথাঅনুসারে কার্য করিয়া, তাহার যথার্থতার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়াছেন। একজনের সহিত আর একজনের শক্তি-প্রয়োগে এইরূপ তারতম্য অথবা প্রভেদ ঘটে কেন? অধ্যাত্ম-তত্ত্বের এসকল কথা কিছুদিন পরে, পৃথক্ প্রবন্ধে আলোচিত হইবে।

* Letters on Animal Magnetism by Dr. W. Gregory.

আত্মিক-কাহিনী

[অধ্যাত্ম-লোক]

গ্লস্টার (Gloucester) ইংলণ্ডের একটি শায়র কিংবা বিভাগ। ইহার প্রধান নগর গ্লস্টার সেভারণ নদীর তটে অবস্থিত। গ্লস্টার নগরের কোন দ্বিতল গৃহে একটি সম্ভ্রান্ত ও সুশিক্ষিত পুরমহিলা বাস করেন। শরৎকাল। একদিন বেলা অপরাহ্ণ ছয়টার সময়, মহিলা শারদীয় সান্ধ্যসমীরে কিয়ৎক্ষণ বাটীর উদ্যানে পরিভ্রমণ করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছেন। এখনও চা প্রস্তুত হয় নাই। তিনি চা প্রস্তুত হওয়ার প্রতীক্ষায় দোতলার এক কোঠায় যাইয়া একখানি ইজি-চ্যারে উপবেশন করিলেন। শুধু শুধু বসিয়া থাকা বিরক্তিজনক। অতএব তিনি থেকারে কৃত 'ভ্যানিটি ফেয়ার' (Vanity Fair) নামক পুস্তকখানি হাতে লইয়া, উহার এখানে সেখানে কিছু কিছু পড়িতে আরম্ভ করিলেন।

'ভ্যানিটি ফেয়ারের' কোন কোন অংশ তাঁহার নিকট বড়ই ভাল লাগিত। তিনি সেই সেই অংশ চিহ্ন করিয়া রাখিয়াছিলেন। ঐরূপ চিহ্নিত কোন একটি নির্দ্দিষ্ট স্থান, এই অবকাশে, একবার পড়িয়া লইবার অভিলাষে, তিনি এক দুই করিয়া পুস্তকের পাতা উলটাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। এমন সময়ে হঠাৎ তাঁহার প্রাণের মধ্যে কি প্রকার যেন একটা অননুভূতপূর্ব, অস্বাভাবিক ও অপ্রকাশিতব্য অনুভূতির সঞ্চার হইল। তাঁহার বোধ হইল, যেন তাঁহার বুকের উপর পাথরের চাপ—যেন শ্বাসরোধ হইয়া আসিতেছে। তাঁহার মনে লইল, কে যেন তাঁহার পশ্চাদ্‌ভাগে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার দেহপ্রাণের সমস্ত শক্তি ও সারপদার্থ কিরূপ অলৌকিক আকর্ষণে বাহিরে টানিয়া লইতেছে।

তাঁহার পশ্চাদ্‌দেশে প্রকৃতই কেহ দাঁড়াইয়া আছে কি? তিনি মুখ ফিরাইয়া তাহা দেখিতে চাহিলেন। কিন্তু তাঁহার দেখা হইল না। তাঁহার শরীর তখন আর তাঁহার ইচ্ছার অধীন নহে— তাঁহার মুখ ফিরিল না। হাত উঠাইতে চাহিলেন, হাতও উঠিল না। একটু নড়িতে চড়িতে চেষ্টা করিলেন, পারিলেন না। মনে একটু ভয় ও ভয়ের সঙ্গে একটা অদ্ভুত ভাবনার উদয় হইল। ভাবিলেন— 'এ আমার কি হইল, মূর্চ্ছা হইবে

না ত ?'— না সন্ন্যাস রোগে আমাকে আক্রমণ করিতেছে ?—ইহা ত আকস্মিক রাতব্যাধি কিংবা মৃত্যুর লক্ষণ নহে ?'— কিন্তু এ ভাবনা স্থায়ী হইতে পারিল না ; আপনা হইতেই অমনি আবার সিদ্ধান্ত করিলেন,— 'না, তা নয়, তাহা হইলে আমার শরীর এতদূর অসাড় ও শক্তিহীন হওয়া সত্ত্বেও মন এই পরিমাণ সজীবতা লাভ করিতেছে কেন ?'

তাঁহার জ্ঞান হইল যেন তাঁহার শরীরটা আর তাঁহার নহে। উহা এইক্ষণ কোন শক্তিশালী বহিঃস্থ কর্তার করে একটা নির্জীব ক্রীড়নক স্বরূপ হইয়াছে। তিনি অনুভব করিতে লাগিলেন, যেন তাঁহার দেহের অভ্যন্তর হইতে স্নায়বীয় শক্তির সমস্ত প্রবাহ সবলে বহিরাকৃষ্ট হইয়া তাঁহার সম্মুখের দিকে কোন এক নির্দিষ্ট স্থানে ক্রমে যাইয়া কেন্দ্রিভূত হইতেছে। তিনি নিশ্চল ও নিস্পন্দভাবে, সেই কেন্দ্রের দিকে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। সে দৃষ্টিও যেন অন্যের অধীন। উহা তাঁহার স্বাভাবিক চাহনি অপেক্ষা অধিকতর তীব্র ও অন্তঃস্পর্শী।

এই স্থির দৃষ্টির লক্ষ্যস্থানটি প্রথমতঃ শূন্য ছিল। দেখিতে দেখিতে সে শূন্যতা পূর্ণ হইতে লাগিল। যেন শ্বেতাভ কুজ্ঝটিকার আলোক-রেণুসমূহ কোথা হইতে ধীরে ধীরে সেই স্থানে ছুটিয়া আসিয়া বিম্বের আকারে সঞ্চিত হইল, ক্রমে ঐ বিম্ব বিস্তৃত ও দীর্ঘায়তন হইয়া উঠিল। মুহূর্তেকে দীর্ঘাকৃতি আলোক-বাষ্প হইতে মানুষের একখানি জীবন্ত মুখ সুস্পষ্ট প্রকাশ পাইল। অবশিষ্ট আলোক-রেণু নিচয়ও অতি দ্রুতবেগে উহার হস্তপদাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে পরিণত হইয়া গেল। এক্ষণ আর সে বিকীর্ণ আলোক নাই— সে কুয়াশা নাই, পূর্ণাবয়ব মনুষ্যমূর্তি মহিলার স্থির লক্ষ্যের বিষয়ীভূত !

ইহা কি দৃষ্টিভ্রম ?— না অধ্যাত্ম-লোক-নিবাসী বিচিত্র শক্তিমান্ সূক্ষ্ম শরীরীর আকস্মিক আবির্ভাব ? মহিলা কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না। তিনি তখন তাঁহার সম্মুখে যে সুস্পষ্ট সজীব মনুষ্যমূর্তি দণ্ডায়মান দেখিতেছেন, তাহা আর কখনও দেখেন নাই। উহার কোন প্রতিকৃতিও কোন স্থানে কখনও তাঁহার চক্ষে পড়ে নাই। তিনি ঐ ছায়ামূর্তিটিকে খুব ভাল করিয়া দেখিলেন। উহার বর্ণ একটুকু মলিন। বয়স পরিণত : মস্তক সুগঠিত, কিন্তু কেশশূন্য। ললাট উন্নত। মুখমণ্ডল ধবল-শ্মশ্রু-মণ্ডিত। দেহের আয়তন ক্ষীণ। মুখচ্ছবি প্রশান্ত ও গম্ভীর, অথচ উহাতে অতিমাত্র ঔৎসুক্যের ভাব স্পষ্ট পরিস্ফুট। উহার হাত

দুখানি তাঁহার পরিচিত কোন মানুষের হাতের মত নহে, অথচ ভাবব্যঞ্জক। হাত দুখানি আঙুলের দিকে দীর্ঘ— আঙুলের উপরে, করতলভাগে অল্পপরিসর। হাতের শিরাগুলি মাংসপেশীর মত স্থূলে স্ফীত হইয়া রহিয়াছে, এবং তখনকার সেই ক্ষিপ্তবৎ কর-সঞ্চালনে ঐগুলি ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতেছে। ছায়ামূর্তি গভীর কণ্ঠে ও আকুল প্রাণে, কাকুতি ও মিনতির ভাবে, মহিলার নিকট যেন কি মনোগত প্রার্থনা জানাইতেছে।

এই অচিন্তিতপূর্ব বিচিত্র মূর্তি অমন ব্যগ্রতার সহিত কি কথা বলিতেছে, তাহা শুনিবার নিমিত্ত মহিলা যে-কোনরূপ ক্লেশ স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু তাহাতেও তাঁহার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইল না। তিনি বহু চেষ্টায়ও সেই গভীর কণ্ঠের একটি কথা বুঝিতে পারিলেন না। আপনিও কথা কহিতে চাহিলেন; কিন্তু তাঁহার জড়িত-জিহ্বায় কথা সরিল না, তিনি অবশেষে বহু প্রয়াসের পরে— 'উচ্চৈস্বরে বলুন'— এই দুইটি মাত্র শব্দ উচ্চারণ করিতে সমর্থ হইলেন।

ইহার পর ছায়ামূর্তির মুখভঙ্গিতে প্রাণের ঔৎসুক্য ও আকুলতা অধিকতর স্পষ্টরূপে ফুটিয়া পড়িল। কণ্ঠের শব্দ যেন অধিকতর জোরের সহিত উচ্চারিত হইতে লাগিল। কিন্তু হায়! তথাপি মহিলা সেই শব্দস্রোতের একটি বর্ণও পরিগ্রহ করিতে পারিলেন না। ভাবিলেন— ইহা কি তবে তাঁহার শ্রুতিশক্তির অপটুতা! ক্ষণকাল এই বৃথা প্রয়াসের পরে ছায়ামূর্তি যেন বিশেষ বিবেচনা ও সতর্কতার সহিত ধীরে ধীরে অদৃশ্য হইতে আরম্ভ করিল। প্রথমতঃ সেই প্রস্ফুট মনুষ্যমূর্তি ক্রমে কুয়াসাচ্ছন্নের ন্যায় অস্পষ্ট হইয়া আসিল। পরে উহা শ্বেতবর্ণ বিম্বাকৃতি আলোক-মণ্ডলে পরিণত হইল। অবশেষে, সেই আলোকবিম্ব একবারে শূন্যে মিশিয়া গেল।

উল্লিখিত পুরুষ-মূর্তি সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য হইবার পূর্বেই সেই স্থানে, আর একটি স্ত্রীমূর্তির অপরিস্ফুট মুখচ্ছবি প্রতিভাত হইয়াছিল। এই মুখেও সেই সতেজ সম্ভাষণ-চেষ্টা। স্বর পূর্বেকার গভীর-কণ্ঠস্বরের তুলনায় বহু পরিমাণে মৃদু বলিয়া অনুভূত অথচ পূর্ববৎ অশ্রুত। যিনি ঘরে উপবিষ্ট রহিয়া দেখিতেছেন, তাঁহার কণ্ঠের শব্দ, তখন পর্যন্তও কণ্ঠেই এবং মাংসপেশীসমূহ তখনও পক্ষাঘাতগ্রস্তের ন্যায় অসাড় ও নিশ্চল। তিনি সেই বিচিত্র ঐন্দ্রজালিক মোহে পূর্বের মত অভিভূত ও আচ্ছন্ন। কিন্তু এই দ্বিতীয় মূর্তির তিরোধানের সঙ্গে

সঙ্গেই, তাঁহার শারীর-শক্তিনিচয় আপনিই আবার ফিরিয়া আসিল। তিনি পুনরায় অঙ্গসঞ্চালনে সমর্থ হইয়া গাত্রোত্থান করিলেন।

মহিলা এই আশ্চর্য ও আতঙ্কজনক সচেতন মোহ হইতে অব্যাহতি পাইয়াই তাঁহার এই আকস্মিক আবিষ্ট অবস্থার মূল-অনুসন্ধানে মনোনিবেশ করিলেন। কিন্তু কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। তিনি যেমন ছিলেন, তেমনই আছেন, না তাঁহার আকৃতিতে কোনরূপ বিকৃতি ঘটিয়াছে, আগে তাহাই আয়নার কাছে দাঁড়াইয়া দেখিয়া লইলেন। দেখিলেন— তাঁহার মুখখানি ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ হইয়াছে। ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম দেখা দিয়াছে। তিনি স্পঞ্জ (Sponge) দিয়া ঘাম মুছিয়া ফেলিলেন ; এবং যারপরনাই উত্তেজিতভাবে ক্ষণকাল কোঠার মধ্যে দ্রুতবেগে পদচালনা করিলেন। ছায়ামূর্তির এই অপূর্ব আবির্ভাবে কোন অনিষ্ট সংঘটিত হয় নাই সত্য ; কিন্তু তাঁহার স্মৃতিতে ঘটনার পূর্ববর্তী উৎকট অনুভূতির কথাটা স্পষ্ট মুদ্রিত রহিয়াছে। তিনি একবার ভাবিলেন— 'যাহা দেখিলাম তাহা ভ্রম, না প্রকৃত ?—না কখনও ভ্রম নহে।'—আবার ভাবিলেন,—'আমি সহসা ঐ অচিন্তনীয় প্রণালীতে ঘুমাইয়া পড়ি নাই তো ? না,—নিশ্চিতই ইহা নিদ্রার আবেশ কিংবা স্বপ্ন নহে। মনটা প্রকৃতিস্থ ছিল কি ?— ছিল বলিয়াই তো বিশ্বাস।'

মহিলা মনে মনে এইরূপ নানা প্রশ্ন করিয়া আপনা আপনিই তাহার মীমাংসা করিতে লাগিলেন। হঠাৎ তাঁহার মনে উদিত হইল—'ভাল, এই দৃশ্য যদি ধাঁধা না হয়, যদি ইহার মূলে প্রকৃতই কোন সত্য নিহিত থাকে, তাহা হইলে আবার ঠিক পূর্বেকার মত উপবিষ্ট রহিলে এই আশ্চর্য দৃশ্যের পুনরাবির্ভাব না হইবে কেন ?'

দৈব প্রজ্ঞার মত এই কথাটি মনে উদিত হওয়া মাত্র, তিনি আবার সেই ভাবে, সেই আসনে, তেমনি প্রশান্ত মনে, উপবেশন করিলেন। একখানি পুস্তক খুলিয়া আবারও তেমনি ধীর স্থির ও নিস্পন্দভাবে অবস্থিত রহিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে একটুও কালবিলম্ব ঘটিল না। পূর্ববৎ এক অজ্ঞাত শক্তি অমনি তাঁহার স্নায়ুমণ্ডলের উপর কার্য করিতে আরম্ভ করিল। আবার তাঁহার মাংসপেশী শক্তিহীন ও মনঃশক্তি বিচিত্ররূপে আকৃষ্ট হইতে লাগিল। তাঁহার দৈনিক তেজোরাশিও যেন পূর্ববৎ বহিরাকৃষ্ট হইয়া সম্মুখ-ভাগে কেন্দ্রীভূত হইল।

এবারকার আবেশ পূর্বাপেক্ষা অধিকতর ধীর ও স্থিরভাবে ক্রিয়া

করিল। তাঁহার নিঃশঙ্ক মনও এবার অধিকতর শান্ত অবস্থায় প্রত্যেক ঘটনা লক্ষ্য করিতে সমর্থ হইল। সেই মহিমান্বিত পুরুষ-মূর্তির আবির্ভাব আবার তেমনই ভাবে ঘটিল। মূর্তি তেমনই উৎসুক নয়নে, একতান দৃষ্টিতে মহিলার পানে তাকাইয়া রহিল। সেই গভীর কণ্ঠ-ধ্বনি-সহকারে হাত দুখানিও আবার তেমনই ভাবে সঞ্চালিত হইল। কথার তেমনই স্রোত বহিল। কিন্তু মহিলা এবারও পূর্ববৎ একটি অক্ষরও পরিগ্রহ করিতে পারিলেন না।*

যখন এই পুরুষ-মূর্তি অদৃশ্য হইতে আরম্ভ করিল, তখন পূর্বেকার মত আবার সেই স্ত্রীমূর্তির একখানি অপরিস্ফুট মুখ দৃষ্টিগোচর হইল। এ মুখে এবারও মৃদুতর স্বরে পূর্বের ন্যায় শব্দ উচ্চারিত হইতে লাগিল। মহিলার মনে হইল, এবার বুঝি বা উহার কথা তিনি বুঝিতে পারিবেন। তিনি শুনিবার নিমিত্ত বিশেষ আগ্রহের সহিত যত্ন করিলেন। শুনিলেন 'ভূমি' (Land) ও 'আমেরিকা' (America) শুধু এই দুইটি শব্দ। কিন্তু ইহার দ্বারা কিছুই বুঝিতে সমর্থ হইলেন না। দুটি মূর্তির নিশ্চয় বহু কথা বলিবার ছিল ; কিন্তু কাহারও মুখে কথা ফুটিল না।

প্রথম-দর্শন-সময়ে, মহিলা সম্পূর্ণ জাগরিত ও প্রকৃতিস্থ অবস্থায় অবস্থিত ছিলেন ; দ্বিতীয় বারে শুধু জাগরিত নহে, বিশেষ সাবধানতার সহিতই উপবিষ্ট রহিয়াছিলেন ; তাঁহার দৃষ্টি ও শ্রুতিতে ভ্রম হওয়া অনুমিত হয় না। কারণ তিনি চক্ষে যাহা দেখিয়াছিলেন এবং কানে যাহা শুনিয়াছিলেন আর শরীরেও যাহা অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন তাহা তখনই আনুপূর্বিক লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। মনুষ্যের চক্ষের সম্মুখে ছায়ামূর্তির এইরূপে ক্রমবিকাশ ও ক্রমবিলয়ের প্রণালীবৈচিত্র্যেই এই কাহিনীর বিশেষত্ব।

---

* খৃষ্টীয় পুরমহিলাদিগের মধ্যে অনেকে ধর্মযাজক অথবা কুল পুরোহিত মহাশয়ের অসন্তোষ ভয়ে এ সকল তত্ত্বের অনুসন্ধান সম্পর্কে আপনার নাম প্রকাশ করেন না। কিন্তু যাঁহার কথা লিখিত হইল তিনি ষ্টেড সাহেবের বিশ্বাসভাজন।

[আত্মার শেষ অনুরোধ]

বেলজিয়াম ইউরোপের একটি ক্ষুদ্র রাজ্য— ফ্রান্স-দেশের উত্তর-পূর্ব কোণে সাগরতট পর্যন্ত বিস্তৃত। বেলজিয়াম ফ্লেন্ডারস্ নামক আপন অঙ্গের এক অংশ ছিন্ন করিয়া ফ্রান্সের গ্রাসে আহুতি দিয়াছে। ফ্রান্সের এই ফ্লেন্ডারস্ প্রদেশে, রাজনৈতিক ঘটনা ক্রমে, ইংলণ্ডের রাজতনয় ডিউক অব্ ইয়র্কের সৈন্যদল এক সময়ে শিবির সন্নিবেশ করিয়াছিল। ওই সৈন্যদলে স্কটল্যণ্ডের জনৈক সম্পত্তিশালী সম্ভ্রান্ত যুবা সৈনিকের কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি যে তাঁবুতে থাকিতেন, সেই তাঁবুতে আরও দুইটি সৈনিক ভদ্রযুবা ছিলেন। এক কার্যে ব্রতী, একই পটগৃহে অবস্থান; এই সূত্রে তিন জনের মধ্যে ক্রমে বেশ একটু সৌহার্দ্যের সঞ্চার হইল। কিছুদিন পরে কর্তৃপক্ষের আদেশে ইঁহাদিগের একজন সাময়িক প্রয়োজনে স্থানান্তরে প্রেরিত হইলেন। তাঁবুতে স্কটল্যণ্ডের ঐ সম্ভ্রান্ত যুবক ও তাঁহার অপর সঙ্গীটি মাত্র রহিলেন। দুই জনের খাটুলির অদূরে তৃতীয় যুবার খাটুলিটি খালি পড়িয়া রহিল। এই ভাবে দুই চারিদিন কাটিয়া গেল।

দুই চারিদিনের পর একদা অকস্মাৎ যে দৃশ্য সেই তাঁবুতে দৃষ্টি ও শ্রুতির বিষয়ীভূত হইল তাহার কথা লইয়াই এই কাহিনী। গভীর রাত্রি। প্রকৃতি নীরব ও নিস্তব্ধ। কএকটি প্রহরী ব্যতীত ছাউনীর সমস্ত সৈন্য নিদ্রাগত। সহসা স্কটল্যণ্ড দেশীয় সেই ভদ্রযুবকের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন। তাঁবুতে আলো জ্বলিতে ছিল। সেই আলোকে দেখিতে পাইলেন তাঁহার বন্ধুর খাটুলিটি খালি নহে; যাঁহার খাটুলি তিনিই আসিয়া উহাতে উপবিষ্ট হইয়াছেন। তিনি অত রাত্রিতে বিনা সংবাদে কেমন করিয়া কি সূত্রে দূরবর্তী রণক্ষেত্র হইতে ফিরিয়া আসিলেন বিদ্যুদ্বেগে স্কট্ যুবকের চিত্তে এই বিষম সমস্যার উদয় হইল। তিনি চমকিয়া উঠিলেন এবং তাঁহার অপর সঙ্গীটিকে ডাকিয়া উঠাইলেন; তিনিও তৃতীয় খাটুলিতে তাঁহাদিগের অনুপস্থিত বন্ধুর সেই পরিচিত মূর্তি অকস্মাৎ দেখিতে পাইয়া রোমাঞ্চিত হইলেন। শুধু দেখিলেন এমন নহে, কথাও শুনিলেন— ঐ মূর্তি সুস্পষ্ট শব্দে কথা কহিল; বলিল -

'বন্ধুগণ তোমরা বিস্মিত হইও না, স্থিরচিত্তে আমার দুটি কথা শুন। আমি অদ্য এই মুহূর্তে রণক্ষেত্রে বন্দুকের গুলিতে নিহত হইয়াছি। এই দেখ আঘাতের চিহ্ন।' এই বলিয়া ছায়ামূর্তি রক্তাক্ত বক্ষঃস্থলে ভয়ঙ্কর

একটা ক্ষত দেখাইল। তাঁদের যুবকদ্বয় উভয়েই উহা দেখিলেন।

ছায়ামূর্তি আবার বলিল, 'যুদ্ধের অবসানে তোমরা যখন ইংলণ্ডে ফিরিয়া যাইবে তখন তোমরা আমার জন্য একটু কষ্ট স্বীকার করিও, ইহাই আমার অনুরোধ।' এই বলিয়া কোন এক এজেন্টের নাম ধাম ও ষ্ট্রীটের ঠিকানা নির্দেশ করিয়া পুনরপি কহিল 'ঐ এজেন্টের কাছে আমার একখানি দলিল আছে। ঐ দলিল দিয়া আমার এখন আর কোনই প্রয়োজন নাই। কিন্তু উহা আমার পরিবারের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। যদি এজেন্ট বলেন যে ঐ দলিল তাঁহার নিকটে নাই তাহা হইলে তোমরা নিজেরাই তাঁহার কোঠার একটা নির্দিষ্ট আলমারীর নির্দিষ্ট দেরাজে অনুসন্ধান করিও, অবশ্যই দলিল পাইবে।' ইহার পর আলমারিটির বিশেষ চিহ্ন ও দেরাজের নম্বরটি পর্যন্ত স্পষ্টরূপে বলিয়া দিয়া ছায়ামূর্তি শূন্যে মিশিয়া গেল।

বিস্ময়বিমুগ্ধ সৈনিকযুগল নীরবে দেখিলেন, সমস্ত কথা নীরবে শুনিলেন। তাঁহাদিগের বিস্মিত বুদ্ধিও যেন ক্ষণকাল অচল ও অসাড় হইয়া রহিল। ছায়ামূর্তি অদৃশ্য হইলে এ কি দেখিলেন ও কি শুনিলেন এ বিষয়ে উভয়ের মধ্যে বহু আলোচনা ও বাদানুবাদ হইল। কিন্তু তাঁহারা কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না, অধীর ও আকুল প্রাণে অবশিষ্ট রাত্রি জাগিয়া অতিবাহিত করিলেন। পরদিন প্রাতে সংবাদ আসিল প্রকৃতই তাঁহাদিগের সেই বন্ধু গত রাত্রিতে ঠিক সেই সময়ে যথাপ্রদর্শিত স্থানে বন্দুকের গুলিতে আহত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

ছায়ামূর্তি মৃত্যুর যে সময় ও স্থান নির্দেশ করিয়াছিল অফিসিয়েল রিপোর্টেও সেই সময় ও সেই স্থানেরই উল্লেখ ছিল। সৈনিক দলে সকলেই এই কাহিনী শুনিল। যাহারা বিশ্বাস করিল তাহারা বিস্মিত হইল। অবিশ্বাসীরাও হাসিয়া উড়াইয়া দিতে চেষ্টা না করিয়া স্তম্ভিতবৎ রহিল।

কালক্রমে যুদ্ধ শেষ হইয়া গেল; ডিউক অব ইয়র্কের সৈন্যদল ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিল। কিন্তু ছায়ামূর্তির অনুরোধটি উভয় বন্ধুই একবারে ভুলিয়া গেলেন। দৈবাৎ একদিন ঐ স্কটলণ্ডদেশীয় ভদ্র যুবা ও তাঁহার শিবিরসঙ্গী সৈনিক একসঙ্গে কোন এক বিশেষ কার্যানুরোধে ছায়ামূর্তির কথিত স্ট্রীটে সেই এজেণ্টের বাটীর সম্মুখ দিয়া যাইতেছিলেন। তখন ছায়ামূর্তির সেই বিস্মৃত অনুরোধ উভয়েরই যুগপৎ মনে পড়িল। তাঁহারা উভয়েই তৎক্ষণাৎ এজেন্টের সহিত সাক্ষাত করিলেন। কথিত

দলিল চাহিবায় এজেণ্ট কহিলেন, 'না, এমন কোন দলিল আমার নিকটে নাই।' যুবকদ্বয় উহাতে নিবৃত্ত না হইয় নির্দিষ্ট আলমারির নির্দিষ্ট দেরাজের উল্লেখ করিলেন এবং ঐ দেরাজটি একবার খুলিয়া দেখাইবার নিমিত্ত এজেণ্টকে আগ্রহের সহিত অনুরোধ করিতে লাগিলেন।

এজেণ্ট অবশেষে যেন নিতান্ত বিরক্তির সহিত যেন নিতান্ত দায়ে ঠেকিয়া দেরাজ খুলিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য সেই দেরাজ হইতে প্রকৃতই ছায়ামূর্তির কথিত সেই দলিল বাহির হইয়া পড়িল; এবং যুবকদ্বয় বয়সের ধর্মে তরলচিত্ত হইলেও তাঁহাদিগের চিত্তে দেবধর্মের সনাতন সত্য প্রত্যক্ষবৎ প্রতিভাত হইল। তাঁহারা মৃত সৈনিকের শোকাতুরা বিধবার হাতে ঐ দলিল বুঝাইয়া দিয়া সমরসহচর প্রিয়সুহৃদের শেষ অনুরোধ রক্ষা করিলেন; এবং দুই জন এক সংগে যাহা দেখিয়াছেন এক সংগে যাহা শুনিয়াছেন, আর এইক্ষণ দলিল খানি হাতে লইয়া একই মুহূর্তে হাতে হাতে যাহার প্রমাণ পাইলেন সে কথা বিজ্ঞলোকদিগের নিকট নির্ভয়ে বলিলেন।

উপক্রম

কবির উক্তি অনেক সময়েই বৈদিক ঋষির সূক্তের মত। উহার প্রত্যেক অক্ষরই যেন মহাসত্যে অনুপ্রাণিত। আমরা এই স্থলে বিখ্যাত কবি হুয়িটিয়রের লেখা হইতে চারটি পংক্তি উদ্ধৃত করিব; এই পংক্তি চতুষ্টয়ের প্রত্যেক অক্ষরেই প্রকৃত অনুপ্রাণনার পরিচয় আছে কিনা, পাঠক আপনিই তাহার বিচার করিবেন। জন্ গ্রিনুলিফ্ হুয়িটিয়র (John Greenleaf Whittier) কহিতেছেন—

'No truth from Heaven
descends upon our sphere,
Without the greeting of
the sceptic's sneer;
Denied and mocked at,
till its blessings fall,
Common as dew
and sunshine over all.'

যাঁহারা বিশেষ একটুকু অনুরাগের সহিত বৈজ্ঞানিক অথবা অধ্যাত্ম সত্যের ইতিবৃত্ত লইয়া আলোচনা করিয়াছেন, তাহারা একবাক্যে বলিবেন যে, হুয়িটিয়র ঠিক যেন তাঁহাদিগেরই প্রাণের কথার অনুবাদ করিয়া কবিতা লিখিয়াছেন। হুয়িটিয়রের কথার এই ভাবার্থ— সত্য যখন স্বর্গধাম হইতে সংসারে অবতীর্ণ হয়, তখন সংশয়-মূঢ় অবিশ্বাসীর শ্লেষ-পরিহাসেই উহা সর্বপ্রথম অভ্যর্থিত হইয়া থাকে। কিন্তু, প্রথমতঃ কিছুকাল এই প্রকারে অস্বীকৃত ও উপহসিত হইলেও, পরিশেষে উহা শিশির-বিন্দু অথবা সূর্য-রশ্মির ন্যায় সর্ব-জন-লভ্য শুভাশীর্বস্তুরূপে, সকল স্থানে অনুভূত হয়।

জগতের সকল সত্যই যখন অন্তঃসারশূন্য অবিশ্বাসীর নিকট কিছুকাল উপেক্ষিত রহে, তখন ছায়া-দর্শনের নিত্যস্মরণীয় সত্যও যে এখানে সেখানে দুই একটি বিজ্ঞম্মন্য যুবজনের নিকট অল্প কিছুকাল সাধারণ কথার মত উপেক্ষিত হইবে, ইহা অসম্ভব নহে। কিন্তু এ উপেক্ষা ক্ষণস্থায়ী আত্মবঞ্চনা মাত্র। কারণ, মনুষ্যের উপাস্য অন্যান্য

সত্য এক প্রকার বস্তু ; ছায়া-দর্শন-নিহিত গভীর সত্য সর্বাংশেই আর একপ্রকার বস্তু, এবং আপনার স্বাভাবিক প্রভাবে অনতিক্রমণীয়।

অথেলো অথবা হামলেট্ নামক নাটক শেক্ষপীর না বেকন লিখিয়াছেন, ইহা না জানিলেও মানুষের কিছু আসে যায় না। মারকোনির বৈতারিক বিদ্যুদ্‌বার্তা (Marconi's Wireless Telegraphy) স্বপ্নকথা না সত্যমূলক, ইহা এ দেশের অসংখ্য লোক এখনও অবগত হইতে পারেন নাই ; এবং যাঁহারা অবগত হইতে পারিয়াছেন, তাঁহাদিগেরও হৃদয়-মনের গতির সহিত উহার কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই। পক্ষান্তরে, পরলোকগত নর-নারীরা মনুষ্যকে ছায়া-মূর্তিতে দর্শন দান করিয়া, মানব-জীবনের কঠোর পরীক্ষা ও ক্রমোন্নতি বিষয়ে যে সকল সূক্ষ্ম তত্ত্ব সময়ে সময়ে প্রকাশ করিতেছেন, সে সত্যের সহিত সংসারের ছোট ও বড়, শিশু ও বৃদ্ধ, সকলেই সমানরূপে সম্পৃক্ত ; এবং যে আজি বুদ্ধির বিপাকে পড়িয়া উপেক্ষা করিতেছে, উহা তাহারও অবশ্যজ্ঞাতব্য। কেন না, তাঁহাদিগের সমস্ত কথাই মনুষ্যের সুখ ও দুঃখ, উন্নতি ও অবনতি এবং ঐহিক ও পারত্রিক শান্তির সহিত বহুসূত্রে গাঁথা এবং সুতরাং সকল প্রকার মনুষ্যেরই চিত্ত-পরিবর্তক ও চির-জীবনের গতি-নিয়ামক কথা।

পাঠক, ছায়ামূর্তির উপদেশ-বাণী শ্রবণ করিতে ইচ্ছুক হইবে কি ? তাঁহারা শত-সহস্র-সৈনিক-রক্ষিত সিংহাসনারূঢ় রাজরাজেশ্বরকে কহিতেছেন —'বাছা, তোমার এ দিন থাকিবে না ; তুমি সাবধান হও, এবং রাজ্য শাসন ও প্রজাপালন কার্যে প্রীতি ও ধর্মের আশ্রয় লও। নতুবা তোমাকে কঠোর পরীক্ষার অধীন হইতে হইবে।' তাঁহারা মুষ্টিভিক্ষার জন্য লালায়িত, রাজদ্বারের দ্বাররক্ষক-কর্তৃক পদাঘাতে উপেক্ষিত, কুণ্ঠগ্রস্ত ভিখারীকে সম্ভাষণ করিয়া বলিতেছেন, 'বাছা তোমারও এদিন থাকিবে না, তুমিও সাবধান হও। তুমি যদি এই দুঃসহ দুঃখকষ্টের মধ্যেও হৃদয়ে প্রীতি ও জীবনে বিশুদ্ধ নীতি রক্ষা করিয়া কোন প্রকারে, পৃথিবীর এই কয়েকটি দিন অতিবাহিত করিতে পার, তাহা হইলে, তুমি তোমার এই কঠোর পরীক্ষার প্রতিদানে ও পরিণামে, ঐ রাজ-রাজেশ্বরের ময়ূর-সিংহাসন হইতেও মহত্তর আসন পাইবে ; এবং দুঃখের পর দেব-দুর্লভ সুখ-স্বাদে অধিকারী হইয়া দয়াময় অনন্তদেবকে ধন্যবাদ দিবে।' তাঁহারা বণিক্‌কে সম্ভাষণ করিয়া কহেন, 'তুমি বাণিজ্যে সাধুবৃত্তি

অবলম্বন কর। নতুবা, লোভ ও লাভের পরিণাম বহু-কাল-স্থায়ী জ্বালাময় ক্ষোভ।' তাঁহারা সাহিত্যিককে সম্ভাষণ করিয়া বলেন—'তুমি ও সমাজ-হিত-জনক, সমুন্নতির পথ-প্রদর্শক, সুপবিত্র সাহিত্য সৃষ্টি কর। নতুবা তোমার এই ক্ষণিক যশ ও ক্ষণিক উল্লাসের শেষ ফল দীর্ঘ-কাল-স্থায়ী অন্তর্দাহ।' তাঁহারা ধর্মাচার্যকে উপদেশ করেন যে—'তোমার ঐ তিলক ও ত্রিপুণ্ড্রক, এবং ত্রিসন্ধ্যাস্নান ও ত্রিকোটি-তীর্থ-দর্শনে, বিনা চারিত্র্য-শোধনে, কখনও কোন ফল হইবে না, ফল হইবে সত্ত্ব-সাধু-জীবনে— সকলের উপকার সম্পাদনে, এবং অভিমান-শূন্য ভক্তির অনুষ্ঠানে। তাঁহারা জ্ঞানাচার্যকে উপদেশ করেন যে— 'তোমার জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং সুসজ্জিত গ্রন্থরাশি তোমাকে তরাইবে না; তরাইবে তোমার নিত্য জীবনের নির্মল আচরণে এবং আত্ম-পর-নির্বিশেষে সকলেরই শুভানুধ্যানে।' এমন সুগভীর, সুমঙ্গল্য ও সর্ব-সুখাবহ সনাতন তত্ত্ব যখন পৃথিবীতে প্রত্যক্ষ-প্রমাণ-সহকারে প্রকাশিত হইয়াছে, তখন কি উহা আর মনুষ্যের নিকট বেশী দিন কল্পনার উচ্ছ্বাস অথবা কৃত্রিম উপন্যাসের মত অনাদৃত থাকিতে পারে ?

বস্তুতঃ পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক ও বিজ্ঞ বিচক্ষণ পণ্ডিতেরা যে ভাবে, এবং যেরূপ উৎসাহ ও অক্লান্ত আগ্রহের সহিত, এই তত্ত্বের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; তাহাতে ভরসা করা যায় যে, পারলৌকিক-জীবনের সর্বপ্রকার সারেদ্ধার বৃত্তান্ত অতি অল্পকালের মধ্যেই সকলশ্রেণীস্থ লোকের সুপরিজ্ঞাত বিষয় হইবে; এবং মনুষ্য তাহার পার্থিব-জীবনের প্রত্যেক পদক্ষেপেই পারলৌকিক জীবনের প্রতি স্থির দৃষ্টি রাখিয়া যারপরনাই নম্র, ন্যায়বান্, ভক্তি-পরায়ণ, পবিত্র, প্রীতিপূর্ণ ও মধুর-চরিত্র হইতে যত্নপর রহিবে।

আমরা আজি পাঠককে দুইটি আত্মিক কাহিনীর উপহার দিতে যাইতেছি। এই উভয় কাহিনীর আশ্চর্য ঘটনাই মনুষ্যহৃদয়ে কিরূপ মঙ্গলজনক পরিবর্তন ঘটাইয়াছিল, তাহা পাঠক শেষ পর্যন্ত পাঠ করিলে সহজেই বুঝিতে পাইবেন। এইরূপ কএকটি প্রামাণিক কাহিনী পাঠ করিয়া ফরাশি দেশের বিশ্রুত-নামা বৈজ্ঞানিক ডক্টর চার্লস্ রিচেট (Dr. Charles Richet) আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলিয়াছিলেন যে—

'It is the first time the future life has been scientifically studied; and to deny the facts herein

related, is to condemn science to inertia, and to substitute routine for progress.'

অর্থাৎ মনুষ্যের পর-কাল-সংক্রান্ত জীবনবৃত্তান্ত এই প্রথম বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে আলোচিত হইতেছে। এ সকল বৃত্তান্তকে অস্বীকার করা, আর বিজ্ঞানকে অচল করিয়া রাখা, এবং উন্নতির পরিবর্তে বাঁধা গতের ব্যবস্থা করা এক কথা।

যদি ইউরোপ ও আমেরিকার জড়বাদি-বৈজ্ঞানিকদিগেরই এ তত্ত্বের আলোক-লাভে এত আনন্দ, তাহা হইলে যাঁহাদিগের পূর্বপুরুষেরা অধ্যাত্মজীবনের বিশেষ জ্ঞান-প্রচারের দ্বারা পৃথিবীতে বহুকাল গুরুর আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন— যাঁহাদিগের মধ্যে অদ্যাপি অনেকে গুরু-পরম্পরাগত নিয়মের অনুবর্তনে, প্রতিদিন পরলোকগত পিতা ও পিতামহ প্রভৃতির প্রীণন, তর্পণ ও পূজা না করিয়া জল-গ্রহণ করেন না; এবং গৃহ-সঞ্চার ও পুত্র-কন্যার উৎসব-আচার প্রভৃতি কোন কার্যেই স্বর্গবাসী স্বজনদিগকে স্মরণ ও অর্চন না করিয়া অন্তরে শান্তি পান না, সেই ভারতবাসী হিন্দু-সন্তানের পক্ষে পুরুষানুক্রমিক পুরাতন জ্ঞানের অধুনাতন বৈজ্ঞানিক সমর্থন— পৈতৃক সত্য সম্পদের সর্বদেশব্যাপি পুনরুজ্জীবন, কিরূপ প্রাণ-প্রীতিকর ও জাতীয়গৌরবের পরিচায়ক, তাহা স্বজাতি-বৎসল সুবোধ ব্যক্তিকে বলিয়া দেওয়া অনাবশ্যক।

আত্মিক-কাহিনী

[নাস্তিকের দেব দর্শন]

তেল্লিচারি একটি সামুদ্রিক বন্দর। উহা মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে মালাবার উপকূলে অবস্থিত; এবং যাঁহারা পরিভ্রমণ-প্রিয়, তাঁহাদিগের অনেকের নিকট সুপরিচিত। তেল্লিচারিতে একদল ইংরেজ অশ্বারোহী সৈন্য ছিল। কর্ণেল নাথাম উইলসন (Colonel Natham Wilson) উহার সেনানায়ক। কর্ণেল উইলসন শুধু সৈন্যচালনায় ও অস্ত্র প্রয়োগেই নিপুণ বীরপুরুষ নহেন: তিনি তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন দৃঢ় সংকল্প ও অকপট চরিত্র সামাজিক। কিন্তু তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতেন না, পরলোক মানিতেন না, এবং নিত্যপ্রত্যক্ষ জড়বস্তু ভিন্ন আর কিছুরই অস্তিত্ব স্বীকার করিতে সম্মত হইতেন না।

সৈনিক পুরুষদিগের মধ্যে অনেকে সুপণ্ডিত। কর্ণেল উইলসন্ পণ্ডিত পদবীরূঢ় ব্যক্তিদিগের মধ্যেও প্রায় সর্বত্রই প্রাধান্যের আসন পাইতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি তাঁহার প্রৌঢ়জীবনে নাস্তিকাবাদের গ্রন্থপত্র লইয়াই অবসরকাল অতিবাহিত করিতেন এবং অধীন ও আশ্রিত বর্গকেও ঐ অবিশ্বাসের অন্ধকারে আকর্ষণ করিতে ভালবাসিতেন।

কিন্তু কর্ণেল উইলসনের আশ্বাস ও বিশ্বাস যাহাই হউক তিনি তাঁহার চরিত্রের উচ্চতা ও উদার নির্মলতায় পরিচিত ব্যক্তিমাত্রেরই বিশেষ শ্রদ্ধাস্পদ ছিলেন; এবং সত্যপ্রিয়তা ও পরোপকারশীলতা প্রভৃতি আরও নানা গুণে বহুলোকের হৃদয়ের উপর প্রকৃত আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। তেল্লিচারির সন্নিহিত সকলেই তাঁহাকে সম্মান করিতেন এবং মন্সিয়র ডুবোয়া (Monsieur Dubois) নামক একজন প্রগাঢ় ভক্তিমান ক্যাথলিক ধর্মযাজক এইরূপে ভয়ঙ্কর মতভেদ সত্ত্বেও তাঁহাকে হৃদয়ের সহিত ভালবাসিতেন। ডুবোয়া ধার্মিক সুপণ্ডিত ও সুদুদ্যমশালী ধর্মপ্রচারক। এই আত্মপরভেদশূন্য আনন্দমগ্ন ফরাশি ধর্মযাজকের বহু বিষয়িণী অভিজ্ঞতা ও চিত্তহারিণী মধুর কথায় সকলেই সন্তুষ্ট থাকিত; এবং উইলসনের অবকাশকাল সাধারণতঃ তাঁহার সহিত সদালাপে অতিবাহিত হইত। কর্ণেল উইলসন্ ক্রমে ক্রমে তাঁহার প্রতি একটু বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হইলেন; এবং কালে উভয়ে প্রগাঢ় প্রীতিবদ্ধ সুহৃজ্জনের ন্যায় পরস্পরের সুখ-দুঃখ সংক্রান্ত কথা লইয়াও আলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন।

পূর্বে বলিয়াছি উইলসন্ তাঁহার নাস্তিকতা কাহারও নিকট গোপন করিতেন না। ডুবোয়া অনেক সময়ই উইলসনের সহিত একত্র অবস্থান করিতেন; এবং উইলসনের নাস্তিকতা দূর করিবার নিমিত্ত যথাশক্তি যত্ন পাইতেন। উভয়ের মধ্যে প্রতিনিয়তই পরকাল ঈশ্বর ও ধর্মসম্বন্ধে নির্মুক্তচিত্তে বিচার বিতর্ক ও আলোচনা হইত; কিন্তু দৃঢ়চিত্ত উইলসনের নাস্তিকতা ঐ প্রকার তর্কবিতর্কে আরও যেন দৃঢ়ভাব ধারণ করিয়া ডুবোয়ার সরল ও ভাব বিহ্বল প্রাণে শঙ্কা জন্মাইত। বলা বাহুল্য ইহাতে পরলোক প্রত্যাশী ধার্মিক ডুবোয়া চিত্তে বড় ক্লিষ্ট রহিতেন।

ইহার কিছুদিন পরে ডুবোয়া সহসা কঠিন পীড়ায় শয্যাগত হইয়া পড়িলেন। ডুবোয়াকে শ্রদ্ধা করিতেন সকলেই। তেল্লিচারি প্রবাসী ইউরোপীয় সম্প্রদায় ডুবোয়ার জন্য উৎকণ্ঠিত রহিলেন। কিন্তু ডুবোয়ার সর্বপ্রধান সুহৃৎ কর্ণেল উইলসন্ চিত্তে যারপরনাই আকুল ও উদ্বিগ্ন হইয়াও

তাঁহাকে তথাবিধ অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাইতে বাধ্য হইলেন। এই সময়ে ভেলোর (Vellore) অঞ্চলে সৈন্যদলের মধ্যে বিদ্রোহের লক্ষণ দৃষ্ট হইয়াছিল। কর্ণেল উইলসন্ তাঁহার সৈন্যদল সহ সেইদিকে আহূত হইয়াছেন। তিনি সবেগে সৈন্যচালনা করিয়া ভেলোরের অভিমুখে চলিয়া গেলেন; এবং সেখানে পঁহুছিয়া নগর সম্মুখবর্তী প্রান্তর মধ্যে শিবির সন্নিবেশ করিলেন।

গ্রীষ্মকাল। জ্যোৎস্না রাত্রি। মান্দ্রাজের গ্রীষ্ম। তাহাতে আজি প্রকৃতি নিস্তব্ধ। গাছের পাতাটি পর্যন্ত নড়িতেছে না। কর্ণেল উইলসন্ স্থান ও সময়ের উপযোগী সূক্ষ্মাম্বর পরিধান করিয়াছেন; এবং ফিন্‌ফিনে সার্ট গায়ে দিয়া ও ঢোলা ইজার পরিয়া আপনার পটমণ্ডপে অর্ধশয়ান অবস্থায় একটা কাউচের উপর বিশ্রাম করিতেছেন। রাত্রি প্রহরেক পার হইয়া গিয়াছে কিন্তু উইলসনের নিদ্রা হয় নাই। নিদ্রার পূর্বসূচনায় নয়নদ্বয়ও অলসিত হইয়া আইসে নাই। নিদ্রা হওয়া দূরে থাকুক উইলসন্ তখন পর্যন্ত নিদ্রার কল্পনাকেও মনে ঠাঁই দিতে পারেন নাই। তিনি পটগৃহের দ্বারের দিকে চাহিয়া কল্যকার কর্তব্য বিষয়ে চিন্তা করিতেছেন; এবং কিরূপে অবাধ্য সৈনিকদিগকে বশে আনিবেন তাহাই ভাবিয়া একটুকু উত্তেজিত আছেন। হঠাৎ ধীরে ধীরে তাঁহার সন্নিহিত দ্বারের পর্দা উদ্‌ঘাটিত হইল; এবং ফরাশি ধর্মযাজক ডুবোয়া সেই দ্বারের এদিকে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন।

উইলসন্ একান্ত বিস্মিত ভাবে চমকিয়া উঠিলেন এবং ডুবোয়া কি উদ্দেশ্যে অকস্মাৎ বিনা সংবাদে ওখানে আসিয়াছেন তাহা বুঝিতে না পারিয়া একদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। সেই মূর্তি তেমনই ভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন এবং উইলসনের দিকে স্থির চক্ষে তাকাইয়া কি যেন ভাবিতেছেন। মুখমণ্ডল পাণ্ডুর ও ঈষৎ বিবর্ণ অথচ নয়ন ঔৎসুক্য ও আগ্রহে পরিপূর্ণ। কি যেন কহিবার নিমিত্ত অধর একটু একটু স্ফুরিত হইতেছে অথচ মুখে কোন কথা ফুটিতেছে না!

আত্ম-বিস্মৃত উইলসন 'কি ভাই! ডুবোয়া, ওখানে কেন'— এই বলিয়া নাম ধরিয়া আহ্বান করিলেন, কিন্তু কোন উত্তর পাইলেন না। পর্দাটি অল্পে অল্পে পড়িয়া গেল; মূর্তি পর্দার অন্তরালে অল্পে অল্পে অদৃশ্য হইল। সৈন্যের ছাউনি; সে ছাউনি রণক্ষেত্রে বিদ্রোহ ভয়াম্বিত দুর্গম স্থানে। চারিদিকে সশস্ত্র প্রহরী, মক্ষিকাটিরও প্রবেশের পথ নাই।

এই অবস্থায় ডুবোয়া কি রূপে বিনা অনুমতিতে ওখানে আসিলেন? আর অত রাত্রিতে অমন লুক্কায়িত ভাবে আসিলেনই বা কেন? এইরূপ নানাচিন্তা এক সঙ্গে উইলসনের মনে জাগিল। তিনি কাউচ্ হইতে গাত্রোত্থান করিলেন; এবং শ্লিপার পায়ে দিয়া পটগৃহের বাহিরে যাইয়া দাঁড়াইলেন। বাহিরে যাইয়া দেখিলেন; সেই মূর্তি ঠিক্ সেই ভাবেই তাঁহার সম্মুখে নিশ্চল দণ্ডায়মান। আকাশে ধবল জ্যোৎস্না। চারিদিক্ নিস্তব্ধ। সেই নিস্তব্ধ যামিনীর দ্বিতীয় প্রহরে ভেলোরের সেই ভয়াবহ প্রান্তরে দেহবদ্ধ ও দেহান্তর প্রাপ্ত দুই বন্ধু পরস্পরের সম্মুখীন। অন্য কোন লোক ভয়ে সরিয়া পড়িত। কিন্তু বীর প্রকৃতি উইলসন্ ভীতিশূন্য লৌহস্তম্ভ। তিনি জ্যোৎস্নার আলোকে স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন তাঁহার প্রিয় সুহৃৎ ডুবোয়াই তাঁহার কাছে অদূরে দাঁড়াইয়া আছেন; অথচ ডুবোয়া একটি কথাও না কহিয়া কি যেন চিন্তা করিতেছেন। কিন্তু যেই উইলসন্ ধীর পদবিক্ষেপে ঐ মূর্তির দিকে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিলেন মূর্তি অমনই ধীরে ধীরে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে পিছনে হটিয়া দূরে সরিয়া যাইতে লাগিল। উইলসন কিছু দূর এইভাবে ছায়ামূর্তির অনুসরণ করিলেন। যখন উহা অবশেষে একবারে অদৃশ্য হইয়া গেল নির্ভয় উইলসন্ও তখন মুহূর্তের তরে অন্তরে শিহরিয়া উঠিলেন।

কর্ণেল উইলসন্ দীর্ঘশ্বাস ফেলাইয়া শিবিরে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার নিশ্চিত ধারণা হইল যে তাঁহার বন্ধুর তনুত্যাগ হইয়াছে। কিন্তু সে ধারণার অর্থ কি? তবে কি জীবাত্মা জড় দেহের অতিরিক্ত বস্তু এবং পারলৌকিক জীবন প্রকৃত সত্য? উইলসন্ সময়টা ঠিক করিয়া লিখিয়া রাখিবার জন্য একটি সহযোগী সৈনিক কর্মচারীকে আদেশ করিলেন, এবং কি দেখিলাম এই এক কথাই ভাবিয়া ভাবিয়া রাত্রিটা কোন প্রকারে কাটাইলেন।

পরদিন তেল্লিচারি হইতে পত্র লইয়া লোক আসিল। উইলসন্ পত্র পাঠে অবগত হইলেন যে ধর্মজীবন ডুবোয়ার দেহান্তর প্রাপ্তি হইয়াছে; এবং পত্রে যে সময় নির্দেশ ছিল, ঠিক সেই সময়েই শিবিরে ছায়ামূর্তির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার ঘটিয়াছে। শিবিরের সকলেই এই আশ্চর্য কাহিনী শুনিল, শুনিয়া বিস্মিত হইল; এবং ইহার আদ্যোপান্ত সমস্ত কথা কর্ণেল উইলসনের স্মৃতিপটে চিরজীবনের তরে উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত হইয়া রহিল।

কর্ণেল উইলসন্ যথা সময়ে ভারতীয় সৈনিক বিভাগের কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া বিলাতে চলিয়া গেলেন। বিলাতে স্ট্রাথডেন

(Strathden) নগরে লণ্ডনের অতিবড় প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত ডক্‌টর আশ্‌বারনারের (Dr. Ashburner) সহিত কর্ণেল উইলসনের আলাপ ও পরিচয় হয়। উইলসন ডক্‌টর আশ্‌বারনারকে তদীয় পাণ্ডিত্যের জন্য বিশেষ সম্মান করিতেন আশ্‌বারনারও কর্ণেল উইলসনকে সত্যনিষ্ঠা চরিত্রগত দৃঢ়তা ও প্রখরবুদ্ধিমতার জন্য শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। কর্ণেল উইলসন তদীয় জীবনের বিবিধ গুরুতর কথাপ্রসঙ্গে এই কাহিনীর আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত ডকটর আশ্‌বারনারের নিকট বর্ণনা করেন; এবং আশ্‌বারনার ইহাকে দেহমুক্ত আত্মার অস্তিত্ব সম্পর্কে একটি উৎকৃষ্ট প্রমাণ জ্ঞানে গ্রন্থবদ্ধ করিয়া যান। এইরূপ ঘটনা অনেকেরই চক্ষে পড়ে। কিন্তু দ্রষ্টৃবর্গের মধ্যে অল্প লোক উইলসনের মত পরীক্ষাপটু ও প্রামাণিক; এবং তাহা অপেক্ষাও অল্পতর লোক আশ্‌বারনারের মত তত্ত্বসমালোচক।

[আত্মার সত্য রক্ষা]

ইংলণ্ডের অন্তর্গত সমারসেট (Somerset) শায়রে ডালভারটন (Dulverton) নগর। মেজর জর্জ সিডেন হাম (Major George Syddenham) ডালভারটন নগরে বাস করেন। কাপ্তান উইলিয়ম ডাইক (Captain William Dyke) সিডেনহামের প্রিয়তম বন্ধু। তিনিও ঐ সমারসেটেরই সম্ভ্রান্ত অধিবাসী।

সিডেনহাম ও ডাইক উভয়েই সাদা প্রাণের লোক; অথচ কতকটা উচ্ছৃংখল প্রকৃতি ও উদ্ধত। তাঁহারা যখন যাহা ভাল বুঝিতেন তাহাই তখন করিতেন; এবং একবার যাহা কর্তব্য বলিয়া বুঝিতেন অতি অকর্তব্য হইলেও তাহা না করিয়া ছাড়িতেন না। কাহারও অকাট্যযুক্তি অতি প্রামাণিক উক্তি এবং শত অনুরোধ ও উপরোধেও তাঁহাদিগের কার্যের গতি পরিবর্তিত হইত না। তাঁহারা রীতিমত অনীশ্বরবাদী নাস্তিক নহেন। কিন্তু তাঁহাদিগের আস্তিকা অন্ধকারেরই আর এক পটল। কেন না তাঁহারা উভয়েই পরলোকে অবিশ্বাসী।

ধর্ম কি আর অধর্মই বা কি এই তত্ত্ব লইয়া তাঁহাদিগের উভয়ের মধ্যেও অনেক সময় বাদানুবাদ চলিত। ঘটনাক্রমে একদিন তাঁহারা আত্মার অবিনশ্বরত্ব সম্পর্কে পরস্পর নানাপ্রকার তর্কে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু এ বিষয়ে কেহই কোনরূপ স্থির সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারিলেন না। শরীরের সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক শক্তির নামান্তর স্বরূপ আত্মারও বিলয়

ঘটে দুজনেই মনে মনে এই প্রকার একটা অস্ফুট ভাব পুষিয়া রাখিলেন। অথচ এই সময়ে একে অন্যের নিকট অতি কঠোর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া রহিলেন যে তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহার আগে বিয়োগ হইবে তিনি পারিলে বিয়োগের পর তৃতীয় দিবসে সিডেনহামের ডালভারটনস্থিত নিদাঘ নিবাসে অপরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পারলৌকিক অস্তিত্ব এবং পাপ পুণ্যের পরিণাম অথবা দণ্ডপুরস্কার সম্বন্ধে প্রকৃততত্ত্ব বিজ্ঞাপন করিয়া যাইবেন।

আগে সিডেনহামের কাল পূর্ণ হইল। সিডেনহাম কএক দিন রোগযন্ত্রণা ভোগ করিয়া পার্থিব তনু হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেন। কাপ্তান ডাইক প্রিয়তম সুহৃদকে সমাধির অন্ধকারে অশ্রুজলে বিদায় দিয়া আসিয়া পূর্বকৃত প্রতিজ্ঞা অনুসারে মৃত্যুর পরবর্তী তৃতীয় দিবসের অপেক্ষায় রহিলেন।

অদ্য সেই তৃতীয় দিবস। সিডেনহামের গৃহে একটি শিশু পীড়িত। কাপ্তান ডাইকের ভ্রাতৃসম্পর্কিত ঘনিষ্ঠ আত্মীয় (cousin) একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার। তিনি ঐ শিশুর চিকিৎসা করিতেছেন। অদ্য, সেই আত্মীয় ডাক্তারের সঙ্গে কাপ্তান ডাইকও মেজর সিডেনহামের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কাপ্তান ডাইক কেন যে ঐ দিন অপরাহ্নে সিডেনহামের গৃহে রাত্রি বাস করিতে আসিলেন, ডাক্তার ডাইক তাহার প্রকৃত রহস্য অবগত নহেন। সিডেনহামের গৃহে উভয়ের জন্য একই শয়নকক্ষে পৃথক দুইটি শয্যা নির্দিষ্ট হইল।

রাত্রি যখন গভীর হইয়া আসিল তখন কাপ্তান ডাইক দুটি মোটা বাতি জ্বালাইয়া আনিবার জন্য ভৃত্যের প্রতি আদেশ করিলেন। ডাক্তার এই বিচিত্র আদেশের তাৎপর্য পরিগ্রহ করিতে না পারিয়া কৌতুক করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'অতবড় বাতি দিয়া কি হইবে?' কাপ্তান ডাইক মেজর সিডেনহামের সহিত তাঁহার যে প্রতিশ্রুতি ছিল ডাক্তারকে তাহা সবিশেষ বুঝাইয়া বলিলেন। ইহাও কহিলেন, অদ্য সেই তৃতীয় দিবস; অতএব তিনি আজিকার রাত্রির কিয়দংশ সিডেনহামের নিদাঘ-নিবাসে তাঁহার প্রতিশ্রুত-সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্যে অতিবাহিত করিবেন।

ডাক্তার প্রথমতঃ একটু হাসিলেন: তারপর এই অবৈধ সংকল্প ত্যাগ করিবার নিমিত্ত কাপ্তান ডাইককে দৃঢ়তার সহিত অনুরোধ করিলেন। ডাক্তার বলিলেন— 'পর-লোক-গত আত্মা এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবেন, কিংবা রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। কেন না, এরূপ প্রতিজ্ঞা স্বভাববিরুদ্ধ ও অসঙ্গত। দ্বিতীয়তঃ, দর্শনপ্রার্থীকে একা

পাইয়া এই সুযোগে কোন মন্দ আত্মা (Evil Spirit) মন্দ ব্যবহার করিলে তখন উপায় কি ? তৃতীয়তঃ, এইভাবে সর্বশক্তিমান্ জগদীশ্বরের কার্যপ্রণালীর পরীক্ষা করিতে যাওয়াও ক্ষুদ্রপ্রাণ মনুষ্যের পক্ষে একান্ত ধৃষ্টতা ; সুতরাং যারপরনাই পাতকের কর্ম।'

কাপ্তান উত্তর করিলেন, 'ভাই, তুমি যাহা বলিলে, সম্ভবতঃ এ সমস্তই সত্য। কিন্তু আমি আমার বন্ধুর সহিত বিশ্বস্তপ্রাণে যে প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়াছি, ফল যাহাই ঘটুক, আমি কিছুতেই তাহার অন্যথা করিতে পারিব না। আমি আমার বাক্য-রক্ষা বিষয়ে দৃঢ়সংকল্প। প্রতিজ্ঞা করিয়াছি মৃত্যুর পর তৃতীয় দিবসে তাঁহার নিদাঘ-নিবাসে যাইয়া অপেক্ষা করিব ; অতএব সেখানে যাইবই যাইব। কিছুতেই ইহার অন্যথা হইবার নহে। তুমি যদি ভাই দয়া করিয়া আমার সঙ্গে যাও এবং সেখানে এই আশ্চর্য সাক্ষাৎকারের প্রত্যাশায় আমার সঙ্গে অবস্থান কর, ভাল কথা। তোমার নিকট চিরকাল কৃতজ্ঞ রহিব, আর না যাও আমি একাকীই যাইব। যাইব এ কথা দৃঢ় নিশ্চিত।'

কাপ্তান ডাইক তাঁহার ওয়াচটি খুলিয়া টেবিলের উপর রাখিলেন। ঘড়িতে যখন সাড়ে এগারটা হইল, তখন তিনি ঐ বাতি দুটা দুই হাতে লইয়া নিদাঘ-নিবাসের প্রবেশদ্বারে উপস্থিত হইলেন। রাত্রি দুটা পর্যন্ত একাকী ঐ প্রবেশদ্বারের সম্মুখে একবার এদিক্, একবার ওদিক্, এইরূপ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইলেন ; এবং অবশেষে ক্লান্ত, শ্রান্ত ও হতাশ হইয়া শয়ন-কক্ষে ফিরিয়া আসিলেন। যাহা ভাবিয়াছিলেন তাহা হইল না। অলৌকিক ত কিছুই চক্ষে দেখিলেন না ; আশ্চর্য কোন শব্দও কানে শুনিতে পাইলেন না।

এই ঘটনার পর ছয় সপ্তাহ অতীত হইয়া গিয়াছে। কাপ্তান ডাইক তাঁহার একটি পুত্রকে প্রসিদ্ধ ইটন-কলেজে প্রবিষ্ট করিয়া দিবার নিমিত্ত ইটনে আসিয়াছেন। ইটন (Eton) নগর বাকিংহামশায়রে টেমস্ নদীর বামতটে অবস্থিত। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার সেই ডাক্তার আত্মীয়টিও ইটনে আগমন করিয়াছেন। তাঁহারা সেণ্ট ক্রিষ্টফার নামক (St. Christopher's inn) অতিথিশালার দুই কামরায় দুজনে অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহারা যে প্রয়োজনে ইটনে আসিয়াছেন তাহা সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। রাত্রি প্রভাত হইলেই উভয়ে ইটন হইতে চলিয়া যাইবেন। রাত্রি প্রভাত হইয়াছে। কাপ্তান ডাইক এক্ষণে অতিথিশালার এক কক্ষমধ্যে নিদ্রা

যাইতেছেন। অতিথিশালার ঘর পর্দা প্রভৃতি দ্বারা চারিদিকে তেমন আটা সাটা রূপে আবৃত নহে। প্রভাতের আলো জানালা ও কপাটের ফাঁক দিয়া ঘরের ভিতরে উঁকি ঝুঁকি দিতেছে। একটু বেলা হইয়াছে, তথাপি কাপ্তান ডাইকের ঘুম ভাঙ্গিতেছে না।

সহসা কে আসিয়া ডাইকের মশারির আবরণ উন্মোচন করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। অমনি ডাইকের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন। চাহিয়া দেখিলেন— স্বর্গগত বন্ধু মেজর সিডেনহাম সেই পার্থিব মূর্তিতে, সেই পরিচিত পরিচ্ছদে, তাঁহার শয্যার পার্শ্বে স্থিরভাবে দণ্ডায়মান।

কাপ্তান ডাইক চমকিয়া উঠিলেন। তিনি প্রথমতঃ তাঁহার দৃষ্টিকে বিশ্বাস করিতে চাহিলেন না। ভাবিলেন— 'এ স্বপ্ন নয় তো ?— অথবা আধো ঘুমের ঘোরে, একটা অলীক দৃশ্য দেখিতেছি না ত।' ইহা ভাবিয়া দুই হাতে চক্ষু রগড়াইতে লাগিলেন।

ছায়ামূর্তি তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পাইয়া তদীয় প্রীতিস্নেহের পরিচিত কণ্ঠে স্পষ্ট বাক্যে কহিতে লাগিলেন— 'প্রিয়তম, এ স্বপ্ন নহে, —অলীক কল্পনাও নহে, চাহিয়া দেখ; আমি প্রকৃতই তোমার সেই বন্ধু মেজর সিডেনহাম। আমি সেই প্রতিশ্রুত দিনে তোমাকে দেখা দিতে পারি নাই। আজিও অতি অল্প সময়ের জন্য তোমাকে একটি মাত্র কথা কহিয়া যাইবার নিমিত্ত আদিষ্ট হইয়া আসিয়াছি।'

কাপ্তান ডাইক অধিকতর বিস্মিত হইলেন এবং এক-তান-দৃষ্টিতে ছায়ামূর্তির পানে তাকাইয়া রহিলেন। সেই মুখ, সেই চোখ, সেই অঙ্গভঙ্গি এবং সেই কণ্ঠস্বর। কিন্তু মুখচ্ছবি একটু ম্লান ও ক্লিষ্ট। ডাইক কহিলেন— 'তুমি সেই প্রতিশ্রুত তৃতীয় দিবসে নিদাঘ-নিবাসে দেখা দিলে না ভাই কেন ?'

ছায়ামূর্তি কহিল, 'পারি নাই। তাই আসি নাই। তুমি যে প্রতিজ্ঞারক্ষার প্রয়োজনে নিদাঘ-নিবাসে যাইয়া অপেক্ষা করিয়াছিলে তাহা আমি জানি। আমি তোমার সংবাদ পাইয়াছি; কিন্তু দর্শন-দানে সমর্থ হই নাই। কেন হই নাই, তাহা আজি তোমাকে বলিব না; বলিলেও বুঝাইতে পারিব না। সময়ে যখন আমরা একত্র হইব, তখন আপনিই তুমি তাহা বুঝিতে পাইবে। সে কথা এখন থাকুক; এখন আমি তোমাকে যাহা বলিতে আসিয়াছি, তুমি তাহাই বিশেষ মনোযোগের

সহিত শুনিয়া রাখ।'

ইহার পরে, ছায়ামূর্তি অধিকতর গম্ভীর কণ্ঠে কহিল, 'পরলোক সত্য, এই আমি তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। এ বিষয়ে আর ঘৃণাক্ষরেও সংশয় করিও না। ঈশ্বরও সত্য। সে ঈশ্বরের বিধিব্যবস্থা অমোঘ্য ও অলংঘ! তাঁহার ন্যায়পরতার এক তিলও ব্যতিক্রম হইতে পারে না। কর্মফল অপরিহার্য। তাই বলি ভাই— সাবধান, সাবধান। যদি এখনও জীবনের গতি পরিবর্তিত করিয়া সমস্ত বিষয়ে সাবধান না হও, তাহা হইলে বস্তুতঃ পরিণামে কষ্টের সীমা থাকিবে না।'

ইহা কহিয়াই ছায়ামূর্তি অদৃশ্য হইল। কাপ্তান ডাইক, ভয়ে ও বিস্ময়ে, কম্পিত-হৃদয়ে, শয্যাতলে নিপতিত হইলেন। তাঁহার প্রাণের অভ্যন্তরে অকস্মাৎ একটা ভয়াবহ বিপ্লব উপস্থিত হইল। তিনি বহুক্ষণ ঐরূপে নিস্তব্ধভাবে অবস্থান করিয়া, অবশেষে ক্লিষ্ট দেহে ও অবসন্ন প্রাণে শয়ন-কক্ষ হইতে বহির্গত হইলেন, এবং প্রিয় সহচর ডাক্তারের সহিত তাঁহার কোঠায় যাইয়া সাক্ষাৎ করিলেন।

ডাক্তার, কাপ্তান ডাইকের আকৃতি দেখিয়া ভীত ও বিস্মিত। দেখিলেন মুখখানি পাণ্ডুবর্ণ হইয়াছে, চক্ষু দুটি বসিয়া পড়িয়াছে— দৃষ্টি উদাস। তিনি ব্যগ্রভাবে এই আকস্মিক পরিবর্তনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কাপ্তান ডাইকও প্রভাতের ঐ বিস্ময়কর ঘটনা সবিস্তর বর্ণনা করিয়া কহিলেন। ডাইক যেরূপ প্রগাঢ় ভক্তির সহিত তাঁহার প্রত্যক্ষ ঘটনার সাক্ষ্য দিলেন, তাহাতে ডাক্তারের চিত্তেও অনুমাত্র সংশয় রহিল না।

এই হইতে কাপ্তান ডাইক আর এক মানুষ হইয়া গৃহে প্রতিগমন করিলেন। তাঁহার সে ঔদ্ধত্য নাই, সে চাঞ্চল্য নাই; তিনি এখন যারপরনাই নম্র ও বিনীত। তাহার জীবনের উচ্ছৃংখল গতিও আর নাই, তিনি সর্বতোভাবেই স্থির, ধীর, শান্ত ও সুজন। তিনি এখন আর আত্মসুখের সন্ধানে পরের সুখ-শান্তি চরণে দলন করিতে পারেন না। তাঁহার নয়নে এখন পরের দুঃখে অশ্রু ঝরে, প্রাণে পরের পোড়ায় বেদনা লাগে।

এই ঘটনার পরে কাপ্তান ডাইক কেবল দুইটি বৎসর জীবিত ছিলেন। কিন্তু তাঁহার চিত্তে ও চরিত্রে দুই বৎসরেই এমন অভাবনীয় ও আনন্দ-জনক পরিবর্তন ঘটিয়াছিল যে, দূরস্থ ব্যক্তিরাও তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পাইয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়াছিল।